KRISHI PADDHATI

BEING A TREATISE ON INDIAN AGRICULTURE AND PRACTICAL BOTANY INCLUDING STRUCTURE AND FUNCTION OF PLANTS.

VOL I.

(GARDEN SERIES)

BY

UMES CHANDRA SEN GUPTA.

কৃষিপদ্ধতি।

প্রথম ভাগ।

(উদ্যান খণ্ড)

শ্রীউমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা;

২ নং বেণেটোলা লেন, সখা-যন্ত্রে, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী

কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৪ সাল।

NOTICE.

The success of agriculture depends entirely on the use of good seeds ; and the choice of seeds not only ensures good produce, but it does, to a great extent, improve the agricultural methods pursued in a country. But unfortunately public attention in India, has never been directed to any such improvement in the breed of the seeds. In Europe and in many of the states of America the energy and efforts of the people in securing good seeds by the improved cultivation of vegetables, fruits and flowers have been unceasing ; and seeds are placed within easy reach of the cultivators in general. That the ignorance of so necessary an improvement in the breed of the seeds is one of the main causes of the backward state of agriculture in our country is what I pointed out at a meeting of the 'Family Literary Club, Calcutta' early in the year 1875. The meeting was largely attended by native and European gentlmen, among whom may be mentioned the names of the very Reverend THE LORD BISHOP OF CALCUTTA, the late MR. H. WOODROW, Director of Public Instruction, Bengal. These gentlemen, unanimously, supported my views and the last named gentleman gave me special encouragement for the collection and improvement of native seeds. I did not venture then to take the heavy task upon my shoulders as it required the support of the wealthy and influential men of our country for its success. Latterly, however, being encouraged by BABU BHAGABAN CHANDRA BOSE, one of the members of the Government Agricultural and Horticultural Society, MR. A. M. BOSE, Barrister-at-law, BABU SURENDRA NATH BANERJEE, DR. MOHENDRA LALL SARCAR, M. D. and DR. ANNADA CHARAN KHASTAGIR, I have undertaken this heavy task and for its success I solicit the support and patronage of my countrymen.

For some years past, we are intending fresh seeds of vege-

tables, fruits, flowers and spices from America and Europe and distributing them among our subscribers. Although, there are many breeds of excellent qualities in our collection, yet we have come to know of the existence of many excellent seeds in India, such as no other country can supply. If these seeds be collected and distributed easily among the cultivators, they will serve materially to improve the state of agriculture in our country. We are ready to purchase them at their proper prices. We therefore, beg the favour of our educated countrymen to render us help on the following points—

I.—Help towards the collection of those rare country seeds of vegetables, fruits, flowers and spices that are extraordinary in their shape, size and properties or which are highly useful to the public. Any information which will enable us to procure such seeds shall be gratefully accepted.

II.—Help and information of the correct process and the exact time for the cultivation of those seeds for the convenience of our experiment.

III.—Help and information of any skilful process for the cultivation of the seeds in our experimenting farm.

Lastly, we earnestly hope, that those of our countrymen who feel an interest for agricultural matters and have a liking for all improved seeds, either native or foreign, will kindly oblige us by enlisting their names in the list of our regular subscribers.

On our part, we will spare no pains to place those seeds within easy reach of the people at large. As a token of gratitude, we will present one packet of our collected seeds to everybody who will help us in our work. No doubt, our country will derive a great deal of benefit from such an undertaking.

Barahanagara;
CALCUTTA.

UMESH CHANDRA SEN GUTTA.

I have known Babu Umesh Chandra Sen Gupta for several years. He is the author of a very useful work in Bengali on Agriculture and has been connected with a nursery for some time. His present project seems to be a very commendable one and in every way deserving of encouragement. I shall be glad to learn of its success.

17th January, 1882. *(Sd.)* A. M. Bose.

The work in which Babu Umes Chandra Sen Gupta is engaged is unquestionably one of great importance to this country, where so little attention is paid to the actual improvement of the plants, which form part of our food and condiment. Nothing would give me greater pleasure than to see such a work successfully caried out * * * *

19-3-82. *(Sd.)* Mohendra Lall Sircar, m. d.

The project is one which has my hearty sympathy and it deserves the encouragement of all those who feel an interest in gardening. I wish it every success.

3-3-82. *(Sd.)* Surendra Nath Banerjee.

As I was one of the first individuals to point out to Babu Umes Chandra Sen, the necessity of taking up the business of collecting and improving vegetable seeds with a view to their distribution, a few words of explanation may be thought necessary. No body will deny the fact that as a beginning, improvement of seeds is of the first importance with reference to all agricultural improvement of the country. To do this, it is necessary that the seeds should be cultivated by themselves to improve their quality which can not be done in an extensive farm how well conducted so ever. * *

It would be proper, if Government in the Agricultural Department were to take up the subject. But that is no reason why private individuals should not do so. Such enterprise, I should think, is more likely to succeed in the

hands of private individuals than those of Government officials. In this connection, I wish every success to Babu Umes Chandra Sen in his very laudable undertaking.

3rd March, 1882. *(Sd.)* BHAGABAN CHANDRA BOSE.

A nursery, entirely of country plant of all parts of India was a desideratum which Babu Umes Chandra Sen is trying to supply. I hope, our countrymen will give him every encouragement and I wish him full success in his project.

29th January, 1882. *(Sd.)* A. C. KHASTGIR.

সূচীপত্র।

ফলের উদ্যান।

পুষ্পোদ্যান।

শাকসবজির উদ্যান।

ভূমিকা।

কৃষি অর্থোপার্জ্জনের একটি প্রধান উপায়। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় কৃষি কার্য্যোৎপন্ন অর্থদ্বারা বহু লোকে প্রভূত ধনশালী হইয়াছেন এবং হইতেছেন। তাঁহারা কেবল স্বদেশে নয়, বিদেশে গিয়া, বিদেশীয় কৃষি অবলম্বন পূর্ব্বকও অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। সাহেবেরা মরিশস প্রভৃতি দ্বীপে ও ভারতবর্ষে ইক্ষু, নীল, চা প্রভৃতির চাষ করিয়া যে, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের রত্নগর্ভা ভারতবর্ষে কৃষকের অবস্থা অতি হীন। তাহার প্রধান কারণ এই, ভারতের সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্যকে অতি নিকৃষ্ট কার্য্য জ্ঞান করেন। অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকেরাই এদেশে কৃষি ব্যবসায়ী; তাহাদের দ্বারাই এদেশে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। একে তাহাদের বুদ্ধি বিবেচনা অল্প, তাহাতে অর্থহীন, কাজেই সামান্য ব্যয়ে ও সামান্য জ্ঞানে যাহা সম্ভব, তাহাদের দ্বারা তাহাই হয়। ভারতবর্ষে লোক সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে; আবার নানাদেশে ভারতের শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইতেছে। এমত অবস্থায় কৃষির উন্নতি সাধন দ্বারা দেশের উৎপন্ন বৃদ্ধি

করিতে না পারিলে, দ্রব্যাদি উত্তরোত্তর আরও দুর্ম্মূল্য হইবে এবং এ দেশের লোক অধিকতর কষ্টে পড়িবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কৃষি যে অর্থোপার্জ্জনের ও সুখ সাধনের একটি প্রধান উপায়, এতদিন পরে ভারতবাসী শিক্ষিত ভদ্র-সন্তানগণের মধ্যে কাহারও কাহারও অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সেই চিন্তার উদ্রেক হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে চাকরীর দুরবস্থা ও দুষ্প্রাপ্যতাই এরূপ চিন্তার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। যে কারণেই হউক, আমরা ইহাকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি-তেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এতদিন এ বিষয়ে কেহ কোন তত্ত্বানুসন্ধান রাখেন নাই; অনভিজ্ঞ কৃষকেরা আপনাদের চিরাভ্যস্ত প্রথা অনুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। কি জন্য কি করে, তাহা তাহারা বুঝে না; সঙ্গত হউক আর না হউক তাহারা আপনাদের অভ্যস্ত রীতি পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ করে না, জিজ্ঞাসা করিলে আপনাদের সংস্কারানুরূপ মোটামোটি দুই চারি কথা বলে, সুতরাং তাহাদের নিকটও কোন সন্ধান জানিবার সম্ভা-বনা নাই। এ জন্য ইচ্ছা স্বত্ত্বেও অনেক ভদ্রসন্তান ইহাতে প্রবৃত্ত হওয়ার সুবিধা পাইতেছেন না। দেশের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমরা কৃষি বিষয়ক এই পুস্তক খানি প্রকাশ করিলাম। ইহার জন্য বহু অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিতে হইয়াছে। এখন

সাধারণের নিকট প্রার্থনা যে, সকলে ইহার প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ দৃষ্টি রাখেন ; তাহা হইলে আমরা ভবিষ্যতে কৃষি সম্বন্ধীয় অনেক তত্ত্ব খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতে পারিব।

শ্রীউমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।
বরাহনগর, কলিকাতা।
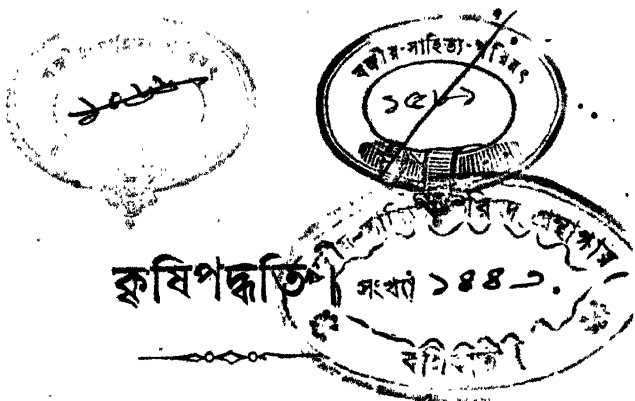
কৃষিপদ্ধতি।

বীজরোপণ ও অঙ্কুরোৎপাদন ক্রিয়া।

কৃষিপদ্ধতির আরম্ভেই বীজের অঙ্কুরোৎপাদন ক্রিয়া ও উদ্ভিজ্জদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণনা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম। কৃষিকার্য্যে ইহা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। যেরূপ জ্ঞান থাকিলে, বীজের ও উদ্ভিজ্জদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বভাব ও কার্য্য বুঝিয়া কৃষক সাবধানতার সহিত আপন কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, আমরা সংক্ষেপে তাহাই উল্লেখ করিব। সুকৃষক মাত্রেরই এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য।

যে অদ্ভুত নিয়মে পুষ্প হইতে ফল উৎপন্ন এবং ফলমধ্যে বীজের সঞ্চার হয়, তাহা এস্থলে বর্ণনীয় নহে। বীজ হইতে যেরূপে অঙ্কুরোৎপন্ন হয়, এখানে তাহাই বর্ণিত হইবে। জগদীশ্বর উদ্ভিজ্জবংশ অব্যাহত রাখার জন্যই বীজের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব বীজ মাত্রেরই যে, অঙ্কুরোৎপাদন শক্তি আছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে অনেক সময়ে আমরা বীজ রোপণ করিয়াও তাহার অঙ্কুরোৎপত্তি দেখিতে পাই না, তাহার দুইটী প্রধান কারণ অনুমিত হয়। প্রথম কারণ—বীজের জীবনীশক্তি নষ্ট হইয়া গেলে বীজ রোপণ করা; দ্বিতীয় কারণ—বীজের প্রতি অপব্যবহার অর্থাৎ যে বীজ অঙ্কুরিত হইতে যে পরিমাণ জল, বায়ু ও উত্তাপের আবশ্যক তাহা কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া, যে সে স্থানে যে সে সময়ে তাহাদিগকে রোপণ করা।

প্রাণীগণের জরায়ুমধ্যে ভ্রূণ যেমন প্রথমে তরল অবস্থায়, পরে ক্রমশঃ ঘণতর হইয়া হস্ত পদ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের চিহ্নবিশিষ্ট হইয়া

অবস্থিতি করে, উদ্ভিজ্জ ভ্রূণও বীজের মধ্যে ঠিক্ সেই অবস্থায় অব-স্থিতি করে। একটী পরিণত বীজের বহিরাচ্ছাদন ছেদ করিলে, উহা দেখিতে পাওয়া যায়। যখন বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তির উপ-ক্রম হইবে, সেই অবস্থার একটী বীজ কাটিয়া দেখিলে, উদ্ভিজ্জ ভ্রূণের প্রধান ইন্দ্রিয় সকল স্পষ্ট লক্ষিত হইবে। পরীক্ষার্থ এই অবস্থার একটী সীম বা মটরের বীজ ছেদকর। তাহা হইলে উহার মধ্যে ঘণ মাংস পিণ্ডাকার দুইটী দল দৃষ্ট হইবে। উভয় দল কব্জার আকারে এক কোণে সংলগ্ন, ঐ সংলগ্ন স্থানের সন্নিকটে ভাবী চারার মূল ও কাণ্ডের সূত্রপাত দেখিতে পাইবে। উদ্ভিজ্জ বেত্তারা উক্ত দল, মূল ও কাণ্ডের সমষ্টিকে ভ্রূণ শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। ভ্রূণের এক পার্শ্বে স্থিত একপ্রকার কোমল পদার্থ বীজের অধিকাংশ অঙ্গ আবৃত করিয়া রহিয়াছে দৃষ্ট হইবে, ঐ পদার্থ শ্বেতসার নামে অভিহিত হয়। শ্বেতসার নবজাত চারার পোষণার্থে বীজের মধ্যে অবস্থিতি করে। বীজে অঙ্কুর জন্মিলে রাসায়নিক ক্রিয়ায় উক্ত শ্বেত-সার শর্করারূপে পরিণত হয় এবং তাহা জলে দ্রবীভূত হওয়াতে নবজাত চারা সহজেই চুসিয়া লইয়া পুষ্ট হইতে পারে। কতকগুলি বীজের মধ্যে শ্বেতসার স্পষ্ট দেখা যায় না। উহা বীজের অভ্যন্তরস্থ ভ্রূণের দেহে ও পত্র মধ্যে সঞ্চিত থাকে।

অঙ্কুরোৎপাদন শক্তিকেই বীজের জীবনী শক্তি কহে। ঐ শক্তি সর্ব্ব জাতীয় বীজের সমকাল স্থায়ী নহে। অর্থাৎ এমন অনেক উদ্ভিজ্জ আছে, তাহাদের বীজ পরিপক্ক হওয়ার অতি অল্পকাল পরেই জীবনীশক্তি বিহীন হয়। সুতরাং পক্কাবস্থার অনতিবিলম্বে রোপিত না হইলে, সে বীজে অঙ্কুর জন্মে না। আবার এমন অনেক উদ্ভিদ আছে যে, দীর্ঘকালেও তাহাদের বীজ নষ্ট না হইয়া সজীব থাকে। যে সকল বীজের উপরের ত্বক দৃঢ় তাহাদের জীবনী শক্তি কোমল ত্বক বীজ অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী। বীজ পরিপক্ক হইলে পরিশুষ্ক করিয়া সংগ্রহ করা উচিত। কারণ বীজ সম্পূর্ণ না পাকিলে ও আর্দ্র অবস্থায় থাকিলে, শীঘ্র জীবনী শক্তি বিহীন হয়। দূরদেশে বীজ

পাঠাইতে হইলে, যাহাতে বীজের মধ্যে বায়ু বা আর্দ্রতা প্রবেশ করিতে না পারে, এরূপে মোড়ক করা কর্ত্তব্য।

বীজ রোপিত হইলে উপযুক্ত জল, বায়ু ও তাপ এই তিনের সাহায্যে অঙ্কুরিত হয়। বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার জন্য আলোকের সাহায্য আবশ্যক করে না, বরং আলোক অপেক্ষা অন্ধকারে অঙ্কুরোৎপাদনকার্য্য উত্তম রূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। কারণ অন্ধকারস্থিত বীজকেই অপেক্ষাকৃত শীঘ্র অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায়।

রোপণের পর বীজমাত্রেই রসাকর্ষণ করিয়া স্ফীত হয়। অনন্তর ঐ স্ফীতিবশতঃ বীজের উপরের আবরণ ফাটিয়া ভ্রূণের দুইটী ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় প্রকাশ পায়। একটী মৃত্তিকার মধ্যে লম্বভাবে প্রবেশ করে এবং অন্যটী বীজপত্র মস্তকে করিয়া উর্দ্ধগামী হয়। প্রথম ইন্দ্রিয়টীই ভাবী চারার মূল এবং দ্বিতীয় ইন্দ্রিয়টী কাণ্ড। সকল শ্রেণীর উদ্ভিদের বীজপত্র সমান নহে। যে শ্রেণীস্থ উদ্ভিজ্জের কাণ্ডের সারভাগ মধ্যে থাকে, (যেমন আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি) তাহাদের বীজপত্র দুইটী। আর যাহাদের কাণ্ডের সারভাগ বহির্দ্দিকে (যেমন নারিকেল, সুপারী, তাল প্রভৃতি,) ইহাদের বীজপত্র একটী মাত্র। যাহাদের বীজপত্র একটী, তাহাদিগকে এক বীজপত্রিক এবং যাহাদের বীজপত্র দুইটী তাহাদিগকে দ্বিবীজপত্রিক উদ্ভিজ্জ কহে। দ্বিবীজ পত্রিক উদ্ভিজ্জ শাখা প্রশাখা সমন্বিত হয়। অধিকাংশ একবীজপত্রিক উদ্ভিজ্জের শাখা হয় না, কেবল শিরোভাগে কতকগুলি পত্র থাকে।

বীজ রোপণ করা হইলে ধূলিবৎ চূর্ণ মৃত্তিকাদ্বারা বীজগুলিকে ঢাকিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ তাহা হইলে, বায়ু প্রবেশের পথ রুদ্ধ হয় না অথচ মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ তাপ ও রস উদগত হইতে পারে না। ছোট ছোট বীজ অপেক্ষা বড় বড় বীজ একটু বেশী মাটির নীচে থাকিলেও হানি হয় না বটে, কিন্তু মৃত্তিকার অধিক নিম্নে কোন বীজই রোপণ করা উচিত নহে। বিশেষতঃ ক্ষুদ্র আকৃতির বীজগুলির উপর অতি পাতলারূপে ধূলিবৎ মৃত্তিকার আচ্ছাদন রাখাই কর্ত্তব্য।

মূলের কার্য্য ও স্বভাব।

মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণপূর্ব্বক উদ্ভিজ্জদিগকে সজীব রাখাই মূলের প্রধান কার্য্য। এতদ্ভিন্ন উদ্ভিজ্জদিগকে মৃত্তিকার উপরে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া রাখাও উহার আর এক কার্য্য। মৃত্তিকামধ্যে মূল প্রোথিত থাকে বলিয়া প্রবল ঝড় বাতাসে বৃক্ষকে সহসা উৎপাটিত করিতে পারে না।

সকল উদ্ভিজ্জের মূলের বিস্তার সমান নহে। উদ্ভিদশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ উদ্ভিজ্জগণের শ্রেণীবিভাগ ধরিয়া যেরূপে তাহারা মৃত্তিকা মধ্যে মূল প্রসারিত করে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আম, কাঁঠাল, তেঁতুল পেয়ারা প্রভৃতি দ্বিবীজপত্রিক শ্রেণীস্থ উদ্ভিজ্জের মূলশিকড় লম্বভাবে মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেই মূলশিকড় হইতে অন্যান্য শিকড় বহির্গত হইয়া তাহারা চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়। অপর নারিকেল, সুপারি, তাল, খেজুর প্রভৃতি এক বীজপত্রিক শ্রেণীস্থ উদ্ভিজ্জের মূলশিকড় জন্মে না; তাহাদের শিকড় গোড়ার চতুর্দ্দিক হইতে বাহির হইয়া থাকে। কোন্ জাতীয় উদ্ভিজ্জের মূল মৃত্তিকা মধ্যে কি ভাবে বিস্তৃত আছে, তাহা জানা থাকিলে, একস্থান হইতে চারা তুলিয়া অন্যস্থানে রোপণ করিবার সময় শিকড়ে আঘাত না লাগে, এরূপ সতর্কতা অবলম্বিত হইতে পারে; তাহাতে স্থান পরিবর্ত্তন জন্য চারার কোন বিঘ্ন হয় না।

মৃত্তিকা-রস সকল জাতীয় উদ্ভিজ্জেরই জীবিকা নহে। শৈবালাদি কতকগুলি উদ্ভিদের মূল, জলে বিস্তৃত থাকিয়া আপনাদের খাদ্য সংগ্রহ করে। রাস্না প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদ অন্য বৃক্ষের দেহোপরি জন্মিয়া সেই বৃক্ষে ও বায়ুমণ্ডলে মূল বিস্তার করতঃ প্রাণধারণ করে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, রসাকর্ষণ পূর্ব্বক উদ্ভিজ্জকে প্রতিপালন করাই মূলের প্রধান কার্য্য। সেই কার্য্য সাধন জন্য ইহা মৃত্তিকার চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া খাদ্য অন্বেষণ করে। বড় ও পুরু শিকড়গুলি রসাকর্ষণে অপটু এনিমিত্ত তাহারা ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ না হইয়া বৃক্ষকে মৃত্তিকার উপরে দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ রাখে এবং

রসাকর্ষণার্থ ক্ষুদ্র শিকড় গুলি প্রেরিত হয়। শিকড়ের সকল অংশে রস শোষিত হয় না। উহাদের অগ্রভাগের নবীনতম অংশই রস পরিশোষণে সমর্থ। আর পুরাতন শিকড় হইতে যে সকল সূত্রবৎ শিকড় বহির্গত হয়, তাহাদেরও ঐ শক্তি আছে। অতএব যখন চারা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূলগুলিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, বৃক্ষের গোড়া হইতে দূরে গিয়া পড়ে, তখন জলসিঞ্চন ও সারপ্রদান বিষয়ে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, উহা বৃক্ষের কেবল গোড়ায় হইলে কোন ফল দর্শে না। কারণ শিকড়ের অগ্রভাগস্থ কোমল নবীন অংশের সম্মুখে না পৌঁছিলে, শিকড়গুলি সেই রস গ্রহণে সমর্থ নহে। উদ্ভিজ্জবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতগণ বলেন, বৃক্ষের কাণ্ডের উপরে শাখা প্রশাখা যতদূর ব্যাপ্ত হয়, সচরাচর শিকড়গুলিও গোড়া হইতে ততদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। কখন কখন বা তদপেক্ষাও দূরে যায়। আবার কোন কোন উদ্ভিজ্জের শিকড় চারিপাশে না ছড়াইয়া গভীর মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ করে। মূলের কার্য্য সকল সময়ে সমান প্রখর থাকে না। শীতকালে মূলগুলি অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ থাকে, বসন্তের প্রারম্ভেই শীতের জড়তা দূরীভূত হইয়া পুনরায় প্রখরতা লাভ করে।

কাণ্ড।

উদ্ভিজ্জবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ কাণ্ডকে উদ্ভিজ্জের ঊর্দ্ধগ মেরু-দণ্ড বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শাখা এবং মূল এই দুই সীমার মধ্যস্থ অংশকেই সচরাচর বৃক্ষের কাণ্ড বলা হইয়া থাকে। কাণ্ড দুই প্রকার; মৃত্তিকার মধ্যগত কাণ্ড ও মৃত্তিকার বহিঃস্থ কাণ্ড। আলু, ওল, মানকচু প্রভৃতি মৃণ্মধ্যগত কাণ্ডের উদাহরণ। কেহ কেহ আদা, আলু, হলুদ প্রভৃতিকে কাণ্ড না বলিয়া মূল বলেন; কিন্তু তাহা ভ্রম, কারণ মূল ও কাণ্ডে প্রভেদ এই যে, কাণ্ডের পত্রীয় উপযোগিতা আছে, মূলের তাহা নাই।

নবজাত কাণ্ডের অগ্রভাগে একটী পত্র কলিকা থাকে; উহার

প্রতি কাণ্ডের বৃদ্ধি নির্ভর করে। কলিকা হইতে ক্রমশঃ পত্র বিকশিত হইয়া তাল খর্জ্জুরাদি বৃক্ষের কাণ্ড সরল ও শাখাবিহীন হইয়া উত্থিত হয়। অপর, উক্ত কাণ্ড ও পত্রের মধ্যে যে কোণ জন্মে, সেই কোণ হইতে অতিরিক্ত পার্শ্ব কলিকা উৎপন্ন হইয়া আম, জাম প্রভৃতি বৃক্ষের কাণ্ড শাখাবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

তালাদি যে সকল বৃক্ষের কাণ্ডে পার্শ্ব কলিকা না থাকাতে শাখা প্রশাখা জন্মে না, তাহাদের প্রধান পত্র কলিকা কোন প্রকারে নষ্ট হইয়া গেলে, বৃক্ষ একেবারে মরিয়া যায়। কিন্তু আম্রাদি যে সকল বৃক্ষের কাণ্ডে পার্শ্ব কলিকা জন্মিয়া থাকে, তাহাদের সেরূপ হয় না। এই শ্রেণীস্থ বৃক্ষের প্রধান কলিকা আহত হইলে, পার্শ্ব কলিকা গুলি সতেজে বর্দ্ধিত হয় এবং বৃক্ষকে বহু শাখা প্রশাখান্বিত করিয়া তোলে। অনেকে বৃক্ষকে ঝাকড়া করিবার অভিপ্রায়ে বৃদ্ধিশীল কলিকাগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকেন।—

কাণ্ডের যে গ্রন্থি হইতে পত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে পত্রগ্রন্থি এবং দুই পত্রগ্রন্থির মধ্যগত স্থানকে পর্ব্ব বা পাব কহে। এই পর্ব্বের দীর্ঘতা ও খর্ব্বতা অনুসারে কাণ্ডের আকারেরও ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে উদ্ভিজ্জের পর্ব্ব দীর্ঘ তাহার কাণ্ডও দীর্ঘ এবং যে উদ্ভিজ্জের পর্ব্ব খর্ব্ব তাহার কাণ্ডও খর্ব্ব হইয়া থাকে। কাণ্ডে কাষ্ঠের সঞ্চার হইয়া হইয়া দৃঢ় হইলে, দৃঢ় কাণ্ড এবং কাষ্ঠের অভাবে কোমল থাকিলে, কোমল কাণ্ড উদ্ভিজ্জ কহে। আম্রাদি দৃঢ় কাণ্ড এবং লতাদি কোমল কাণ্ড উদ্ভিজ্জের উদাহরণ। কোমল কাণ্ড উদ্ভিজ্জ অপেক্ষা দৃঢ় কাণ্ড উদ্ভিজ্জ দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

লাউ, কুমড়া পিপুল, পটল প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিজ্জের কাণ্ড দৃঢ়তার অভাবে মৃত্তিকার উপরে দণ্ডায়মান থাকিতে অক্ষম; এজন্য ইহারা অন্য বৃক্ষ বা পদার্থ আশ্রয় করিয়া উত্থিত হয় অথবা ধরাশায়ী হইয়া বৃদ্ধি পায়। ইহাদের কাণ্ডেও অল্প পরিমাণে কাষ্ঠের সত্ত্বা আছে। ইহাদের কাণ্ডে যে আঁকড়ি জন্মে, তাহা এক প্রকার রূপান্তরিত পত্র কলিকা ভিন্ন আর কিছু নহে। ঐ আঁকড়ি দ্বারা

অন্য পদার্থ অবলম্বনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উঠাই যেন উহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া অনুমিত হয়। এই নিমিত্ত লোকে উহাদের জন্য মাচা প্রস্তুত করে, কিম্বা ঘরের চাল বা অন্য বৃক্ষ আশ্রয়ের সুবিধা করিয়া দেয়।

আলু, মূলা, শালগাম প্রভৃতি উদ্ভিজ্জের কোমল কাণ্ড মৃত্তিকার উপরে থাকিলে, দারুণ শীতের প্রভাবে নির্জীব হইয়া যাইত, কিন্তু মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকায় শীতের অপকারিতা হইতে প্রকৃতিই উহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। ঐ সকল উদ্ভিজ্জের কাণ্ড কোনরূপে মৃত্তিকার বাহির হইয়া পড়িলে মৃত্তিকা দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে উহারা নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধি পায়।

উদ্ভিজ্জ মাত্রেরই কাণ্ড, ত্বক অর্থাৎ ছালে আচ্ছাদিত। ত্বক আছে বলিয়া কাণ্ডে সহসা আঘাত লাগিতে পারে না। উদ্ভিজ্জের পুষ্টি সাধন বিষয়েও ত্বক অনেক সাহায্য করে। যদি কোন প্রকারে ত্বকের বিশেষ অপচয় হয়, তাহা হইলে উদ্ভিদ নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়।

উদ্ভিজ্জের কাণ্ডে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্তর ও বিম্ববৎ পদার্থের নালি বা শিরা থাকে। তাহাদের কার্য্যও ভিন্ন ভিন্ন। তাহারা কাষ্ঠ, বল্কল প্রভৃতি উৎপন্ন করে ও মূল হইতে পত্র পর্য্যন্ত অপক্করস বহন করে এবং তথায় সেই রস পরিপক্ক হইলে, উদ্ভিজ্জের সর্ব্বাবয়বে বহন করে।

পত্রের কার্য্য।

পত্র উদ্ভিজ্জের শ্বাস যন্ত্র স্বরূপ, অর্থাৎ ইহা দ্বারা উদ্ভিজ্জ সমূহের শ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। অপর, উদ্ভিজ্জ দেহের পোষণোপযোগী রস প্রস্তুত করণ, প্রয়োজনীয় তরল পদার্থের পরিশোষণ এবং অতি-রিক্ত তরল পদার্থের বাষ্পাকারে বহিষ্করণ প্রভৃতিও পত্রের কার্য্য।

পত্রের প্রধান অংশ তিনটী যথা—(১) বিকশিত অংশ বা পত্র দল, (২) বৃন্ত অর্থাৎ পত্রের বোঁটা, (৩) বৃন্তকোষ অর্থাৎ যাহা কাণ্ডকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। পত্রদলে অসংখ্য সূক্ষ্ম শিরার বিন্যাস আছে। আম, কাঁটাল, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের তলায় অনেক দিনের পতিত পুরাতন পত্রের হরিতাংশ বিনষ্ট হইলে, তাহাতে জালাকার সূক্ষ্ম শিরা গুলির বিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে পত্র কঙ্কাল কহে। পত্রের আকৃতি অনুসারে ঐ শিরার বিন্যাস ভিন্ন রূপ হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিম্ববিশিষ্ট একখণ্ড পাতালা স্তর দ্বারা পত্র কঙ্কালের উপরি ও নিম্নতল আচ্ছাদিত থাকে; উহা সচ্ছিদ্র। স্থলজ উদ্ভিজ্জদিগের পত্রের উপরিতল অপেক্ষা নিম্নতল অধিক ছিদ্র বিশিষ্ট। জলজ উদ্ভিজ্জদিগের মধ্যে যাহাদের পত্র জলে ভাসমান থাকে, তাহাদিগের নিম্নতল অপেক্ষা উপরিতলে অধিক ছিদ্র। ঐ সকল ছিদ্র অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন স্পষ্ট দেখা যায় না। পত্র সকল আলোকের সাহায্য পাইলে, ঐ ছিদ্র পথে বায়ুর আঙ্গারিকাম্ল (কার্ব্বণিক এসিড) ভাগ গ্রহণ করে এবং অম্লজান (অক্সিজেন) পরিত্যাগ করে। আলোকের অভাবে অর্থাৎ রাত্রিকালে ঐ ক্রিয়া বিপরীত হয়। তখন বায়ুর অম্লজান গ্রহণ ও আঙ্গারিকাম্ল পরিত্যাগ করে। আঙ্গারিকাম্ল প্রাণিগণের পক্ষে অনিষ্টকারী, এজন্য রাত্রিকালে বৃক্ষতলে থাকা উচিত নহে।

উদ্ভিজ্জগণ মূল দ্বারা যে রস গ্রহণ করে, কতকগুলি শিরা দ্বারা তাহা পত্র পর্য্যন্ত নীত হয়, এবং পত্রের ছিদ্র দ্বারা তাহার কিয়দংশ বাষ্পাকারে বহির্গত হওয়ায় উক্ত রস ঘনীভূত হয়। এইরূপ বাষ্প পরিত্যাগ হেতু বায়ুমণ্ডল সিক্ত থাকায় ভূমিও অনেক পরিমাণে সরস থাকে। আর পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, উদ্ভিজ্জ পত্র প্রাণিগণের অনিষ্টকারী বায়ুস্থ আঙ্গারিকাম্ল গ্রহণ করে। অতএব উদ্ভিজ্জগণ দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা ও ভূমির উর্ব্বরতা পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

অপক্করস পরিশোধনে ও পত্রের বর্ণ করণে আলোকের অত্যন্ত প্রয়োজন। আলোকাভাবে উদ্ভিজ্জগণ অধিক কোমল, রসাল ও

শ্বেতবর্ণ হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাতে তাহারা যথানিয়মে ফল পুষ্প প্রসবে সমর্থ হয় না। এই জন্যই আওতা অর্থাৎ ছায়া-বিশিষ্ট স্থানে অধিকাংশ উদ্ভিজ্জ বিকৃত হইয়া যায়।

যদি কোন কারণ বশতঃ কোন উদ্ভিজ্জের সমুদায় পত্র একেবারে বিনষ্ট বা বিকৃত হয়, তাহা হইলে উপরি উক্ত কার্য্যগুলির অভাবে উদ্ভিজ্জের নিশ্চয়ই হানি হইবে। শরৎ বা শীতকালেই স্বভাবতঃই অনেক উদ্ভিজ্জের সমুদায় পত্র একেবারে পতিত হয়। কিন্তু তাহাদের পত্র পতনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই নবীনপত্র মুকুল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। এদেশে শজনা ও কুল প্রভৃতি কতকগুলি বৃক্ষের ফল ফুরাইয়া গেলে সমুদায় শাখা ছেদন করে, শাখা ছেদনের পর ঐ সকল বৃক্ষ কয়েক দিন সুপ্ত অবস্থায় থাকিয়া প্রচুর পত্র কলিকা প্রসব করে এবং সেই সকল পত্র কলিকাজাত নবীন শাখা প্রশাখাতেই পর বৎসর যথেষ্ট ফল ধরে। পত্র যত পুরাতন হয় ততই স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম হইয়া পড়ে; নবীন পত্রই অধিকতর কার্য্যক্ষম। শাখা প্রশাখার অগ্রভাগস্থ নবীন কোমল অংশেও কিয়ৎ পরিমাণে পত্রের কার্য্য হইয়া থাকে।

পুষ্প ও ফল।

আমরা এই স্থানে উদ্যানে রোপণযোগ্য কতিপয় ফলবৃক্ষের রোপণ প্রণালী মাত্র প্রকাশ করিলাম, অন্যান্য ফল পুষ্পাদির রোপণ প্রণালীও ক্রমশঃ বিবৃত হইবে। এই অবকাশে এ স্থলে পুষ্প ও ফল সম্বন্ধীয় কয়েকটী বৈজ্ঞানিক কথা সাধারণের অবগতির জন্য সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে। পুষ্পে সচরাচর চারিটী স্তবক দৃষ্ট হয়। দুইটী বহিঃস্তবক ও দুইটী মধ্যস্তবক। মধ্যস্তবক দুইটী পুং ও স্ত্রীজাতি ভেদক জননেন্দ্রিয়। ইহারা পুং ও স্ত্রী কেশর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সর্ব্ববহিঃস্থ স্তবকটীকে ইংরেজিতে

কেলিক্স ও তাহার পরেরটীকে করলা কহে। করলাই সাধারণতঃ পুষ্পের সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার এবং পরিমলের আধার স্থান। এই বহিঃস্তবক দুইটী উক্ত মধ্যস্তবকদ্বয়ের অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ের রক্ষার্থ আবরণ স্বরূপ। উদ্ভিজ্জবেত্তারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পুষ্পের ঐ অংশগুলি পরিবর্ত্তিত পত্র মাত্র। এখানে একটী গোলাপের কুঁড়ি ছাড়াইয়া ঐ অংশ সকল দেখান যাইতেছে—(১) চিহ্নিত অংশ বহিরাবরণ বা কেলিক্স (২) চিহ্নিত অংশ করলা, (৩) পুং কেশর, (৪) গর্ভকেশর।
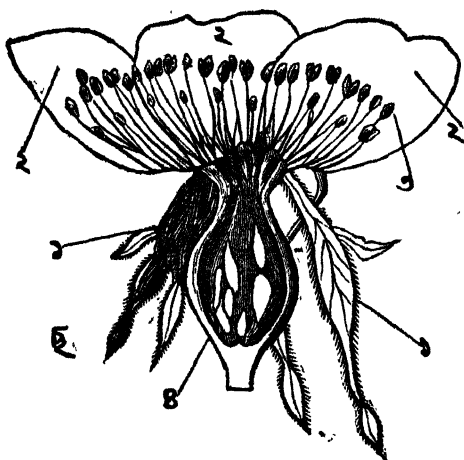
যে সকল পুষ্পের মধ্যে তৈলবৎ এক প্রকার পদার্থ থাকে, প্রায় সেই সকল পুষ্পই গন্ধ বিশিষ্ট হয়। সূর্য্যোত্তাপ পাইয়া অনেক পুষ্পের গন্ধ প্রকাশ পায়, কিন্তু রজনীগন্ধা-প্রভৃতি কতকগুলি পুষ্প রাত্রিকালেও গন্ধ বিস্তার করিয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিক সুগন্ধ পুষ্প দৃষ্ট হয়। পুষ্প প্রস্ফুটনের কোন অবধারিত কাল নাই। কোন জাতীয় পুষ্প প্রাতে, কোন জাতীয় পুষ্প মধ্যাহ্নে, কোন জাতীয় পুষ্প অপরাহ্নে এবং কোন জাতীয় পুষ্প রাত্রিতে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। কতক জাতি বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে পুষ্প প্রসব করে এবং কোন কোন জাতি বৎসরের

সকল সময়েই পুষ্পে সুশোভিত থাকে। পুষ্পের তুল্য মনোহর পদার্থ ভূমণ্ডলে আর নাই। পুষ্পরাজ্যে জগদীশ্বরের কি অদ্ভুত মহিমা ও শিল্প চাতুর্য্যই প্রকাশিত রহিয়াছে, কে তাহা প্রকাশ করিতে সক্ষম? ভিন্ন ভিন্ন দেশে কাননে, পর্ব্বতে, পুলিনে, প্রান্তরে, নানাবর্ণের বিভিন্ন আকৃতির মনোমুগ্ধকর অনন্ত পুষ্প দৃষ্ট হয়। ভিক্টোরিয়া রিগিয়া নামক আমেরিকার এক জাতীয় জলপদ্ম সদৃশ সুবৃহৎ পুষ্প এপর্য্যন্ত আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। উহার আকৃতি যেমন বড় দেখিতেও তেমনি মনোহর। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শিবপুরস্থ গবর্ণমেণ্ট বটেনিকাল উদ্যানে উহা উৎপাদন করা হইয়াছে।

পুষ্প হইতেই ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে; পুষ্প ভিন্ন ফল জন্মিতে পারে না। এদেশে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ডুমুরের ফুল না হইয়া ফল জন্মে। ইহা তাঁহাদের ভ্রান্তি। আমরা যাহাকে ডুমুর বলি তাহা বাস্তবিক ফল নহে, পৌষ্পিক আবরণ; ঐ পৌষ্পিক আবরণের মধ্যে অনেক ফল জন্মে লোকে ভ্রমবশতঃ সেই সকল ফলকে ডুমুরের বীজ বলে। পুংকেশরের অগ্রভাগস্থ রেণু গর্ভকেশরে পতিত হইলেই গর্ভকেশর পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়, তাহাই ফলের আদিমাবস্থা। সকল ফুলেরই একটু পরিণতাবস্থায় ঠিক মধ্যস্থলে একটী ছোট সবুজবর্ণের ফল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কড়াই সুঁটীর একটী ফুল সোজা চিরিয়া দেখিলে, দেখা যায় যে, গর্ভকেশর ক্রমে বড় হইয়া বীজ কোষ হইয়াছে, তাহা ঠিক কড়াই-সুঁটীর মত আকার পাইয়াছে; অবশেষে কিছুকাল পরে ইহাই ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (পর পৃষ্ঠার চিত্রে দেখ)

ইতিপূর্ব্বে পুষ্পের যে জননেন্দ্রিয় অর্থাৎ পুং ও স্ত্রী কেশরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদেরই পরস্পরের সংযোগে পুষ্পের গর্ত্ত-সঞ্চার হয়। পুষ্পের গর্ত্তসঞ্চার-ক্রিয়া অতি চমৎকার। পুং-কেশরের অগ্রভাগে স্থালীর আকার এক বস্তু আছে, তন্মধ্যে রেণু উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ রেণু পরিপক্ক হইলে, স্থালী বিদীর্ণ হইয়া বহির্গত হয়। স্ত্রী-কেশরের অগ্রভাগেও আটার ন্যায় এক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া

থাকে। উক্ত রেণু বায়ুদ্বারা কিম্বা কীটসংসর্গে সঞ্চালিত হইয়া স্ত্রী-কেশরের অগ্রভাগে পতিত হইলে, তাহাতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হয়। পরে রেণু হইতে সূত্রবহ নালী সকল বহির্গত হইয়া স্ত্রী-কেশরকে বিদারণ পূর্ব্বক বীজকোষ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিলেই পুষ্পের গর্ব্ভসঞ্চার
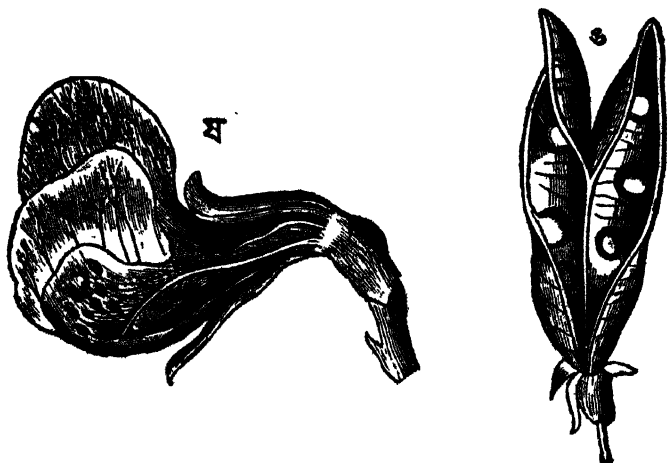
হয়। তখন পুষ্পদল ও পুং-কেশর সকল খসিয়া পড়ে, কেবল স্ত্রী-কেশর একাকী বৃদ্ধি পাইয়া ফল হইয়া উঠে। যাঁহাদের সূক্ষ্ম দর্শন আছে, তাঁহারা অভিনিবেশ পূর্ব্বক এই কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাণীদিগের গর্ব্ভ উৎপন্ন ও সন্তান প্রসব কার্য্যের সহিত পুষ্পের গর্ব্ভসঞ্চার ও ফলোৎপাদন ক্রিয়ার সুন্দর সামঞ্জস্য আছে। অধিকাংশ পুষ্পে উক্ত উভয় কেশর বিদ্যমান থাকে, কিন্তু কোন কোন পুষ্পে কেবল পুং-কেশর বা কেবল স্ত্রী-কেশর থাকে; তাহাদিগকে একলিঙ্গ পুষ্প কহে। একলিঙ্গ পুষ্প-দিগের মধ্যে পুং-কেশরবিশিষ্ট পুষ্প হইতে পুং-কেশরের রেণু বায়ু-দ্বারা চালিত বা ভ্রমরাদির গাত্রে লিপ্ত হইয়া স্ত্রী-কেশরবিশিষ্ট পুষ্পের স্ত্রী-কেশরে সংলগ্ন হইলে, তাহাতে ফল জন্মিতে পারে, কিন্তু কেবল পুং-কেশরবিশিষ্ট পুষ্পগুলিতে ফল জন্মে না।

পুষ্পের যে সকল অংশের কথা উল্লেখ করা হইল, সর্ব্বত্র তাহা-

দের সমান অবস্থা দৃষ্ট হয় না। কোন স্থলে প্রতি স্তবকের খণ্ড সকল একত্র মিলিত, কোন স্থলে একাধিক স্তবক এক সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ এবং কোন স্থলে বা বহিঃস্থ দুইটী স্তবক ও পুং-কেশর একত্র বদ্ধ হইয়া স্ত্রী-কেশরকে বেষ্টন করিয়া থাকে, ইহাতে ফুল ও ফলের আকারও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়।

বীজের উন্নতি সাধন দ্বারা ফুল ও ফলের উন্নতি সাধন।

উন্নত বীজ যে,কৃষির উন্নতি সাধন পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়, আজ পর্য্যন্তও ভারতবাসীর অন্তঃকরণে সে কথা ভাল রূপে স্থান পায় নাই। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার কত কত উদ্ভিজ্জবিদ্‌পণ্ডিত বিজ্ঞানের সাহায্যে এ বিষয়ে আশ্চর্য্য ফল দেখাইতেছেন; তাঁহাদের যত্নে অব্যবহার্য্য উদ্ভিজ্জাদি ব্যবহারযোগ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে, বিস্বাদ ফলে মধুর আস্বাদ ঘটিতেছে, ছোট আকৃতির ফলফুল বড় হইয়া উঠিতেছে। ফলতঃ যেখানে চেষ্টা আছে, উন্নতিও সেই স্থানে হইয়া থাকে; যত্ন ও উদ্যম বিহীনে কোথাও উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃষি বিষয়ে ভারতবাসীর মনোযোগ মাত্র নাই, সুতরাং এদেশে ইহার উন্নতিও হইতেছে না।

এদেশের লোকের মনে এইরূপ সংস্কার যে, যে বীজের জীবনী শক্তি আছে, অর্থাৎ যাহা রোপণ করিলে অঙ্কুর জন্মে সেই বীজই ভাল; ফলফুলের উৎকর্ষাপকর্ষ মৃত্তিকার দোষ গুণে হইয়া থাকে। মৃত্তিকার দোষ গুণে যে, ফল ফুল ভাল মন্দ হয়, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু কেবল মৃত্তিকার দোষ গুণ ঐ ভাল মন্দের জন্য দায়ী নহে; বীজের উৎকর্ষাপকর্ষেও উক্ত দোষ গুণ ঘটিয়া থাকে। বীজ সংগ্রহ বিষয়ে এদেশীয় কৃষকদিগের বড়ই তাচ্ছিল্য দৃষ্ট হয়। কৃষকেরা সুপক্ক, অপক্ক, সতেজ, নিস্তেজ, সকল ফল এক সঙ্গে সংগ্রহ পূর্ব্বক সকলের

বীজ একত্রে মিশ্রিত করে; বীজ বাছাই করার প্রথা এদেশে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বীজ সংগ্রহের এইরূপ দোষে এদেশে অনেক উদ্ভিদের ফলফুল নিকৃষ্ট হইয়া যাইতেছে। উত্তম ফল প্রাপ্তির আশা থাকিলে, উৎকৃষ্ট বীজের অবশ্যই প্রয়োজন। কি প্রকারে বীজ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য নিম্নে তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, সতেজ বৃক্ষেই ভাল ফলফুল ধরিয়া থাকে। অতএব উত্তম ফলফুল প্রাপ্তির নিমিত্ত উদ্ভিজ্জদিগকে সতেজ অবস্থায় রাখার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। সচ্ছন্দ স্থানে বাস এবং পুষ্টিকর খাদ্যের সুবিধা থাকিলে,উদ্ভিজ্জগণ সতেজ থাকিতে পারে। কিরূপ আবাস স্থান ও কিরূপ খাদ্য কোন্ প্রকার উদ্ভিজ্জের পক্ষে হিতকারী তাহা জানিবার জন্য কৃষকের কিছু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও বহুদর্শিতা থাকা আবশ্যক। অম্লজান, যবক্ষারজান, অঙ্গারিকাম্ল, জলজান, প্রভৃতি কতকগুলি বায়বীয় পদার্থ এবং পটাশ, ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ফরাস্, চূণ প্রভৃতি কতকগুলি পার্থিব পদার্থ উদ্ভিজ্জগণের শরীর পোষণার্থ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বায়বীয় পদার্থ গুলি প্রায়ই তাহারা বায়ু হইতে গ্রহণ করে এবং পটাশাদি পদার্থ মূল দ্বারা শোষণ করিয়া মৃত্তিকা হইতে প্রাপ্ত হয়; মৃত্তিকায় এই সকল পদার্থের অল্পতা বা অভাব ঘটিলেই সার প্রদানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। জীব জন্তুর মলমূত্র, খৈল, ভস্ম, চূর্ণ, অস্থি, গলিত জীব ও উদ্ভিদ প্রভৃতিতে ঐ সকল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে। এই জন্যই উহারা সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিজ্জের প্রকৃতি অনুসারে কাহারও পক্ষে উক্ত পটাশাদির মধ্যে কোন পদার্থ বেশী এবং কাহার ও পক্ষে কম আবশ্যক। এই নিমিত্ত যে সারে যে উদ্ভিজ্জের পোষণোপযোগী পদার্থ অধিক আছে, তাহাই তাহার পক্ষে অধিক উপকারী হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্জগণের প্রকৃতি অনুসারে প্রয়োজনীয় সার প্রদত্ত না হইলে, সে সারে কোন উপকার দর্শে না, বরং কখন কখন হানি হইয়া থাকে। এই জন্য যে সার যে উদ্ভিজ্জের উপযোগী, কৃষকের তাহা জানা আবশ্যক।

উপযুক্ত সার দিয়া ও রীতিমত পাইট করিয়া, যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিলে, বৃক্ষ মাত্রেই সতেজ হয়, সুতরাং ফলের অবস্থাও ভাল হইয়া থাকে। এই সকল ফলের মধ্যে যে গুলি বড় এবং নিখুত, বীজ সংগ্রহের নিমিত্ত সেই গুলি বাছিয়া বাছিয়া মনোনীত করিবে। এক গাছে অনেক ফল থাকিলে, তাহাদের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট হয়, এজন্য যে বৃক্ষের ফল হইতে বীজ সংগ্রহের কল্পনা থাকিবে, তাহার কতক ফল তুলিয়া লইবে। ফল সুপক্ক না হইলে বীজ সংগ্রহ করিবে না। সংগৃহীত বীজের মধ্যে যে গুলি অপুষ্ট সে গুলি বাছাই করিয়া ফেলিয়া দিবে এবং ভাল পুষ্ট বীজগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া যত্নপূর্ব্বক রাখিবে। এমন অনেক উদ্ভিজ্জ আছে যে, তাহাদের বীজ সদ্য সদ্য রোপণ না করিলে অঙ্কুর জন্মে না, তাহাদের বীজ শুষ্ক না করিয়া সদ্য সদ্যই রোপণ করিবে। আবার অনেক উদ্ভিজ্জের বীজ, রোপণের সময় পর্য্যন্ত শুষ্ক অবস্থায় না থাকিলে, উৎপাদিকাশক্তিবিহীন হয়; সেরূপ বীজ শুষ্ক বশতঃ ধূলার সহিত মিশ্রিত করিয়া বোতলের মধ্যে রাখিলে ভাল থাকে।

উপরে যেরূপ কথিত হইল, সেই প্রকারে বীজ সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহা উপযুক্ত সময়ে চাষে ব্যবহৃত হইলে এবং ভূমির পাইট ও সার প্রদান ক্রিয়া রীতিমত সম্পন্ন হইলে, অবশ্যই তাহাতে পূর্ব্বের অপেক্ষা উন্নত ফল উৎপন্ন হইবে; তাহাদের মধ্য হইতেও ভাল ফলগুলির বীজ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সংগ্রহ করিবে। এই প্রকারে বীজ সংগ্রহের প্রথা অবলম্বিত হইলে,উত্তরোত্তর ফুলফলের উন্নতি হইয়া, পরে তাহা আদিম অবস্থার সহিত তুলনায় এত উৎকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইবে যে,তখন তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় বলিয়া বোধ হইবে।

কৃষিবিষয়ক কতকগুলি চলিত শব্দের ব্যাখ্যা।

কৃষিবিষয়ে এরূপ কতকগুলি গ্রাম্যশব্দ প্রচলিত আছে, যাহাদের অর্থ অভিধানে পাওয়া যায় না। চাষপ্রণালী লিখিবার সময়, ঐ

সকল শব্দ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিতে হইবে। এজন্য ঐ রূপ কতক-গুলি শব্দের ব্যাখ্যা নিম্নে লিখিত হইল।

পলিমাটী।—কোন নিম্নস্থানে চারিদিকের জল গড়াইয়া আসিলে, নীচে যে সরের মত মাটী জমে, তাহাই পলিমাটী। নদী বা খালের কূলেও ঐ রূপ মাটী জমিয়া থাকে।

বোঁদমাটি। মৃত বৃক্ষলতাদি বহুকাল মৃত্তিকাচ্ছাদিত থাকিলে, পরিণামে তাহা একরূপ কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকায় পরিণত হয়। পুষ্করিণী, কূপ প্রভৃতি খননকালে অনেক সময় ঐ প্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। উহাকে বোঁদ মাটী কহে।

দোঁ-আঁশ মাটী।—এটেল ও বালি মিশ্রিত মৃত্তিকাকে দোঁ-আঁশ মাটী কহে।

ফাস-মাটী। গবাদি পশুর বিষ্ঠা বিকৃত হইয়া মাটীর মত হইয়া গেলে, তাহাকে ফাস-মাটী কহে।

হাপোর। কোন ছায়াবিশিষ্ট শীতল স্থানের মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক তাহার কাঁকরাদি বাছিয়া মৃত্তিকাকে ধূলার ন্যায় গুড়া করিয়া জল-সিঞ্চন করতঃ স্থানটীকে সরস রাখিতে হয়। ঐ স্থানকে হাপোর বলে। ইহা চারা উৎপাদন ও কলমের চারা রক্ষণ জন্য সর্ব্বদা প্রয়োজন হয়। হাপোরের মাটীতে বালির অংশ বেশী থাকে। প্রয়োজন হইলে ঐ স্থানের মৃত্তিকার সহিত নানাপ্রকার সারও মিশান হয়।

মাদা। বর্ষার জল বা সিঞ্চিত জল খাওয়াইবার জন্য, কখন কখন বৃক্ষের গোড়ার মাটী খুঁড়িয়া কতদূর বেষ্টনপূর্ব্বক মৃত্তিকাদ্বারা এরূপ আইল বান্ধা হয় যে, জল সহসা চারিদিকে সরিয়া যাইতে পারে না। ইহাকে মাদা বা আলবাল কহে। ক্ষেত্রের সমস্ত জমি সমান ভাবে পাইট না করিয়া যে যে স্থানে বীজ বা চারা বসাইতে হইবে সেই সেই স্থানে এক একটী গর্ত্তের মত করিয়া তত্রত্য মাটী উত্তমরূপে পাইট করা হয়, ঐ সকল গর্ত্তকেও মাদা বলিয়া থাকে।

দাঁড়া। দুই পার্শ্ব হইতে মৃত্তিকা তুলিয়া মধ্য স্থলে লম্বালম্বি ভাবে আইলের ন্যায় প্রস্তুত করাকে দাঁড়া কহে।

জুলি। নিকটবর্ত্তী দুইটী দাড়ার মধ্যস্থ নিম্ন স্থানকে জুলি বা জোল কহে।

আওতা। ছায়া বিশিষ্ট স্থানকে আওতা কহে।

আবাদ। বীজ বপন বা রোপণ ও পাইট ইত্যাদি কার্য্যকে আবাদ বলে।

চাষ। অনেক স্থলে চাষ ও আবাদ একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। সাধারণতঃ চাষ শব্দের অর্থ মৃত্তিকা খননাদি কার্য্য।

যো। যখন জমির অবস্থা এরূপ থাকিবে যে, জমিতে রস থাকিবে, অথচ লাঙ্গল বা কোদালে মাটী জড়াইয়া লাগিবে না তখন জমির সেই অবস্থাকেই যো কহে।

নীড়ান। ঘাস, দূর্ব্বা, কাঁটাগাছ প্রভৃতি তুলিয়া ফেলাকে নীড়ান কহে, যে অস্ত্রদ্বারা এই সম্পন্ন হয় তাহার নাম নীড়েন।

পাইট। মাটীখোঁড়া, ডেলাভাঙ্গা, নীড়াইয়া দেওয়া, কাঁকরাদি বাছিয়া ফেলা প্রভৃতিকে পাইট বলে।

পাতো। চারা জন্মাইবার জন্য কখন কখন কোন অল্প পরিসর স্থান উত্তম রূপে পাইট করিয়া, তথায় বীজ রোপণ বা বপন করা হয়, ইহাকে বীজ পাতো দেওয়া বলে।

চৌকা। প্রান্তর বা উদ্যান মধ্যে চতুষ্কোণাকার পৃথক পৃথক খণ্ড চিহ্নিত করত এক এক খণ্ডে এক এক রকমের শাকসবজি বা পুষ্প উৎপাদন করা হয়, ঐ চতুষ্কোণাকারের খণ্ডগুলিকে চৌকা বলে।

বারমাসে কৃষকের কার্য্য।

বৈশাখ।—বর্ষার ফসলের চাষ এই মাসেই আরম্ভ করিতে হয়। 'যো' হইলেই জমিতে লাঙ্গল দিবে এবং ভূট্টা, অরহর, কাঁকুড়, ডেঙ্গো, নটেশাক, আদা, হলুদ, এরারুট, মেটে আলু, শাঁক-আলু, বিলাতী কুমড়া, ঝিঙ্গে, পাট, শণ, প্রভৃতির আবাদ আরম্ভ করিবে।

উহাদের চারা জন্মিলে ক্ষেত্র পরিষ্কৃত রাখা, গোড়ার মাটী খুঁড়িয়া দেওয়া এবং আবশ্যকমত জলসেচন করা প্রভৃতি কার্য্য করিবে। কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, প্রত্যেকের চাষ-প্রণালী পৃথক পৃথক লিখিবার সময় বর্ণিত হইয়াছে। চৈত্র মাসে বেগুণের চারা প্রস্তুত হইয়া থাকিলে ক্ষেত্রে বসাইবে। না হইয়া থাকিলে চারা করিবে। বোরো ধান কাটা ও আশু এবং আমোন ধান্যের বীজ ছড়ান, এই মাসে কৃষকদিগের প্রধান কার্য্য।

জ্যৈষ্ঠ।—বৃষ্টির সুবিধা হইলে বৈশাখ মাসেই বর্ষার ফসলের চাষ আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে সেই সকলের তদ্বির ও পাইট করাই কৃষকের প্রধান কার্য্য। যদি অনাবৃষ্টি বা কোন অসুবিধা বশতঃ বৈশাখ মাসে সেই সকলের চাষ আরম্ভ না হইয়া থাকে, তবে জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহা করিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে যে সকল ফল-বৃক্ষের ফল পরিপক্ক হয়, তাহাদের চারা জন্মাইতে হইলে, এই মাসে টাটকা বীজরোপণ করিবে। ডেঙ্গে-ডাটার বীজ এই মাসেও বপন করা যাইতে পারে। বেগুনের চারা রোপণ করিবে। পাট ও শোণের বীজ ছড়াইবে।

আষাঢ়।—এই মাসে পুরাতন কলার ঝাড় হইতে দুইটীমাত্র বোগ রাখিয়া বাকি তুলিয়া ফেলিবে এবং সেই সকল নূতন জমিতে বসাইবে। চারা জন্মাইবার জন্য আম, কাঁঠালাদি ফলের বীজ এমাসেও রোপণ করিতে পারা যায়। আনারসের চারা পুতিবে। লঙ্কামরিচের চারা জন্মাইবে। নারিকেলের চারা হাপোর হইতে তুলিয়া স্থায়ীরূপে জমিতে রোপণ করিবে। বড় বড় বৃক্ষের চারা নাড়িয়া পুতিতে হইলে এই সময়ে পুতিবে। বড় বড় ফল বৃক্ষের গোড়ায় আইল বান্ধিয়া এই মাসে বর্ষার জল খাওয়াইবে। নূতন কোঁড় বাহির হইলে বাঁশের ঝাড় ঘেরিয়া দিবে। আমোন ধান্য রোপণ করা এই মাসে কৃষকদিগের প্রধান কার্য্য।

শ্রাবণ।—এই মাসে বর্ষা প্রবল থাকে; এজন্য কোনপ্রকার ফসলের নূতন আবাদ হয় না। এই মাসে বেল, মল্লিকা, যুঁই প্রভৃতি

পুষ্প বৃক্ষের ডাল ছাটিয়া দিবে। কোন গাছের গোড়ায় জল না বসে, তাহার উপায় করিবে। লঙ্কা মরিচের চারা এই মাসে রোপণ কর্ত্তব্য। ইক্ষুগাছের নত পত্রগুলিদ্বারা তিন চারিটী গাছ এক সঙ্গে জড়াইয়া দিবে। আদা, হলুদ, বেগুণ প্রভৃতি গাছের গোড়ায় কোদাল দিয়া মাটী ধরাইয়া দাঁড়া বান্ধিবে। পাটের গাছ কাটিয়া পচাইবে ও কাচিবে। নিম্ন জমির আউস ধান এই মাসে পাকে, তত্রত্য কৃষকেরা তাহা কাটিবে ও ঝাড়িবে।

ভাদ্র।—এই মাসে এদেশে বর্ষার শেষ হয় না; এজন্য হৈমন্তিক শস্যাদির চাস আরম্ভ হইতে পারে। টবে বা গামলায় করিয়া বান্ধা কপি ও ফুল কপির চারা প্রস্তুত করিবে। লাউর বীজ রোপণ করিবে। আশ্বিন মাসে যে সকল ফসলের আবাদ আরম্ভ হইবে, তাহাদের জমি প্রস্তুত করিবে ও সার দিবে। তামাকের বীজ বপন করিবে। চারা জন্মাইবার জন্য হাপোরে উত্তম ঝুনা নারিকেল বসাইবে। উচ্চ জমির পাট এই মাস পর্য্যন্ত রাখিয়া কাটা যাইতে পারে। এই মাসে আউস ধান্য কাটা ও ঝাড়া শেষ হয়, উচ্চ জমির আউস ধান্যই এই মাসে পাকিয়া থাকে। আমোন ধানের গাছ শ্রাবণ মাস হইতে আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত রোপণ করা যায়।

আশ্বিন।—বর্ষার শেষ হইলেই যাবতীয় রবি ফসলের আবাদ আরম্ভ হয়। এদেশে ভাদ্রমাসেই প্রায় বর্ষার অন্ত হইয়া থাকে; সুতরাং আশ্বিন মাস হইতে রবিশস্যের চাষ আরম্ভ হইতে পারে। কিন্তু যে বৎসর আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বর্ষা থাকিবে, সে বৎসর কার্ত্তিক মাসে রবিশস্যের চাষে প্রবৃত্ত হইবে। আবাদ অগ্রিম আরম্ভ হইলে, ফসলও অগ্রিম পাওয়া যায় এবং অগ্রিম ফসলে লাভও অধিক হয় সত্য, কিন্তু বর্ষা থাকিতে ঐ চেষ্টা কখনও সফল হইবে না। অতএব যদি বর্ষার জন্য আশ্বিন মাসে আবাদের সুবিধা না পাওয়া যায়, তবে কার্ত্তিক মাসেই রবি ফসলের আবাদ আরম্ভ করিবে।

এই সময়ে সর্ব্বপ্রকার কপি, রাঙ্গা-আলু, গোল-আলু, উচ্ছে, পটল, পলাণ্ডু, মূলা, শালগাম, গাজর, কড়াই-সুঁটী, পালঙ, টক-

পালঙ্, বিলাতী সীম, চীনের বাদাম, মানকচু, বিলাতী কুমড়া, তর্ম্মুজ, কাঁকুড়, ভুঁয়ে শসা, যব, গম, ছোলা, মটর, মুগ, সর্ষপ, মসুরী, খেঁসারী, ধনে, মেথি, মৌরী, কার্পাস, কালজিরে, সুল্প, তামাক প্রভৃতির বীজ রোপণ বা বপন করিবে।

কার্ত্তিক।—বর্ষা শেষহেতু যদি সুবিধা পাইয়া ঐ সকলের চাষ আশ্বিন মাসে আরম্ভ করিয়া থাক, তবে কার্ত্তিকমাসে তাহাদের ক্ষেত্র খুঁড়িয়া ও নীড়াইয়া দেওয়া, আবশ্যকমত জলসিঞ্চন করা প্রভৃতি যাহার প্রতি যে ব্যবস্থা, তাহা করিবে।

বর্ষার জল খাওয়াইবার নিমিত্ত যে সকল ফল বৃক্ষের গোড়ায় আইল বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, কার্ত্তিক মাসে তাহা ভাঙ্গিয়া সার মিশ্রিত নূতন মৃত্তিকাদ্বারা গোড়া ঢাকিয়া দিবে। গোলাপ ক্ষেত্রের প্রতি মনোযোগ করিবার এই প্রকৃত সময়। গোলাপের গোড়ার মাটী খুঁড়িয়া দিবে, ডাল ছাটিয়া ফেলিবে এবং কলম করিবে। ফল ও ফুলের উদ্যানস্থ যাবতীয় বৃক্ষের গোড়ার মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দিবে। বাঙ্গালার দক্ষিণ অঞ্চলের স্থানে স্থানে এই সময় হইতেই ইক্ষুর আবাদ আরম্ভ হয়।

অগ্রহায়ণ।—এদেশে আশ্বিন মাসেই বর্ষার অন্ত হইয়া যায়, সুতরাং কার্ত্তিক মাসে অধিকাংশ রবি ফসলের চাষ আরম্ভ হইয়া থাকে। যব, গম, ছোলা, মটর, খেসারী, মুগ, মসুর, সর্ষপ, কড়াইশুঁটী, ধনে, কালজিরে, মৌরী, সুল্প, মেথি, পেঁয়াজ, পটোল, উচ্ছে, কার্পাস, বিলাতী কুমড়া, পালঙ, মুলা, চাঁপানটে, শালগাম, গাজর, বীট, আর্টিচোক, ক্রেশ, টমাটো, এণ্ডিব, লেটুস, থেম, সেলেরী প্রভৃতি দেশীয় এবং বিদেশীয় শস্য ও শাকসবজির বীজ রোপণকার্য্য, বর্ষার শেষ হইয়া গেলে, আশ্বিনের শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শেষ করা উচিত। যদি কোন প্রতিবন্ধকে তাহা না হইয়া থাকে, তবে অগ্রহায়ণের প্রথমে রোপণ করিবে। কিন্তু এইরূপ সময় গত করিয়া বীজ বোনার দোষ এই, উহাতে ফসল নাবি হয়, নাবি ফসল ফলনে কম হইয়া থাকে।

অগ্রে বীজবপন করিলে, ফসলও অগ্রে প্রস্তুত হয়; তখন নূতন বলিয়া ঐ অগ্রিম ফসলে যেমন লাভ হইয়া থাকে, নাবি ফসলে সেরূপ লাভ হয় না। এজন্য বিশেষ প্রতিবন্ধক না ঘটিলে, সময় গত করিয়া বীজ রোপণ করা কখন পরামর্শসিদ্ধ নহে।

কার্ত্তিকমাসে উপরি-উক্ত শাকসবজি ও শস্যাদির বীজ বোনা হইয়া থাকিলে, আবশ্যকমত উহাদের ক্ষেত্রে জল দেওয়া, গোড়ার মাটী খোঁড়া এবং ঘাস দুর্ব্বাদি নীড়াইয়া ফেলাই অগ্রহায়ণ মাসে কৃষকের কার্য্য। এই মাসে কপি ও আলু গাছের গোড়ায় দাঁড়া বান্ধিবে। যে নূতন জমিতে চৈত্র বৈশাখে হলুদ রোপণের মনস্থ আছে, এই অগ্রহায়ণ মাসে সেই ক্ষেত্র একবার কোদ্‌লাইয়া রাখিবে। পুরাতন হলুদের ক্ষেত্র হইতে হলুদ তুলিবে। উচ্চ জমির আমন ধান্য এই মাসেই পাকে, তত্রত্য কৃষকেরা তাহা কাটিবে ও ঝাড়িবে।

পৌষ।—এদেশীয় কৃষকদিগকে পৌষমাসে প্রায় কোন নূতন কৃষিতে প্রবৃত্ত হইতে হয় না। কারণ এই মাস কোন প্রকার শস্য বা শাকসবজির বীজরোপণের উপযুক্ত সময় নহে। নাবাল জলা-জমির ধান্য এই মাসে পাকে, উহা কাটা ও ঝাড়া এই মাসে কৃষকের প্রধান কার্য্য। এতদ্ভিন্ন কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে যে সকল ফসলের চাষ হইয়াছে, আবশ্যক মত তাহাদের পাইট করিতে হইবে। তামাকের ডগা, ফুলের কুঁড়ি, ও ছোট পাতা ভাঙ্গিয়া দেওয়া, অগ্রহায়ণ মাসে হলুদ তোলা শেষ হইয়া না থাকিলে তাহা তোলা, আলু গাছের গোড়া খুঁড়িয়া কতক আলু তুলিয়া লওয়া প্রভৃতিও এই মাসের কার্য্য।

মাঘ।—এই মাসে বৃষ্টি হইলেই 'যো' বুঝিয়া লাঙ্গল ও কোদাল দ্বারা ভূমি খনন করিবে এবং এই মাসে জমিতে সার দিবে। মানকচু রোপণ করিবে। উত্তম বীজ প্রস্তুত জন্য মূলা ও বীটপালঙের অগ্রভাগ কাটিয়া রোপণ করিবে। সর্ষপ, চিনের বাদাম, মৌরী প্রভৃতির গাছ তুলিয়া শস্য সংগ্রহ করিবে। ইক্ষু কাটিয়া মাড়িতে

আরম্ভ করিবে। ফল ফুরাইয়া গেলে কুল গাছের ডাল কাটিয়া ফেলিবে। আদা, হলুদ প্রভৃতি তুলিতে আরম্ভ করিবে। ধান কাটা হইয়া গেলে নাড়ায় আগুণ লাগাইয়া জমি পোড়াইলে, তাহাতে উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইবে। তর্ম্মুজ, খর্ম্মুজ, খেড়ো, ফুটী, থুবিঝিঙ্গে, উচ্ছে, ভুঁয়েশশা, আমেরিকান শশা, সেলেরি প্রভৃতি এই মাসে রোপণ করা যাইতে পারে।

ফাল্গুন।—মাঘ মাসে জমি খোঁড়া বা সার দেওয়া কার্য্যের সুবিধা না হইয়া থাকিলে, ফাল্গুন মাসে "যো" হইলেই তাহা করিবে। ইক্ষুর ডগা সকল বীজের জন্য হাপোরে বসাইবে। যব, গম, মুগ, মটর প্রভৃতি রবিশস্য পাকিবামাত্র তাহাদের গাছ কাটিয়া শস্য সংগ্রহ করিবে। তর্ম্মুজ, খর্ম্মুজ, খেড়ো, ফুটী, থুবিঝিঙ্গে, ভুঁয়েশশা প্রভৃতির বীজ এইমাসে রোপণ করিবে।

চৈত্র।—ফাল্গুন মাসেই ক্ষেত্রের রবি ফসল সকল উঠিয়া যায়। এদিকে বৈশাখ মাস না আসিলে, বর্ষাদি ফসলের আবাদ আরম্ভ হয় না। এজন্য চৈত্র মাস ক্ষেত্রের একরূপ বিশ্রাম অবস্থা, কিন্তু 'যো' হইলেই এই মাসে জমিতে লাঙ্গল দিবে, তাহাতে বৈশাখ মাসের রোপণযোগ্য ফসলের পক্ষে সুবিধা হইবে। বেগুণের চারা এই মাসে প্রস্তুত করিবে। বাঁশের ঝাড়ে নূতন মাটী তুলিয়া দিবে। বিলাতী কুম্‌ড়া, কাঁকুড়, করলা, ওল, আম-আদা, চাঁপানটে, শাঁক, আলু, ইক্ষু প্রভৃতি, বৃষ্টির সুবিধা হইলে এই মাসে রোপণ করা যাইতে পারে; নতুবা বৈশাখ মাসে রোপণ করাই ভাল।

মৃত্তিকা পরীক্ষা।

মৃত্তিকা পরীক্ষা কৃষিকার্য্যের একটী প্রধান বিবেচ্য বিষয়। উদ্ভিজ্জদিগের স্বভাবানুসারে মৃত্তিকা নির্ব্বাচন করিতে না পারিলে, চাষের সমুদায় পরিশ্রম বিফল হয়, কিন্তু প্রকৃত পরীক্ষা দ্বারা মৃত্তিকা

ঠিক্ করা বড় কঠিন। কারণ রসায়নশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে, প্রকৃত পরীক্ষা হয় না; আর তাহার অনুষ্ঠানও গুরুতর; এজন্য তদ্রূপ সূক্ষ্ম পরীক্ষা সাধারণের সাধ্যায়ত্ত নহে। সামান্যতঃ যে প্রকারে মৃত্তিকার পরীক্ষা হইতে পারে, তাহাই এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

এটেল, বালি, গন্ধক, লোহা, লবণ, চুণ, কার্ব্বন, ম্যাগনেসিয়া, পটাশ ও ফসফরাস প্রভৃতি পদার্থগুলি মৃত্তিকার উপাদান। তন্মধ্যে এটেল্ ও বালি প্রধান এবং উহা সামান্য দৃষ্টিতেই চিনিয়া লইতে পারা যায়। এজন্য সচরাচর লোকে মৃত্তিকাকে বালি ও এটেল এই দুইভাগে বিভক্ত করে। এটেল মাটীর লক্ষণ এই, উহাতে জল ঢালিলে তাহা সহসা চারিপার্শ্বে সরিয়া না গিয়া জমা হইয়া থাকে, সূর্য্যোত্তাপে শীঘ্র উত্তপ্ত হয় না এবং হাতে লইয়া টিপিলে অঙ্গুলিতে লাগিয়া যায়। বেলেমাটির লক্ষণ ঠিক ইহার বিপরীত অর্থাৎ বালি জলধারণ করিতে পারে না, সূর্য্যোত্তাপে শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং হাতে লইয়া টিপিলে অঙ্গুলিতে জড়াইয়া লাগে না। বিশুদ্ধ বালি বা শুদ্ধ এটেল মাটিতে কোন বৃক্ষ জন্মিতে পারে না, উহারা উভয়ে অথবা উহাদের সহিত অন্যান্য উপাদান গুলির মিশ্রণে যে মৃত্তিকা জন্মে তাহাই কৃষিকার্য্যের উপযোগী।

যে সকল বৃক্ষের মূল শাখা-বিশিষ্ট,—যেমন আম, জাম, কাঁটাল ইত্যাদি, ইহাদের নিমিত্ত এটেল মৃত্তিকার ভাগ অধিক থাকে, এরূপ মৃত্তিকা উত্তম। যাহাদের কাণ্ডে ও ফলে জলের অংশ অধিক,—যেমন তর্ম্মুজ, ফুটী ইত্যাদি, ইহাদের জন্য বালির অংশ বেশী থাকে, এরূপ মৃত্তিকা উপযোগী। আর যাহাদের কাণ্ড মৃত্তিকাভ্যন্তরে বৃদ্ধি পায় এবং মূল কোমল ও সরস,—যেমন আলু, কচু ইত্যাদি, বালি ও এটেলের সমভাগবিশিষ্ট মৃত্তিকা তাহাদের পক্ষে উত্তম। ফলতঃ উদ্ভিজ্জগণের স্বভাবানুসারে কাহারও পক্ষে এটেলের ভাগ অধিক, কাহারও পক্ষে বালির ভাগ অধিক, এবং কাহারও পক্ষে উভয়ের সমান ভাগ থাকা আবশ্যক। এখন কথা এই, কোন্ মৃত্তিকায়

কাহার কিরূপ অংশ আছে, তাহা কিরূপে স্থিরীকৃত হইবে? বহুদর্শী বিবেচক কৃষকেরা মৃত্তিকার অবস্থা দর্শনমাত্রেই তাহাতে বালি কি এটেলের ভাগ অধিক, তাহা বলিতে পারেন। কোন স্থানে মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক তাহাতে জল ঢালিলে যদি শুকাইয়া কঠিন চাপ বান্ধে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এটেলের ভাগ বেশী আছে, আর তাহা না হইলেই বালির অংশ অধিক আছে মনে করিতে হইবে। কিন্তু উহারা কিরূপ অংশে মিশ্রিত আছে অর্থাৎ তোমার প্রার্থনানুরূপ ভাগপরিমাণ আছে কিম্বা ন্যূনাতিরেক আছে, তাহা তুমি কিরূপে জানিবে? বস্তুতঃ অনুমানে ইহা ঠিক করা বড় কঠিন। ঐ মিশ্রণের অংশ পরিমাণ জানিবার উপায় এই,—প্রথমতঃ যে স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতে হইবে, সেই স্থান হইতে কিয়দংশ শুষ্ক মৃত্তিকা আনিয়া ওজন করিবে। পরে তাহা অগ্নিতে পোড়াইয়া সেই পোড়া মৃত্তিকা কোন পাত্র মধ্যে জলে গুলিবে। ইহাতে এটেল মাটীর অংশ জলের সহিত মিশ্রিত এবং বালির অংশ জলের তলায় পতিত হইবে। অনন্তর ঐ ঘোলা জল আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিয়া তলার সমস্ত বালিগ্রহণ পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া ওজন করিলে, ঐ মৃত্তিকায় কি পরিমাণে বালি ও এটেল মাটী মিশ্রিত ছিল তাহা জানা যাইবে। পোড়াইয়া ওজন করিলে পূর্ব্ব পরিমাণাপেক্ষা যত কম হইবে, উহাতে অন্যান্য পদার্থ তত ছিল বিবেচনা করিতে হইবে।

উল্লিখিত রূপে পরীক্ষা করিয়া, ঐ স্থানের মৃত্তিকায় বাঞ্ছিত অপেক্ষা এটেল মৃত্তিকার অংশ কম দৃষ্ট হইলে, অন্য স্থান হইতে এটেল মৃত্তিকা এবং বালির অংশ কম দৃষ্ট হইলে, অন্য স্থান হইতে বালি আনিয়া মিশ্রিত করিতে হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, একেবারে বিশুদ্ধ এটেল মৃত্তিকা পাওয়া দুর্ঘট, প্রায়ই বালি মিশ্রিত থাকে। অতএব মিশ্রণকালে সে বিষয়েও বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

কোন স্থানের মৃত্তিকার উর্ব্বরতা সাধারণরূপ জানিতে হইলে, প্রথমতঃ তথায় যে সকল তৃণাদি উদ্ভিজ্জ আছে, তাহাদের বৃদ্ধি-

শীলতা সন্তোষজনক কি না দেখিবে। তৃণজাতি স্বভাবতঃ উর্ব্বরা মৃত্তিকা না পাইলে কখন তেজোবন্ত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ঐ ক্ষেত্রের কিয়দংশ অত্যন্ত শুষ্ক মৃত্তিকা ও কিছু ভিজা মৃত্তিকা লইয়া অঙ্গুলি দ্বারা টীপিয়া দেখিবে, যদি শুষ্কাংশ সাতিশয় কঠিন হয় এবং ভিজা অংশ অঙ্গুলিতে এমত জড়াইয়া যায় যে, তাহা তুলিয়া ফেলিতে বিশেষ যত্ন পাইতে হয়, তবে সে মৃত্তিকা নিতান্ত অনুর্ব্বরা; তাহাতে কৃষিকার্য্য কদাচ উত্তমরূপে চলিতে পারে না। কিন্তু যদি মৃত্তিকাতে কিঞ্চিন্মাত্র আঠার সঞ্চার থাকে, অথচ অঙ্গুলিতে দৃঢ়-রূপে সংলগ্ন না হয়, তাহা হইলে সেই মৃত্তিকাকে উর্ব্বরা বিবেচনা করিতে হইবে।

কলমে চারা উৎপত্তির বিষয়।

চারার উৎপত্তি বিষয়ে বীজ ও শাখা এই দুইটী স্বভাব সিদ্ধ উপায়। বীজ হইতে কিরূপে চারা জন্মে, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এখন শাখা হইতে যেরূপে চারা উৎপন্ন হয়, তাহাই লিখিত হইবে। সচরাচর এরূপ অনেক বৃক্ষ দৃষ্ট হয় যে, তাহাদের শাখা নত হইয়া মৃত্তিকা সংলগ্ন হইলে, সেই সংলগ্ন স্থান হইতে শিকড় বাহির হইয়া একটী নূতন চারা উৎপন্ন হয়। আবার এক জাতীয় দুইটী চারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া একস্থানে অবস্থিত থাকিলে, কখন কখন একটীর দেহ অপরের দেহের সহিত যোড়া লাগিয়া এক হইয়া যাইতে দেখা যায়। উদ্ভিজ্জদিগের প্রকৃতিগত এই নৈসর্গিক কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া কলমে চারা উৎপাদনের নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে।

কলমে চারা উৎপাদনের প্রথা এদেশে আধুনিক। বীজোৎপন্ন চারা এবং যে সকল বৃক্ষের ডাল কাটিয়া পুতিলে সহজে চারা জন্মে, সেই সকল চারা এতদ্দিন উদ্যানে ও গৃহস্থের বাটীতে রোপিত

হইত। আজকাল বীজোৎপন্ন চারা অপেক্ষা কলমের চারার আদর বেশী। কলমের চারার এই প্রকার আদর হওয়ার কারণ এই—ইহাতে যেমন অল্প দিনে ফল ধরে এবং ফল যেরূপ জনকবৃক্ষের অনুরূপ গুণশালী হয়, বীজের চারায় সেরূপ হয় না। পরন্তু কলমের চারার দোষও আছে; ইহা বীজোৎপন্ন চারার ন্যায় দীর্ঘকাল ফল প্রসবে সমর্থ নহে এবং বীজের গাছে যেমন প্রচুর ফল ধরে, ইহাতে তেমন ধরে না। যাহা হউক প্রথমোক্ত গুণদ্বয়ের জন্য এখন কলমের চারা রোপণে অনেকেই অভিলাষী। কলম সাত প্রকার; যথা—যোড় কলম, শাখা কলম, গুটি বা গুল কলম, মাটি কলম, চোঙ্গ কলম, চোক্ কলম ও জিহ্বা কলম। এই সকল কলম যেরূপে করিতে হয়, ক্রমান্বয়ে আমরা তাহা প্রকাশ করিতেছি।

যোড় কলম।

কোন চারার কাণ্ডের সহিত উহার স্বজাতীয় বৃক্ষের শাখায় যোড় লাগাইয়া যে কলম প্রস্তুত হয়, তাহাকে যোড় কলম কহে। যে সাতপ্রকার কলমের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, সকল বৃক্ষে তাহার ব্যবস্থা খাটে না। বৃক্ষের প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কলমের নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের প্রতি অধিক সঙ্গত হয়। এমন অনেক বৃক্ষ আছে যে, যোড়কলম ভিন্ন অন্য কোন কলমে সহজে তাহাদের চারা প্রস্তুত হয় না, এজন্য সেই সকল বৃক্ষে যোড়কলম করাই কর্ত্তব্য।

যে চারা লইয়া যোড়কলম করিবে, পূর্ব্বে তাহাকে টবে বা গামলায় রাখিয়া কিছুদিন প্রতিপালন করিতে হইবে। কারণ টবে বসাইয়া সদ্য কলম বান্ধিলে চারা মরিয়া যাওয়ারই বেশী সম্ভব। পরিপুষ্ট সতেজ চারা হইলে, কলম ভাল হয়। যে বৃক্ষে কলম বান্ধিবে, তাহারও এমন শাখা মনোনীত করিবে যে, তাহা রুগ্ন ও

নিস্তেজ না হয় এবং তাহার স্থূলতা চারার কাণ্ডের সমান হয়। নিস্তেজ ও রুগ্ন শাখা হইলে,সে কলমে শীঘ্র ফল ফুল ধরে না। অতএব নিখুত সতেজ শাখা বাছিয়া লইবে। চারার কাণ্ড অপেক্ষা শাখা অধিক মোটা হইলে, যোড় লাগিতে পারে; কিন্তু পরে তাহা স্থূল শাখার উপযুক্ত রস যোগাইতে না পারিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শাখা অপেক্ষা চারার স্থূলতা কিঞ্চিৎ বেশী হইলে কোন হানি হইবে না, বরং কলম ভাল হইবে।

যে শাখাটী মনোনীত হইল, টব সমেত চারাটীকে সেই শাখার নিকট স্থাপন কর এবং উভয়কে উভয়ের দিকে নোয়াইয়া একত্রে ধরিয়া দেখ যে, চারার কোন্ অংশের সহিত শাখার কোন্ অংশে ভালরূপ যোড় বান্ধা যাইতে পারে; চারার একেবারে মস্তকের দিকে যোড় বান্ধা কর্ত্তব্য নহে। কারণ মস্তকের দিকে যোড় থাকিলে যখন কলম নামাইয়া জমিতে রোপণ করিবে, তখন বাতাসে সঞ্চালিত হইয়া, যোড়স্থানে আঘাত লাগিতে পারে; তাহাতে কলম নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

চারা ও শাখার যে যে অংশে যোড় বান্ধিবে স্থির করিলে, প্রত্যেকের সেই সেই অংশ হইতে অন্যূন চারি অঙ্গুল দীর্ঘে ও স্থূলতার তৃতীয়াংশ পরিমাণে কাষ্ঠের সহিত ছাল তুলিয়া এরূপ পরিষ্কার করিবে, যেন যোড় বান্ধিলে অন্ততঃ তিন অঙ্গুল স্থানে কিছুমাত্র ফাঁক না থাকে। অনন্তর উভয়ের ঐ অংশদ্বয়কে সম্মিলন করতঃ একগাছি সূক্ষ্ম রজ্জুদ্বারা জড়াইয়া বান্ধিবে। পাটের রজ্জু শীঘ্র পচিয়া যায়, এজন্য শোণরজ্জু বা তাদৃশ দীর্ঘকাল স্থায়ী সূত্র ব্যবহার করা ভাল। কত দিনে যোড় লাগিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। কোন কোন বৃক্ষে দেড় বা দুই মাসেই ভাল যোড় লাগে, আবার কোন কোন বৃক্ষে চারি পাঁচ মাসের কমে যোড় লাগে না। বর্ষাকালে আম্রের যোড় কলম বান্ধিলে দুই মাসের মধ্যেই যোড় লাগিয়া থাকে।

উত্তম যোড় লাগিলে, যোড়ের নিম্নভাগে শাখা ছেদন করিয়া

কলম নাবাইবে এবং কিছুদিন পরে চারার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিবে। চারার মস্তক ছেদন না করিলে, চারায় ও শাখায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফল প্রসব করিবে। কিন্তু তাহাতে সংলগ্ন শাখা সতেজ হইতে পারে না, সুতরাং যোড় কলমের উদ্দেশ্যও সফল হয় না।

উপরে একটী গোলাপ গাছের প্রতিরূপ দিয়া যেরূপে যোড় কলম বান্ধিতে হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বের শাখায় (খ) চিহ্নে যেরূপ কাটা আছে, শাখা ও চারার যোড়ের স্থান সেইরূপ কাটিতে হইবে এবং বাম পার্শ্বে (ক) চিহ্নিত স্থানে উভয়কে সম্মিলন পূর্ব্বক যেরূপ বন্ধন করা হইয়াছে, সেইরূপ বান্ধিবে।

যোড়কলম সকল সময়েই করা যাইতে পারে, কিন্তু অন্য সময় অপেক্ষা বর্ষাকালে অল্পদিনে যোড় লাগে; বিশেষতঃ বর্ষাকালে চারা রক্ষণার্থ জল সেচনের আবশ্যক হয় না। অন্য কালে উবের

ম্যাটি শুকাইলেই জল সেচন করিতে হয়, নতুবা চারা বাঁচে না। গোলাপের কলম শীতকালে করিবে। কারণ বর্ষাকালে গোলাপের কলম করিলে, গাছ মরিয়া যায়। আম্, জাম, লেবু, তেজ-পাত, গোলাপ, স্থলপদ্ম প্রভৃতি অনেক বৃক্ষে এই কলম করা যাইতে পারে। কিন্তু শাখা ও চারা এক জাতীয় বৃক্ষের না হইলে, প্রায় যোড়কলম হয় না। অর্থাৎ আমের সহিত আমের, জামের সহিত জামেরই যোড়কলম হইবে। কিন্তু আমের সঙ্গে জামের যোড় লাগিবে না। কবাবচিনির চারার সহিত তেজ পত্রের শাখার এবং জবাফুলের চারার সহিত স্থলপদ্মের শাখার যোড় লাগিয়া থাকে। কারণ নাম ভেদ হইলেও উহারা ভিন্ন জাতীয় নহে। নিকট-বর্ত্তী এক জাতীয় দুইটী বৃক্ষের শাখায় শাখায়ও ঐ রূপ যোড় লাগান যাইতে পারে। এই কলম বান্ধিবার সময় শাখা ও চারার যোড় স্থানের ছাল পরস্পর মিলিত না হইলে, শাখা ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া বিনষ্ট হয়।

যে বৃক্ষের শাখার সহিত যোড়কলম করিবে, ফুলফলের দোষ-গুণও সেই বৃক্ষের অনুরূপ হইবে। চারার সহিত এই দোষগুণের কোন সম্বন্ধ নাই। মনে কর, তুমি যে বৃক্ষের চারা লইয়া কলম বান্ধিলে, তাহার ফলের আস্বাদ অম্ল, আর যে বৃক্ষের শাখায় যোড় লাগাইলে তাহার ফলের আস্বাদ মধুর, ইহাতে তোমার কলমের চারায় যে ফল ফলিবে, তাহার আস্বাদ অম্ল না হইয়া মিষ্টই হইবে। তাহার কারণ এই, চারার মূলদ্বারা যে রস আকৃষ্ট হইবে, তাহা কলমের মস্তকস্বরূপ উৎকৃষ্ট জাতীয় শাখার পত্রে পরিপক্ক হওয়ায়, সেই বৃক্ষেরই অনুরূপ-গুণবিশিষ্ট রস প্রস্তুত হয়, সুতরাং ফলের গুণ ও তদ্রূপ হইয়া থাকে। অধিক কি এক জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীস্থ বৃক্ষের পরস্পর সংযোগে যোড় কলম হইলেও চারা যে বৃক্ষের শাখা মস্তকে ধারণ করে, সেই বৃক্ষের অনুরূপ ফলপুষ্পাদি প্রসব করে, কবাব চিনীর চারার সহিত তেজ-পত্রের শাখায় যোড় কলম বান্ধিয়া যে চারা জন্মে, তাহা তেজ পত্রের গুণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শাখাকলম।
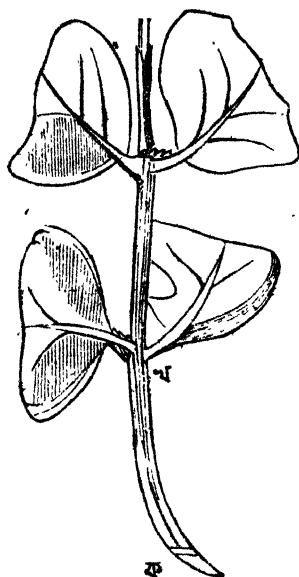
শাখাদ্বারা চারা প্রস্তুত করিবার এক প্রকার কৌশল পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এইক্ষণ আর এক প্রকারের বিষয় লিখিত হইতেছে। এই প্রণালীকে শাখাকলম বলে। যোড়কলমের ন্যায় শাখাকলমও সকল বৃক্ষে সঙ্গত হয় না।

সামান্য গোলাপ, গাঁদা, যুঁই, স্থলপদ্ম প্রভৃতি কতকগুলি বৃক্ষের শাখা ছেদন করিয়া ভূমিতে রোপণ পূর্ব্বক চারা উপাদন করিবার প্রথা প্রায় সকলেই অবগত আছেন, উহাই শাখাকলম। এদেশে ঐ সকল বৃক্ষের শাখাকলম এত সহজে উৎপন্ন হয় যে, তজ্জন্য বেশী যত্ন বা কোন প্রকার আয়োজনের আবশ্যক করে না। ছাপোরে উহাদের শাখা রোপণ করিয়া,আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে জল দিলেই,প্রায় চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐরূপ কতকগুলি বৃক্ষ ভিন্ন, এত সহজে ও অযত্নে অন্য বৃক্ষের শাখাকলম প্রস্তুত হয় না। শাখাকলম করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

এই কলম করিতে হইলে, দুই হাত চৌড়া ও সোয়াহাত উচ্চ ইষ্টক নির্ম্মিত এক চৌকা প্রস্তুত করিবে। চৌকার দৈর্ঘ্য, ভূমির অবস্থা অথবা যত শাখা রোপণ করিতে হইবে, তাহার সংখ্যা বিবেচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিবে। দুই হাত চৌড়া ও চারি হাত লম্বা একটা চৌকাতে এক বৎসরে একহাজার বা ততোধিক শাখাকলমের চারা স্বচ্ছন্দে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। এই চৌকা কোন অনাবৃত স্থানে প্রস্তুত করিবে। বৃক্ষের তলায় স্থান প্রস্তুত হইলে বৃক্ষের ছায়ায় এবং বর্ষাকালে বৃক্ষের শাখাপল্লব হইতে জলবিন্দুপাতে, কলম নষ্ট হইয়া যাইবে। চৌকার চতুঃপার্শ্বের সীমা গাঁথা হইলে,তাহার গর্ভ, প্রথমে অর্দ্ধহস্ত পর্য্যন্ত ঝামা, ইষ্টক প্রভৃতি জল শোষক পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করিবে। পরে তাহার উপর পাঁচ ছয় অঙ্গুলি পুরু করিয়া সামান্য মৃত্তিকা ফেলিবে এবং অবশিষ্ট অংশ বালি দ্বারা পূর্ণ করিবে। এই বালি যত সূক্ষ্ম হইবে, চৌকা তত ভাল হইবে। এইরূপ চোকা প্রস্তুত করিবার তাৎপর্য্য এই, উহাতে জল পতিত হইবা মাত্র কিয়-দংশ জল বালিকে ভিজাইয়া রাখিয়া অবশিষ্টাংশ অধোগত হয়; সুতরাং জলাধিক্য বা জলাভাব জন্য রোপিত শাখা বিনষ্ট হইতে পারে না। এই প্রকার চৌকায় কেবল শাখাকলমকেন,সকল প্রকার চারাই উৎপন্ন হইতে পারে।

বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখাগুলি মূল শাখার কিয়দংশের সহিত ছিঁড়িয়া আনিয়া অর্দ্ধ হস্ত পরিমিতদীর্ঘ রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ কাটিয়া ফেলিবে এবং উহাদের নিম্নস্থ পত্র গ্রন্থির চতুষ্পার্শ্ব পরিষ্কার করিয়া কাটিবে। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত চৌকা মধ্যে দুই অঙ্গুলি পরিমিত গর্ত্ত করিয়া এক একটী গর্ত্তে উহার এক এক খণ্ড শাখা রোপণ করিবে। যদি কোন শাখার নিম্নে পত্রগ্রন্থি না থাকে, তবে অধোভাগে পত্র-গ্রন্থি রাখিয়া সেই পত্র-গ্রন্থি ঊর্দ্ধে অর্দ্ধ হস্ত মাপিয়া শাখাকে লিখি-বার কলমের অগ্রভাগের ন্যায় টেরছা ভাবে খণ্ড করিবে। গোড়ায় পত্র গ্রন্থি না রাখিলে, কখনও শিকড় উপন্ন হইবে না। অপর প্রত্যেক শাখা খণ্ডে তিন চারিটী মাত্র পত্র রাখিয়া সেই পত্রের অর্দ্ধাংশ কাটিয়া

ফেলিবে; যদি পত্রের সম্পূর্ণ অংশ রাখ, তাহা হইলে শাখা শুষ্ক হইয়া যাইবে এবং একেবারে পত্র শূন্য করিলে, শাখায় পত্র কলিকা উদ্ভব হইতে পারিবে না। অতএব পত্রের সম্পূর্ণাংশ রাখা অথবা একবারে পত্র শূন্য করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য নহে। অপর, শাখাখণ্ড সকল রোপণ করা হইলে, বেল গ্লাস দিয়া তৎসমুদায়কে আচ্ছাদন করিয়া দিবে। বেলগ্লাস দিয়া ঢাকিয়া দিবার তাৎপর্য্য এই, তাহাতে শাখা খণ্ডের গোড়ার রস রৌদ্রে শুষ্ক হইতে পারিবে না। গ্লাস দিয়া ঢাকিবার সময় যত গুলি শাখা খণ্ড এক একটা গ্লাসে আচ্ছাদন করা যাইতে পারে, তাহাদের উপর দিয়া গ্লাসকে নীচের বালিতে চাপিয়া দিবে। বেল গ্লাস না পাওয়া গেলে, ঝুলাইবার সামান্য লণ্ঠন দিয়া ঢাকিয়া দিলেও হইতে পারিবে।

শাখা খণ্ড সকল চৌকার মধ্যে পরস্পর কতদূর অন্তরে রোপণ করা উচিত তাহা তাহাদের পত্রের পরিমাণানুসারে স্থির করিবে। ছোট ছোট পত্র বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাখণ্ড আড়াই বা তিন অঙ্গুল অন্তর করিয়া পুতিলেই যথেষ্ট হইবে। এইরূপে রোপণ করা হইলে, তাহাদের উপর বেলগ্লাস বা লণ্ঠন দিয়া চাপা দেওয়ার যেরূপ ব্যবস্থা উপরে লিখিত হইয়াছে সেইরূপ করিবে, এবং সূর্য্যোত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত দিবসে চৌকার চতুষ্পার্শ্বে দর্ম্মা দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক ছায়া করিয়া দিবে; ও রাত্রিকালে সেই সকল দর্ম্মা খুলিয়া রাখিবে। শাখা খণ্ড সকল পোতা হইলে তাহাদের গোড়ায় জল সেচন করিতে হইবে কিন্তু জল সেচন নিমিত্ত উপরিস্থ চাপা দেওয়া গ্লাসকে সপ্তাহের মধ্যে দুইবারের অধিক তুলিবার আবশ্যক নাই। চৌকার মধ্যে বৃষ্টির জল পড়িলে, তাহাতে উপকার না হইয়া বরং অপকার হইবে। অতএব যাহাতে উহার মধ্যে বৃষ্টির জল পড়িতে না পারে, তাহার যথোপযুক্ত উপায় করা কর্ত্তব্য। শাখা পুতিয়া উপরে যে যে প্রক্রিয়া করিবার কথা বলা গেল, তৎপ্রতি মনোযোগ না করিলে সকল পরিশ্রম বিফল হইবে।

বর্ষাকালে অনেক বৃক্ষের শাখাকলম হইয়া থাকে। গোলাপাদি

কতিপয় বৃক্ষের কলম শীতকালে করা উচিত, কারণ বর্ষাকালে তাহাদের কলম করিলে শাখা পচিয়া যায়। ফলতঃ উদ্ভিজ্জদিগের স্বভাব বুঝিয়া উপযুক্ত সময়ে এই কলম করা কর্ত্তব্য।

শাখা কাটিয়া যেরূপে এই কলম করিতে হয়, এই প্রস্তাবের শীর্ষভাগে তাহার একটী প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইল। চিত্রিত শাখার নিম্নাংশে (ক) স্থানে যে গাঁইট আছে, তাহাতে কাণ্ডের কিয়দংশ সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে; ঐ স্থান হইতে এবং (খ) চিহ্নের নিকট যে পত্র-গ্রন্থি আছে, তথা হইতে শিকড় বহির্গত হইয়া থাকে। চিত্রে যেরূপ প্রদর্শিত হইল, শাখাস্থ পত্রগুলির অর্দ্ধাংশ রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশ সেইরূপ কাটিবে।

গুল কলম।

সকলেই দেখিয়াছেন যে, শাখার যে স্থান হইতে পত্র উৎপন্ন হয়, সেই স্থানে গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইটের মত চিহ্ন হয়। শাখা বর্দ্ধিত হইলে, গোড়ার দিকের পত্রগুলি পড়িয়া যায়, কিন্তু পত্র পড়িয়া গেলেও গ্রন্থির চিহ্ন থাকে। ঐ চিহ্ন কোন কোন বৃক্ষে স্পষ্ট লক্ষিত হয়, আর কোন কোন বৃক্ষে তত স্পষ্ট দেখা যায় না, একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারা যায়। উক্ত গ্রন্থি, পত্রগ্রন্থি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দুই পত্র গ্রন্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পর্ব্ব অর্থাৎ পাব বলে। গুল কলম করিতে হইলে বৃক্ষের একটী সতেজ শাখা মনোনীত করিবে। ঐ শাখার তিন চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ কোন পর্ব্বের চারিদিকের ছাল কিঞ্চিৎ কাষ্ঠের সহিত তীক্ষ্ণ ছুরীদ্বারা চাঁছিয়া ফেলিবে। ছাল যেন পর্ব্বের উভয় পার্শ্বস্থ পত্রগ্রন্থি ছাড়াইয়া না উঠে। ছাল তুলিবার পূর্ব্বে পর্ব্বের নিম্নস্থ পত্রগ্রন্থির উপরে এবং উপরিস্থ পত্রগ্রন্থির নিম্নে শাখা বেষ্টন-পূর্ব্বক ছুরীদ্বারা গোলাকারে

দাগ দিয়া লইলে গ্রন্থি ছাড়িয়া ছাল উঠিবে না। পর্ব্বের ছাল তোলা হইলে, এক দলা কাদার মত সার মাটী দুই ভাগ করিয়া দুই হস্তে লইয়া ঐ পর্ব্বের উপরে ও নীচে লাগাইবে এবং পরে তাহা চারিদিকে সমানরূপে চাপিয়া দিবে, যেন কোন পার্শ্বে ফাক না থাকে। অতঃপর ছেঁড়া চট বা নারিকেলের-ছোবড়া মৃত্তিকার চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টন দিয়া শোণ বা তাদৃশ শক্ত সূত্রদ্বারা জড়াইয়া রাখিবে। ঐ মাটী সর্ব্বদা সরস রাখার জন্য উপরে সচ্ছিদ্র ভাঁড় ঝুলাইয়া যাহাতে নিয়ত বিন্দু বিন্দু জল তাহাতে পড়ে এরূপ বিধান করিবে। বর্ষাকালে এই কলম করিলে, ভাঁড় ঝুলাইবার আবশ্যক হয় না, কারণ বৃষ্টির জলে মাটী সর্ব্বদাই সরস থাকে। যদি বৃষ্টির অভাবে মৃত্তিকা শুকাইবার উপক্রম হয়, তবে আবশ্যকমত জল দিতে হইবে। কলমের স্থানে শিকড় বাহির হইতে বৃক্ষবিশেষে এক হইতে চারি মাস পর্য্যন্ত সময় লাগে।

শিকড় বহির্গত হইলে অতি ধীরে ধীরে শাখার যে স্থানে কলম বান্ধা গিয়াছে, তাহার নিম্নভাগে কাটিয়া, চারাটিকে কিছুদিন ছাপোরে বসাইয়া রাখিবে। তথায় একটু সবল হইলে উদ্যানে রোপণ করিবে। কাটিবার সময় অধিক ঝাকি লাগিলে চারার অনিষ্ট হইবার সম্ভব। স্থূল শাখায় এই কলম বান্ধিলে শীঘ্র শিকড় বাহির হয় না।

পার্শ্বে যে চিত্র দেওয়া গেল, তাহার (ক) চিহ্নিত স্থানের ন্যায় শাখার দুই পত্র গ্রন্থির মধ্যস্থ পর্ব্ব ভাগের ছাল কিয়দংশ কাষ্ঠের সহিত তুলিতে হইবে। সকল সময়েই এই কলম করা যাইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষাকালে সহজে চারা প্রস্তুত হয়। আম, জাম, লিচু, নেবু, পেয়ারা প্রভৃতি অনেক বৃক্ষে এই কলম করা যাইতে পারে।

মাটীকলম।

মাটীকলম গুলকলমেরই প্রকার ভেদ মাত্র; কেবল প্রভেদ এই, মাটীকলম করিতে হইলে, বৃক্ষের শাখা নত করিয়া মৃত্তিকা পূর্ণ টবে পুতিতে হয়, আর গুলকলমের বৃক্ষোপরি মাটী তুলিয়া সেই মাটী শাখার চতুর্দ্দিকে সংলগ্ন করিতে হয়। যে শাখা অবনত করিয়া মাটীকলমে চারা প্রস্তুত করিবে, তাহার মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবার উপযুক্ত অংশ এক পত্রগাঁইট হইতে অপর পত্রগাঁইট পর্য্যন্ত ছুরিকা প্রবেশপূর্ব্বক সমাংশে চিরিবে। ঐ চেরা অংশদ্বয় পুনরায় সংযুক্ত হইয়া না যায়, এজন্য চেরার মধ্যস্থলে কোঞ্চি বা কাষ্ঠ দিয়া মৃত্তিকা-মধ্যে এমন দৃঢ়রূপে পুতিয়া রাখিবে যে, শাখা তথা হইতে কোন প্রকারে উঠিতে না পারে। শাখা না চিরিয়া গুলকলমের মত পর্ব্বের চতুষ্পার্শ্বস্থ ছাল তুলিয়া মৃত্তিকামধ্যে পুতিয়া রাখিলেও চারা প্রস্তুত হইবে। ঐ স্থানের মৃত্তিকা না শুকায় এজন্য আবশ্যকমত জল দিবে। তিন চারি মাসের মধ্যে কলমের স্থান হইতে শিকড় বহির্গত হইয়া থাকে। শিকড় বাহির হইলে, সাবধানে শাখা হইতে উহা ছেদন করিয়া, উদ্যানে রোপণ করিবে। বর্ষার প্রারম্ভে এই কলম করিলে অপেক্ষাকৃত সহজে চারা প্রস্তুত হয়।

চোঙ্গকলম।

এদেশে কেবল কুলেরই চোঙ্গকলম করা হয়, অন্য কোন বৃক্ষে এই কলম করিতে প্রায় দেখা যায় না। শাখার বাহিরের ছাল প্রকৃত অবস্থায় রাখিয়া অভ্যন্তরের কাষ্ঠ বিমোচন করিলে চোঙ্গের ন্যায় দেখা যায়, এইজন্য এই কলমকে চোঙ্গকলম কহে।

যে চারার সহিত চোঙ্গকলম করিতে হইবে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া কাণ্ডের উপরিভাগে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের চারিদিকের

ছাল তুলিয়া চড়ক গাছের আলের ন্যায় করিবে। ছালের সঙ্গে যেন কাষ্ঠ না উঠে এরূপ সাবধান হইবে। অনন্তর তৎসমজাতীয় বৃক্ষের তদুপযুক্ত স্থূল ও কোমল শাখা আনয়ন করতঃ তাহার যে স্থানে চোক্ আছে, সেই স্থানের ছাল প্রকৃতাবস্থায় রাখিয়া চারার মস্তকের আলের পরিমাণে উহার অভ্যন্তরের কাষ্ঠ কৌশলে উন্মোচন করিবে। তাহাতে কাষ্ঠহীন শূন্যগর্ভ ছাল অবিকল চোঙ্গের ন্যায় হইবে। ঐ চোঙ্গ উক্ত ছিন্ন মস্তক চারার আলে এরূপ চাপিয়া বসাইবে, যেন কিছুমাত্র ফাক না থাকে, অথচ চোঙ্গ ফাটিয়া না যায়। অভ্যন্তরে ফাক থাকিলে বা চোঙ্গ ফাটিয়া গেলে কদাচ অভিপ্রেত সিদ্ধি হইবে না। চোঙ্গ বসান হইলে চারাকে ছায়ায় রাখিয়া উপরে সচ্ছিদ্র ভাঁড় ঝুলাইয়া তাহাতে প্রতিদিন জল দিবে, নতুবা সূর্য্য কিরণে উহা শুকাইয়া যাইবে। শাখা হইতে চোঙ্গ তোলা ও তাহা চারার মস্তকে বসান ক্রিয়া সদ্য সদ্য সম্পন্ন করিবে। অনেক গুলি চোঙ্গ তুলিতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন শাখা হইতে চোঙ্গ তুলিয়া সে গুলিকে কোন পাত্রে জলের মধ্যে রাখিবে, নতুবা চারার মস্তকে বসাইতে যে বিলম্ব হয়, সেই বিলম্বেই চোঙ্গগুলি শুকাইয়া যায়।

রাংচিতে, ভ্যারেণ্ডা, কুল প্রভৃতির শাখা হইতে ধীরে ধীরে ডাল মোচড়াইয়া যেরূপে চোঙ্গ বাহির করা যায়, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। ঐ প্রকারে বাহিরের ছাল হইতে অভ্যন্তরের কাষ্ঠ পৃথক করিতে পারিলেই সুবিধা, তাহা না পারিলে শাখার যে অংশে চোক্ আছে, তাহার উপরিভাগে এক অঙ্গুলি পরিমিত স্থান রাখিয়া অবশিষ্ট ছাল তুলিয়া ফেলিবে। অনন্তর ঐ চোক্ সংলগ্ন ছাল ধারণপূর্ব্বক ক্রমে ঘুরাইয়া সজোরে টানিলেই উহা কাষ্ঠ হইতে খুলিয়া যাইবে। লেবু, কুল, গোলাপ প্রভৃতি বৃক্ষে এই কলম করা যাইতে পারে। কাগজি ও অন্য লেবুর চারায় কমলা লেবুর চোঙ্গ বসাইলে কমলা লেবু এবং দেশী কুঁলের চারায় নারিকেলি কুলের চোঙ্গ বসাইলে, নারিকেলি কুল হইয়া থাকে। যে সময়ে ঐ সকল বৃক্ষের নূতন শাখা (ফেকড়ী) জন্মে সেই সময়েই এই কলম করা

সুবিধা জনক। ফল ফুরাইয়া গেলে মাঘ মাসেই প্রায় কূলের শাখা কর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং ফাল্গুনমাসে অসংখ্য নূতন শাখা জন্মিয়া বৃক্ষকে সুশোভিত করে। একজন্য ফাল্গুনমাসেই কুলের কলম করা কর্ত্তব্য।

পার্শ্ববর্ত্তী চিত্রে একটী চারার মস্তক ছেদন করিয়া তাহার অগ্রভাগ হইতে (ক) পর্য্যন্ত দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের ছাল তুলিয়া চড়ক গাছের আলের মত করা হইয়াছে। চিত্রের শীর্ষ-দেশের দক্ষিণ পার্শ্বে (খ) চিহ্নের উপরে যে চোক্-বিশিষ্ট চোঙ্গ আছে, তাহা ঐ চারার মস্তকে সম্মিলন পূর্ব্বক বসাইতে হইবে। কিন্তু বাম পার্শ্বে (গ) চিহ্নিত চোঙ্গটী যেরূপ কাটিয়া গিয়াছে, সেরূপ হইলে কলম প্রস্তুত হইবে না।
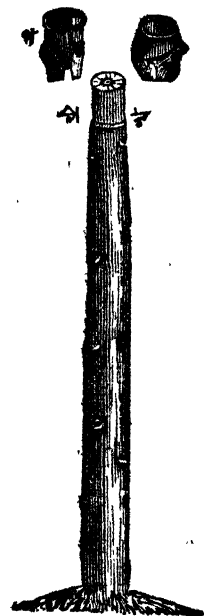
চোক্-কলম।

উদ্ভিজ্জদিগের পত্রগ্রন্থি হইতে শাখা উৎপন্ন হইবার উপযুক্ত অঙ্কুরবৎ এক প্রকার কোমল পত্রকলিকা জন্মে। সাধারণতঃ লোকে উহাকে উদ্ভিজ্জের চোক্ বলিয়া থাকে। ঐ চোক্‌কে কৌশলপূর্ব্বক চারারূপে পরিণত করিবার প্রণালীকে চোক্-কলম কহে। বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, যোড়-কলম শাখা-কলম ও চোক্-কলমে বড় ইতর বিশেষ নাই।

উদ্ভিজ্জদিগের শাখা হইতে কিঞ্চিৎ কাষ্ঠের সহিত চোক্ তুলিয়া তাহা মৃত্তিকা বা অপর কোন বৃক্ষশাখায় বসাইয়া তদ্দ্বারা চারা উৎপন্ন করিতে হয়। ক্রোটনাদি কতক জাতীয় উদ্ভিজ্জের চোক্

মাটিতে না বসাইলে চারা হয় না ; আর গোলাপাদি কতক জাতীয় উদ্ভিজ্জের চোক্ মাটীতে পুঁতিলে চারা জন্মে না, তাহা তজ্জাতীয় বৃক্ষের শাখায় বসাইতে হয়। যাহাদের চোক্ মৃত্তিকায় রোপণ করিলে চারা জন্মে, সেই সকল বৃক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ কাষ্ঠের সহিত চোক্ তুলিয়া মৃত্তিকায় রোপণপূর্ব্বক শাখা কলমের ন্যায় ব্যবস্থা করিবে। বৃক্ষ শাখায় চোক্ বসাইতে হইলে যে স্থানে চোক্ বসাইবে, প্রথমতঃ সেই স্থানের উপরিভাগের ছাল, ছুরি দ্বারা বৃক্ষের প্রশস্তদিকে এক রট পরিমাণে চিরিতে হইবে ; পরে ঐ চেরা স্থানের ঠিক মধ্য হইতে নিম্নে বৃক্ষের লম্বাদিকে তিন চারি অঙ্গুলি চিরিয়া ছুরির অগ্রভাগ দ্বারা এমত ধীরে ধীরে ঐ চেরা স্থানের উভয় পার্শ্বের ছাল, বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে আল্‌গা করিতে হইবে যে, তাহাতে ছাল ছিঁড়িবে না। চোক্ তুলিয়া তাহার মূলদেশের বিস্তৃতাংশকে (পূর্ব্বোক্ত শাখায় বিদারিত ছালের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে এরূপে উপযুক্ত মাপ লইয়া) কাটিতে হইবে এবং উহার দীর্ঘাংশকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সরু করিয়া ঐ চেরা স্থানের মধ্যে এপ্রকারে বসাইতে হইবে যে, কেবল চোক্‌টী মাত্র ছালের উপরে এবং অবশিষ্ট সমুদায় অংশ ছালের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে।

চোক্ বসাইবার সময় যাহাতে যোড়স্থানের ছাল পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক ; নতুবা যোড়-কলমের ন্যায় এই কলমেও কলমের স্থান স্ফীত হইয়া উঠিবে। চোক্ বসান হইলে সূক্ষ্ম রজ্জু বা সূত্র দ্বারা সেই স্থান বান্ধিয়া তাহাতে প্রতিদিন জল প্রদান করিবে এবং রৌদ্র নিবারণ জন্য উপরিভাগে উপযুক্ত আবরণ রাখিবে। অনন্তর ঐ শাখায় যে সকল শাখা-কলিকা থাকিবে, তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে, নতুবা তাহারা পরিপক্ক রস সকল গ্রহণ করিলে রসাভাবে চোক্ মরিয়া যাইতে পারে।

শাখায় যোড় লাগিয়া যখন চোক্ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, তখন তাহার উপরিভাগের প্রশাখাগুলি কাটিয়া ফেলা উচিত। শাখার পত্র-পাইট বিশিষ্ট স্থানে চোক্ বসাইলে উহা শীঘ্র যোড় লাগিবে এবং

বৃদ্ধিশীল-শাখায় বসাইলে উহা শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এই কলমে এক বৃক্ষে তজ্জাতীয় ভিন্নাকৃতির ফুল ও ফল উৎপাদন করা যাইতে পারে।

এই চিত্রের বাম পার্শ্বে একটী শাখা; এই শাখায় যে দুইটী গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ রেখা (একটী ক চিহ্ন হইতে আরম্ভ হইয়া শাখার প্রশস্ত দিকে, এবং অন্যটী ঐ রেখার মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ হইয়া শাখার লম্বাদিকে) দৃষ্ট হইতেছে, চোক্-কলম করিবার সময় শাখার যেস্থানে চোক বসাইবে, সেই স্থান ঠিক এইরূপে চিরিবে; অনন্তর ছুরির অগ্রভাগ দ্বারা লম্বাদিগের চেরার দুই ধারের ছাল, এমন সাবধানে কাষ্ঠ হইতে আল্‌গা করিবে যে, তাহা কোন রূপে ছিঁড়িয়া না যায়, পরে দক্ষিণ দিকে খ চিহ্নে যে শাখা-কলিকা আছে, তাহা কিয়দংশ ছালের সহিত তুলিয়া ঐ শাখার চেরার অভ্যন্তরে সম্মিলন পূর্ব্বক বসাইয়া বাঁধিয়া দিবে।
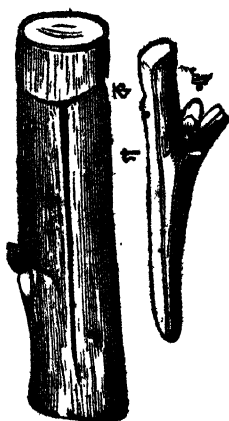
জিহ্বা-কলম।

উত্তাপাধিক্য ঘটিলে জিহ্বা-কলমে চারা উৎপন্ন করা যায় না, এজন্য আমাদের দেশে এই কলম করিয়া সকল সময়ে কৃতকার্য্য হওয়া কষ্টসাধ্য।

কোন চারার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক কাণ্ডের একপার্শ্বের উপরিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নদিকে প্রায় দুই, তিন অঙ্গুলি পর্য্যন্ত ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে কাটিতে হইবে এবং তাহার সমজাতীয় বৃক্ষের কোন শাখার এক পার্শ্বের অধোভাগ হইতে ঐরূপ চাঁচিতে প্রবৃত্ত হওতঃ ঊর্দ্ধদিকে ঐ পরিমিত স্থানে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে, চাঁচিয়া

উপরিভাগে একটা খাঁজ কাটিতে হইবে। পরে উভয়কে খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া এমন দৃঢ়রূপে বন্ধন করিতে হইবে, যাহাতে মধ্যে কিছুমাত্র ফাক না থাকে অথচ পরস্পরের পার্শ্ববর্ত্তী ছাল সুন্দররূপে মিলিত হইয়া যায়। অনন্তর চারাকে ছায়ায় রাখিয়া সূর্য্য কিরণ হইতে রক্ষা করতঃ উপরিভাগে একটা সচ্ছিদ্র ভাঁড় ঝুলাইয়া তাহাতে প্রতিদিন জল দিলেই যোড় লাগিয়া যাইবে।

উপরি উক্ত প্রণালী ভিন্ন পশ্চাল্লিখিত রূপেও এই কলম করা হইয়া থাকে। কোন ছিন্ন-মস্তক চারার অগ্রভাগের উভয় পার্শ্বস্থ দুই অঙ্গুলি পরিমিত ছাল ক্রমশঃ চাঁচিয়া উপরিভাগ পাতলা করিতে হইবে, পরে তজ্জাতীয় ও তদ্রূপস্থূল এক শাখা আনিয়া তাহার মূল দেশের দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধ হইতে সমাংশে চিরিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে নিম্নভাগের কাষ্ঠ কাটিয়া কিছু অধিক পরিমাণে ফাক করিতে হইবে এবং উহাকে এমত পরিষ্কার রূপে চাঁচিতে হইবে যে, উভয়কে সংযোজিত করিলে উত্তমরূপে মিলিত হইতে পারে। অনন্তর ঐ চারার উপরিভাগে শাখা বসাইয়া রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করতঃ ঊর্দ্ধে একটী সচ্ছিদ্র ভাঁড় ঝুলাইয়া তাহাতে জল দিলেই যোড় লাগিয়া যাইবে।

শাখা অপেক্ষা চারা অধিক স্থূল হইলে উক্ত প্রকারে কলম হইতে পারে না। তদ্রূপ স্থলে চারার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক কাণ্ডের ঊর্দ্ধভাগস্থ তিন অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের এক পার্শ্ব লেখনীর অগ্রভাগের ন্যায় ক্রমশঃ চাঁচিয়া পাতলা করিতে হইবে এবং অপর পার্শ্বের ছাল মাত্র তুলিয়া ফেলিতে হইবে; অনন্তর তদপেক্ষা সরু এক শাখা আনিয়া তাহার তৎপরিমিত নিম্ন ভাগ, একাংশ স্থূল ও অপরাংশ পাতলা করিয়া চিরিতে হইবে। ঐ স্থূল অংশের মুখের দিক মোটা রাখিয়া ঊর্দ্ধভাগের অভ্যন্তর ক্রমে ক্রমে চাঁচিয়া পাতলা করিতে হইবে; পরে চারার পাতলা অংশে শাখার পাতলা অংশ এবং চারার যে পার্শ্বের ছালমাত্র তোলা হইয়াছে, সেই পার্শ্বে শাখার ঐ স্থূল মুখ সম্মিলনপূর্ব্বক বসাইয়া বান্ধিয়া রাখিতে হইবে। বসন্তের

প্রারম্ভে এই কলম করিতে হয়। পিচবৃক্ষের চারা জন্মাইবার জন্ম ইহা বিশেষ সুবিধাজনক।

পার্শ্ববর্ত্তী চিত্রে, চারার ও শাখার নিম্নাংশে খাঁজ কাটিয়া যে প্রকারে বসাইতে হইবে, ক চিহ্নে তাহা স্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে।

সার।

কৃষিকার্য্যের সার অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য; উদ্ভিজ্জগণের পুষ্টি সাধন,জন্য যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক মৃত্তিকায় সেই সকল পদার্থের অভাব ঘটিলেই সার দিতে হয়; নতুবা উদ্ভিজ্জগণ সতেজ থাকিতে পারে না। আমাদের দেশের কৃষকেরা উদ্ভিজ্জের ও মৃত্তিকার উপাদান নির্ণয়ে অসমর্থ, এজন্য সার প্রদান কার্য্যে এদেশে অতিশয় বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। এই দোষ সংশোধন সহজ ব্যাপার নহে; কারণ উদ্ভিজ্জ ও রসায়ন বিদ্যায় জ্ঞান না থাকিলে মৃত্তিকার অবস্থা বুঝিয়া ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিজ্জের উপযোগী সারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতে পারে না। যাহাহউক দেশের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে এবিষয়ে সাধারণের বোধগম্য কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করিব।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, অম্লজান, যবক্ষারজান, আঙ্গারিকাম্ল, জলজান, প্রভৃতি কতকগুলি বায়বীয় পদার্থ এবং পটাশ, ম্যাগনেশিয়া,

ফসফরাস, চূণ প্রভৃতি কতগুলি পার্থিব পদার্থ উদ্ভিজ্জগণের শরীর পোষণার্থ অত্যন্ত প্রয়োজন। বায়বীয় পদার্থগুলি প্রায়ই তাহারা বায়ু হইতে গ্রহণ করে এবং পটাশাদি পদার্থ মূল দ্বারা শোষণ করিয়া মৃত্তিকা হইতে প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিজ্জদিগের স্বভাবানুসারে কাহারও পক্ষে উক্ত পটাশাদির মধ্যে কোন পদার্থ বেশী এবং কাহারও পক্ষে কম আবশ্যক। মৃত্তিকায় প্রয়োজন মত ঐ সকল পদার্থ না থাকিলেই সেই অভাব পূরণ জন্য তথায় উপযুক্ত সার প্রদান করা আবশ্যক হইয়া থাকে। কোন্ সার কোন্ উদ্ভিজ্জের অধিক উপযোগী তাহা জানিতে হইলে, সেই উদ্ভিজ্জকে শুষ্ক করিয়া দগ্ধ করিতে হয়; তাহাতে কার্ব্বণাদি কতক অংশ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায় এবং কতক অংশ ছাই হইয়া যায়। ঐ ছাইয়ের মধ্যে অবশিষ্ট উপাদানগুলি বিদ্যমান থাকে; রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে উক্ত ছাই পরীক্ষা করিলে তাহাদের নাম ও পরিমাণ জানিতে পারা যায়। কিন্তু এদেশীয় কৃষকদিগের মধ্যে সেরূপ পরীক্ষার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।

জীবজন্তুর মলমূত্র, গলিত উদ্ভিজ্জ ও জীব শরীর, অস্থিচূর্ণ, বোদমাটী, খৈল, প্রভৃতি পদার্থগুলি সচরাচর সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহার কারণ এই যে, এই গুলিতে প্রায় সমস্ত উদ্ভিজ্জেরই পুষ্টিকর পদার্থ বিদ্যমান আছে। ধান্যাদি তৃণজাতীয় উদ্ভিজ্জ পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে তাহাদের দেহে সিলিকেট অব পটাশের ভাগ অধিক। গো, মেষ মহিষাদি পশুর মলমূত্রে ঐ পদার্থ যথেষ্ট আছে, এজন্য প্রায় সমুদায় শস্য ক্ষেত্রের পক্ষে জীব জন্তুর মলমূত্রের সার বিশেষ উপকারী। সর্ষপ, মসিনা, রেড়ি, পোস্ত প্রভৃতির খৈলে, ফস্‌ফিউরিক অম্ল, চূণ, ম্যাগনেসিয়া, পটাশ ও যবক্ষারজান ইত্যাদি পদার্থ বিদ্যমান থাকায় খৈল প্রায় সমস্ত উদ্ভিজ্জেরই উপকারী। চূণ কঠিন মৃত্তিকাকে শিথিল করে, মৃত্তিকার লৌহাদি দৃঢ় উপাদানগুলিকে কোমল করিয়া উদ্ভিজ্জ মূলের গ্রহণোপযোগী করে এবং মৃত্তিকাস্থ অনাবশ্যকীয় খনিজ পদার্থ সকলকে বিনষ্ট করে,

এই নিমিত্ত এটেল মাটীতে চূণের সার ছড়াইলে উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু বীজ বা চারা রোপণের অনেক পূর্ব্বে চূণ না ছড়াইলে তাহার ঝাঁজে গাছ মরিয়া যায়। অস্থি চূর্ণ ও চূণ ইক্ষুক্ষেত্র এবং চা ক্ষেত্রের পক্ষে বিশেষ উপকারী। গলিত জীব ও উদ্ভিজ্জ শরীরে এবং বোদ মাটীতে, আঙ্গারিকাম্ল, যবক্ষারজানাদি পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় উহা যাবতীয় উদ্ভিজ্জের পক্ষে উপযোগী।

সার সংযোগে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় বটে কিন্তু উদ্ভিজ্জের স্বভাব ও চারার অবস্থা বিবেচনা করিয়া না দিতে পারিলে কখন কখন ঐ সারে অপকারও হইয়া থাকে। মটরের ক্ষেত্রে সার দেওয়া উচিত নহে; কারণ সারে মটরের অনিষ্ট হয়। সারের অভাবে অনেক উদ্ভিজ্জ ক্ষীণজীবী হয় এবং ক্ষীণ শরীরে ফল ফুলের অবস্থা মন্দ হয় সত্য কিন্তু পরিমাণাতিরিক্ত সার পাইলে অনেক উদ্ভিজ্জ অসম্ভব স্থূল শরীর হইয়া ফল প্রসবে বিরত থাকে, এরূপও দেখা যায়। যে সকল উদ্ভিজ্জের দেহ ও পত্র আমাদের ভক্ষ্য, তাহাদের ক্ষেত্রে প্রচুর সার দেওয়া ভাল; কারণ তাহাতে তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সতেজ ও পরিপুষ্ট হয় এবং তাহাই আমাদের প্রার্থনীয়; এই হেতু কপি, শালগাম, গাজর, মূলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বেশী পরিমাণে সার ছড়ান কর্ত্তব্য।

মৃত্তিকা ও উদ্ভিজ্জের প্রকৃতি বুঝিয়া সারের পরিমাণ ঠিক করিতে হয়; এজন্য বিঘা প্রতি কোন্ সার কি পরিমাণ আবশ্যক তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। যাহা হউক নিম্নে উহার একরূপ মোটামুটি হিসাবাদি লেখা যাইতেছে।

গো মেষ মহিষাদির বিষ্ঠা যাবতীয় শস্য ও শাক শবজির ক্ষেত্রে দেওয়া যাইতে পারে। গোবর প্রতি বিঘায় ১৬ হইতে ২০ মণ, মেষের মল প্রতি বিঘায় তিন চারি মণ, এবং অশ্ব, শূকর ও মহিষের বিষ্ঠা প্রতি বিঘায় ৩ হইতে ৫ মণের প্রয়োজন। কুক্কুট, পারাবত প্রভৃতি পক্ষীর বিষ্ঠা অধিকাংশ পুষ্পবৃক্ষের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী, প্রতি বিঘায় এক মন ছড়াইলেই যথেষ্ট হয়। মনুষ্যের বিষ্ঠা প্রায়

সমুদায় কৃষির নিমিত্ত উত্তম সার। সারের নিমিত্ত বোম্বাই অঞ্চলে মিউনিসিপালিটি হইতে মনুষ্যের বিষ্ঠা বিক্রয় হইয়া থাকে। গরু ঘোটকাদি পশুর মল শুষ্ক ও বিকৃত হইয়া মৃত্তিকারূপে পরিণত হইলে তাহাকে কাসমাটী কহে, ইহা উৎকৃষ্ট সার; প্রতি বিঘায় ৮।১০ মণ ছড়াইলেই যথেষ্ট হয়।

গলিত জীব ও উদ্ভিজ্জশরীর যাবতীয় বড় বড় ফলবৃক্ষের উপযোগী। বোদমাটী উদ্ভিজ্জ দেহেরই পরিণাম; শাক সবজির পক্ষে উহাও উত্তম সার। উদ্ভিজ্জের কাণ্ড পত্র পচিলে যে সার হয় তাহা সর্ব্ব-প্রকার কৃষিকার্য্যেই ব্যবহৃত হইতে পারে; বিশেষ ইহা শাক সবজি এবং শস্যক্ষেত্রের পক্ষে অতি উত্তম। উদ্ভিজ্জ সার প্রতি বিঘায় ১৫ হইতে ৩৫ মণ পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। বৃক্ষের শাখা পত্রাদি দগ্ধ করিলে যে ছাই হয়, তাহা কোন কোন উদ্ভিজ্জের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ছাই সারে মানকচু অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; ইহা ধান্য ও তামাকের চাষেও ভাল।

লবণ। যাবতীয় সামুদ্রিক উদ্ভিজ্জের পক্ষে লবণ উৎকৃষ্ট সার; প্রতি বিঘায় ৬।৭ সের লবণ ছড়াইয়া বীটপালঙের চাষ করিলে অত্যন্ত উপকার দর্শে।

অস্থিচূর্ণ। ইহা ক্ষেত্রে ছড়াইলে দীর্ঘকাল ক্ষেত্রের মৃত্তিকা কোমল থাকে, এজন্য এটেল মৃত্তিকা বিশিষ্ট ক্ষেত্রের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

চূণ। ইহাও এটেল মৃত্তিকা বিশিষ্ট ক্ষেত্রে ভাল। প্রতিবিঘায় ১০।১২ সের ছড়াইলেই যথেষ্ট হয়। কলি বা লেয়া চুণ সারের নিমিত্ত ব্যবহার হয় না, ঝুরা চুণই ছড়ান হইয়া থাকে।

খৈল। ইহা অনেক প্রকার শাক সবজি ও ফল বৃক্ষের পক্ষে উত্তম সার; ইক্ষু, পাট, কার্পাস, আলু, কপি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। প্রতি বিঘায় ১ মণ খৈল ছড়ান যায়।

উপরে যে সকল সারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখা গেল, তাহা প্রাণী, উদ্ভিজ্জ, খনিজ ও মিশ্রিত এই চারি প্রকার সারের অন্তর্গত। খনিজ

সারের মধ্যে কেবল লবণ ও চুণ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ এদেশে প্রচলিত নাই; এজন্য ধাতু সারের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অন্য ভিন্ন প্রকার সারের প্রস্তুত প্রণালী ও ব্যবহারের নিয়ম নিম্নে লিখিত হইতেছে।

উদ্ভিজ্জ-সার।

বৃক্ষের শাখাপত্র প্রভৃতি পচিয়া অতি তেজস্কর সার হয়। এই সার প্রস্তুত করিতে হইলে লতা, পাতা, ডাল প্রভৃতি একত্র করিয়া অল্প জল বিশিষ্ট কোন গর্ত্ত বা ডোবায় ফেলিয়া রাখিবে। তথায় ১২।১৩ মাস পচিলে ঐ সকল সাররূপে পরিণত হইবে। কিন্তু অধিক জল থাকিলে শীঘ্র পচিবে না।

বৃক্ষের শাখাপত্র পচিয়া যে সার হয়, তাহার একটী দোষ এই যে, উহা চারার মূলে প্রদান করিলে কয়েক প্রকার কীট জন্মিয়া কখন কখন চারার কোমল শিকড় কাটিয়া ফেলে; তন্নিমিত্ত বৃক্ষ-মূলে উক্ত সার দিতে কিঞ্চিৎ শঙ্কা বোধ হয়, কিন্তু দোদ মৃত্তিকা দিলে ঐ আশঙ্কা থাকে না।

যত প্রকার উদ্ভিজ্জ-সার নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে খৈলই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। খৈল সংযোগে মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি সমধিক বর্দ্ধিত হয়। সাম্বৎসরিক চারার পক্ষে খৈল বিশেষ উপকারক। কিন্তু পরিমাণাতিরিক্ত হইলে ইহাদ্বারা চারার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। খৈল ছড়াইতে হইলে, প্রথমতঃ উহাকে গুড়া করিবে, পরে ঐ গুড়ার সহিত ঘুটের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া চসা জমিতে ছড়াইয়া দিবে; অনন্তর লাঙ্গল দ্বারা যাহাতে খৈল চাপামাত্র পড়ে, পুনর্ব্বার এরূপে চাষ দিয়া জল সেচন পূর্ব্বক মৃত্তিকা ভিজাইয়া দিবে। কয়েক দিন পরে পুনর্ব্বার কিছু খৈল ছড়াইয়া চারা রোপণ করিবে। চারা বড় হইলে আর একবার খৈল দেওয়া আবশ্যক। সর্ষপ, মসিনা

তিল, ভেরেণ্ডা প্রভৃতির খৈল উৎকৃষ্ট। খৈল সারে উদ্ভিজ্জ সমূহের ফল বড় হইয়া থাকে। নীল কুঠীর চৌবাচ্চায় যে সিটা পাওয়া যায়, তাহাও উত্তম সারমধ্যে গণ্য।

প্রাণি-সার।

প্রাণিদিগের চর্ম্ম, মাংস, শোণিত, অস্থি, শৃঙ্গ, নখ প্রভৃতি বিকৃত হইয়া উত্তম সার প্রস্তুত হয়। এই সার প্রস্তুত করিতে হইলে, মৃত জন্তুর শরীর মৃত্তিকা গর্ত্তে ফেলিয়া তদুপরি চূণ ছড়াইয়া দিবে; পরে উপরে মাটি চাপা দিয়া দুই তিন মাস তদবস্থায় রাখিবে। অনন্তর তাহা তুলিয়া দুর্গন্ধ-নিবারণ জন্য পুনর্ব্বার চূণ মিশ্রণ পূর্ব্বক কর্ষিত ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিবে।

প্রাণিদিগের অস্থি চূর্ণ করিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত রাখে। কিন্তু অস্থিগুলিকে অত্যন্ত চূর্ণ করা হইলে, প্রথম বৎসরেই অত্যন্ত উপকার পাওয়া যায়, তৎপরে উহার আর তাদৃশ তেজ থাকে না। অতএব অস্থি চূর্ণ করিবার সময় অত্যন্ত সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত না করিয়া কিছু স্থূল স্থূল খণ্ড রাখা কর্ত্তব্য। ইহার সংযোগে মৃত্তিকা অত্যন্ত আল্‌গা থাকে। শৃঙ্গের গুড়া অস্থিচূর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা স্বভাবতঃ আল্‌গা ও উত্তাপিত, প্রাণি-সার তাহার পক্ষেই বিশেষ উপকারী; কিন্তু যে ক্ষেত্রে এটেল মৃত্তিকার ভাগ অধিক, তাহাতে এই সার অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে না দিলে উপকার দর্শে না।

মিশ্রিত-সার।

উদ্ভিজ্জ-সার, প্রাণি-সার এবং ধাতু সার এই ত্রিবিধ সারের পরস্পর মিশ্রণে যে সার উৎপন্ন হয়, তাহাকে মিশ্রিত সার বলা

যায়। আমাদের দেশে গো, মহিষ, ঘোটক, গর্দ্দভ, শূকর, কপোত, এবং কুক্কুট প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীর বিষ্ঠা মিশ্রিত সারের মধ্যে প্রধানরূপে প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে গোময় ও অশ্ব-বিষ্ঠাই প্রসিদ্ধ। কিন্তু উহা টাটকা কৃষিকার্য্যের উপযোগী নহে। গবাদি পশুর বিষ্ঠা দ্বারা সার প্রস্তুত করিতে হইলে কোন মৃত্তিকা গর্ত্তের অধোভাগ ইষ্টকাদির দ্বারা বান্ধিয়া উহার একটী স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্ন রাখিবে; অনন্তর উক্ত গর্ত্তকে গো-অশ্ব প্রভৃতির বিষ্ঠায় পূর্ণ করিয়া কিছু দিন রাখিলে তাহা হইতে রস নির্গত হইয়া ঐ নিম্নদিকে সঞ্চিত হইবে; সার কার্য্যে তাহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্তরস তুলিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইলে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। শুষ্ক হইলে বা অত্যন্ত পচিলে সারের তাদৃশ তেজ থাকে না; এজন্য ছায়াবিশিষ্ট স্থানে গর্ত্ত করিবে এবং মধ্যে২ তদুপরি গোমূত্র ঢালিবে। ছয় মাস না পচিলে সার ভাল হয় না। এই সার ক্ষেত্রে ছড়াইবার পূর্ব্বে ভূমি চষিয়া মৃত্তিকা চূর্ণ করতঃ মোই টানিবে। কারণ ক্ষেত্রের মৃত্তিকা সমান না করিলে তরলতা প্রযুক্ত ইহা উচ্চ স্থান হইতে গড়াইয়া নিম্ন স্থানে সঞ্চিত হইবে; সুতরাং তাহাতে ক্ষেত্রের সর্ব্বস্থানের উপকার সাধিত হইবে না। গামলায় যে সকল চারা জন্মান যায়, তাহাদের মূলে এই সার প্রদান করিলে তাহারা শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

গোমূত্র পচাইয়া তাহাতে খৈলের গুড়া মিশ্রিত করিলে এক প্রকার উৎকৃষ্ট মিশ্রিত সার প্রস্তুত হয়; তদ্দ্বারা মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তির বিলক্ষণ প্রাখর্য্য জন্মে। গোমূত্রের ন্যায় ঘোটক, গর্দ্দভ, মেষ, মহিষাদির মূত্রও কৃষি কার্য্যের উপকারী; কিন্তু সদ্য মূত্রের তেজ দুঃসহ; তহা চারার মূলে প্রদান করিলে চারা দগ্ধপ্রায় হইয়া যায়; এজন্য উহা কলসে করিয়া কিছুদিন পচাইতে হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কঠিন সারের সহিত তাহার তিনগুণ জল মিশ্রিত করিয়া কিছুদিন রাখিলে তাহাতে গেঁজা (বুদ্ বুদ্) উঠিয়া যখন সেই গেঁজা পুনঃ মিশিয়া যাইবে, তখন একরূপ তরল সার প্রস্তুত হয়। পচা

গোময়, গাছের পচাপাতা, নদী তীরের বালি এবং সামান্য মৃত্তিকা এই চারি দ্রব্য সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া যে সার হয়, সেই সারে অধিকাংশ ফুলের গাছ অতিশয় তেজাল হয়। কুক্কুট ও পারাবত জাতীয় পক্ষীদিগের আবাস স্থান হইতে তাহাদের বিষ্ঠা লইয়া, যে সার প্রস্তুত হয়, পুষ্পোদ্যানের পক্ষে তাহা বিশেষ উপকারী।

উদ্যান।

যে স্থানে নানা প্রকার সুস্বাদু ফল ও নানাজাতি মনোহর ফুল এবং বহুবিধ শাক সবজি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহাকেই উদ্যান কহে। বহু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ হেতু, উদ্যানের শোভা অতি মনোহর হয়। উৎকৃষ্ট উদ্যানগুলি স্বাস্থ্য ও শান্তির নিকেতন স্বরূপ। কলিকাতার নিকটে উদ্যানের সংখ্যা যত, বোধ হয় ভারতবর্ষের অন্য কোন নগরে তত নাই। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের উদ্যানগুলি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ও সুসজ্জিত এবং তথায় ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় উৎকৃষ্ট ফল ফুলের সংগ্রহও বেশী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, অনেকে এমত শান্তি ও বিশুদ্ধ সুখোৎপাদক সুশোভিত উদ্যানগুলিকে পৈশাচিক আমোদ প্রমোদের স্থল করিয়া রাখিয়াছেন।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের উদ্যানে ফুল অপেক্ষা ফল বৃক্ষের সংখ্যাই প্রায় বেশী, এবং বোধ হয় তাঁহারা অধিক ফল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে ঘন ঘন অনেক ফল বৃক্ষ রোপণ করেন। তাহাতে আলোক ও বায়ু প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া বাগানের সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে, অথচ তাঁহাদের বেশী ফল লাভের যে আশা, তাহাও পূর্ণ হয় না। কারণ ঘন ঘন বৃক্ষ জন্মিলে পরস্পরের মূলে মূলে ও শাখায় শাখায় সংঘর্ষণ হওয়ায় তাহারা সতেজ থাকিতে পারে না, সুতরাং বেশী ফল ফুল প্রসবেও সমর্থ হয় না। যাহাতে

সৌন্দর্য্য রক্ষা পায়, অথচ উৎপন্নের হানি হয় না, এরূপ ব্যবস্থাই উদ্যানের পক্ষে সুসঙ্গত। তদ্রূপ কতকগুলি ব্যবস্থার কথা ক্রমশঃ উল্লেখ করা যাইতেছে।

স্থান নির্ব্বাচন।—চারিদিক হইতে আলোক ও বায়ু প্রবেশের পথ থাকে, উদ্যানের জন্য এরূপ স্থান পছন্দ করিবে। শাকসব্জির বাগান বসতি স্থানের নিকটে হওয়া ভাল, কারণ উহা সদাসর্ব্বদা তদারকের আবশ্যক হয়। বড় বড় গাছ বা ঝোপ থাকিলে শাকসব্জির পক্ষে বড় হানি জন্মায়, যেহেতু উহারা ভূমিকে ছায়া বিশিষ্ট করিয়া ফেলে, বিশেষতঃ বড় বড় বৃক্ষের পত্র হইতে শাকসব্জির উপর জল পড়া বিষবৎ অপকারী। এই জন্য ঐ সকল গাছ যত পার কাটিয়া ফেলিবে। যে উদ্যান শাকসব্জি ও ফলবৃক্ষ উভয়ের জন্য হয়, তথায় উত্তর ও পূর্ব্বদিকে শাকসব্জি এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে ফলবৃক্ষাদি রোপণ করিবে।

বেড়া—ধনবান ব্যক্তিরা উদ্যানের সীমা প্রাচীর দ্বারাই ঘিরিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহাদের পক্ষে তাহা অসুবিধাজনক, তাঁহাদিগকে বাগানের সীমা বদ্ধ রাখার জন্য অবশ্য বেড়া দিতে হইবে। সাধারণতঃ মেঁদি গাছের বেড়া দেখিতে বড় সুন্দর হয়, কিন্তু গবাদি পশুর প্রবেশ নিবারণ নিমিত্ত কাঁটাগাছের বেড়া দেওয়াই ভাল। এদেশে বেড়া দেওয়ার উপযুক্ত অনেক কাঁটা গাচ আছে; তাহাদের দ্বারা বেড়া দিলে উদ্দেশ্য সফল হয়, অথচ দেখিতেও তত মন্দ না। আমেরিকার এলো নামক গাছের বেড়া পশুর প্রবেশ নিবারণ ও সৌন্দর্য্য সাধন উভয় পক্ষেই উত্তম। পাহাড় অঞ্চলে "হিবিসকস" নামক এক প্রকার গাছের বেড়া দেয়, তাহা দেখিতে বড় চমৎকার এবং শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে।

উদ্যানের পক্ষে গোলাপের বেড়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও অতি সুন্দর। চায়না পিঙ্ক অথবা ক্রিমশন্ কিম্বা সুইট্ ব্রিটেল্ রোজ ভিমিউকস্ এই তিন জাতীয় গোলাপ বেড়ার জন্য ব্যবহৃত হইয়া

থাকে। কিন্তু গ্রীষ্ম প্রধান দেশে জল না দিলে, উহাদের পাতা ঝরিয়া যায়। আগরায় তাজমহলের বাগানের মধ্যে একটী সুন্দর ও চমৎকার গোলাপ ক্ষেত্র আছে; তাহার বেড়া সাদা ও লাল রঙ্গের গোলাপ ও অন্যান্য সুন্দর সুন্দর ফুল গাছের দ্বারা প্রস্তুত। যখন সেই সকল গাছে ফুল ফুটে, তখন অতি অপূর্ব্ব মনোহর শোভা ধারণ করে।

এদেশে স্থায়ী শক্ত অথচ সুন্দর বেড়া দেওয়ার নানাবিধ উপায় সত্ত্বেও অনেকে মাদার, সজিনা প্রভৃতি গাছের বেড়া দিয়া উদ্যানকে কুৎসিত করিয়া ফেলেন, ঐ সকল গাছ যখন বাড়িয়া উঠে তখন বাগানে আলো ও বায়ু প্রবেশের ব্যাঘাত হয়। বিশেষতঃ তাহারা বাগানের সীমা হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত শিকড় ও ছায়া বিস্তার করিয়া অন্যান্য গাছ উৎপত্তির পক্ষে বাধা দেয়, সুতরাং উহা স্থায়ী হইলেও হানিজনক।

মৃত্তিকা—উদ্যানের মৃত্তিকা ভাল হওয়া চাই। মৃত্তিকা মন্দ হইলে অতি তেজাল চারা রোপণ করিলেও তাহা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। কারণ উদ্ভিজ্জগণ আপনাদের খাদ্য পটাশ, ম্যাগ্নেসিয়া, চুণ, ফস্‌ফরস্ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ মূলদ্বারা মৃত্তিকা হইতে সংগ্রহ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করে, মৃত্তিকায় সেই সকল পদার্থের অল্পতা বা অভাব ঘটিলে, উহারা কখনই সতেজ থাকিতে পারে না। সকল স্থানের মৃত্তিকায় ঐ সমুদায় পদার্থ সঞ্চিত থাকা সম্ভব নহে। এজন্য তাহাদের উপযোগী মৃত্তিকা প্রস্তুত বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। নিকৃষ্ট মৃত্তিকার একটী সামান্য লক্ষণ এই যে, তাহাতে দূর্ব্বাঘাস পর্য্যন্ত ভাল গজায় না।

চাখড়ি, কাদা, বালি ও উদ্ভিজ্জসার এই সকল পদার্থ সমান ভাগে মিশ্রিত করিলে যে মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়, তাহা অধিকাংশ বৃক্ষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই সকল পদার্থের মধ্যে কোনটী না পাওয়া গেলেও, বড় ক্ষতি হয় না; কারণ যেটীর অভাব থাকে, তাহার তুল্যগুণবিশিষ্ট অন্য পদার্থ দিলেও চলিতে পারে। যেমন, কোন

স্থানে খড়ির অভাব হইলে, তাহার পরিবর্ত্তে চূণ দেওয়া যাইতে পারে। উদ্ভিজ্জসার অর্থাৎ বৃক্ষের শাখা পত্রাদি পচিয়া যে সার হয়, তাহা উদ্ভিজ্জদিগের পক্ষে অতিশয় পুষ্টিকর পদার্থ। উহা অতি সামান্য চেষ্টায় প্রস্তুত হইতে পারে। এজন্য উক্ত সারের অভাব না রাখিয়া বরং বেশী পরিমাণে দিতে পারিলে ভাল। এই প্রকারে মৃত্তিকা প্রস্তুত করিতে প্রথমে কিছু খরচ হইলেও পরে বিলক্ষণ লাভ জনক হইয়া থাকে।

পয়নালা—উদ্যানের জল প্রণালীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য। বসতি স্থানের জল বাহির হইবার ভাল বন্দোবস্ত না থাকিলে যেমন মনুষ্যদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, বৃক্ষদিগের পক্ষেও সেইরূপ হইয়া থাকে। এজন্য উদ্যানে জল বহির্গমনের উপযুক্ত পয়ঃ প্রণালী রাখা আবশ্যক। সেই প্রণালীগুলি প্রতি বৎসর বর্ষার পূর্ব্বে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত।

পুষ্করিণী—কৃষি কার্য্যে জল সর্ব্বদা প্রয়োজন, সেই জল সঞ্চিত রাখিবার জন্য, উদ্যানের আয়তনানুসারে এক বা অধিক পুষ্করিণী খনন করা কর্ত্তব্য। পুষ্করিণীতে উদ্যানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। চারিপাড়ে যথেষ্ট যায়গা রাখিয়া পুষ্করিণী খনন করিবে। পাড়গুলি পুষ্করিণীর দিকে উচ্চ রাখিয়া ক্রমশঃ ঢালু করিয়া চারিপার্শ্বে জমির সহিত মিলাইবে। পাড়ের উপর হইতে ঐ ঢালু জমিতে ছোট ছোট ফুলের গাছ পুতিলে, বা সুদৃশ্য লতা গাছ দিলে, পাড় খারাপ হয় না, অথচ চমৎকার শোভা হয়।

পথ—উদ্যানের সমস্ত বিষয়ই তাহার সীমা ও ভিতরের জমির অবস্থা বুঝিয়া স্থির করিতে হয়; বৃহৎ উদ্যানের রাস্তাগুলি বেশী চৌড়া করিতে পারা যায়, ক্ষুদ্র উদ্যানে সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে। ফটক হইতে উদ্যান গৃহ পর্য্যন্ত টানা সোজা রাস্তা না করিয়া বক্রভাবে ঘুরাইয়া রাস্তা প্রস্তুত করিলে দেখিতে সুন্দর হয়। অনেকে ফটক হইতে দুই দিক দিয়া একেবারে দুইটী রাস্তা ঘুরাইয়া উদ্যান গৃহের দরজার সম্মুখে উপস্থিত করা পসন্দ করেন; এ প্রণালীও মন্দ

রহে। শাখা রাস্তা গুলিও সোজা সুজি না করিয়া বক্র ভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একটী অপরটীর সহিত মিলাইবে। মূল রাস্তার দুই ধারে পুতিবার জন্ত, যে সকল গাছ দেখিতে সুন্দর, অথচ শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া সুশীতল ছায়া দানে সমর্থ, সেই সকল গাছ পছন্দ করিবে। রাস্তা অধিক চওড়া না হইলে মেঁদি গাছের বেড়া দিলেই ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। শাখা রাস্তাগুলির ধারে ধারে অনতিবৃহৎ নানা বর্ণের চিত্র বিচিত্র ক্রোটন অর্থাৎ পাতাবাহেরর গাছ বা ফুলের গাছ দিলে, পথের বক্রতা অনুসারে ঐ সকল গাছ শ্রেণীবদ্ধরূপে সজ্জিত থাকায় দূর হইতেই পথের বক্রতা লক্ষিত হয়, এবং বড় সুন্দর দেখায়। উদ্যান গৃহের সম্মুখে একখণ্ড ঘাসের জমি রাখিয়া তাহার চারি পার্শ্বে গোলাকারে রাস্তা প্রস্তুত করিলে দেখিতে ভাল হয়, অথচ ঐ জমিখণ্ড ব্যায়ামাদি ক্রীড়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

সার—কৃষিকার্য্যে সার অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু বৃক্ষের অবস্থা ও স্বাস্থ্য বুঝিয়া দিতে না পারিলে, উহা দ্বারা অপকারও হইয়া থাকে; যেমন, মটরে সার দিলে গাছ ঝরিয়া যায়; আর বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতিতে সার না দিলে গাছের তেজ হয় না। উদ্ভিজ্জসার সাধারণতঃ সকল বৃক্ষের পক্ষেই উপকারী। ঘোড়া ও গরুর বিষ্ঠা যখন শুকাইয়া এরূপ হইবে যে হাত দিয়া সহজে গুঁড়া করিতে পারা যায়, তখন তাহা সাররূপে গণ্য, এবং সেই অবস্থায় বাগানে ছড়াইলে বিলক্ষণ উপকার হয়। মনুষ্যের বিষ্ঠাও উৎকৃষ্ট সার; যে পতিত জমিতে মনুষ্যে মলমূত্র ত্যাগ করে, কিছু দিন পরে সেই স্থানে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলে তত্রত্য বৃক্ষাদি অতিশয় তেজস্ক হয়। ভেড়া ও ছাগলের বিষ্ঠা ও খুব তেজস্কর সার। ফুল গাছের পক্ষে কুক্কুট ও পায়রার বিষ্ঠার সার বড় ভাল। সদ্য অশ্ব মূত্রের তেজ দুঃসহ; তাহা চারার মূলে দিলে গাছ মরিয়া যায়। খৈলের সার অধিকাংশ শাকসবজির পক্ষে উত্তম। কীটপতঙ্গ আদি কতকগুলি সামুদ্রিক উদ্ভিজ্জের নির্মিত লবণসার উপযোগী। সাম্বৎসরিক চারা রোপণ করিতে হইলে জমিতে

তিন বার সার দিবে। (১ম) চারা রোপণের পূর্ব্বে ভূমি খনন করিয়া একবার; (২য়) চারা রোপণ সময়ে একবার; (৩য়) চারা বড় হইলে একবার। বর্ষাকালে সার দিলে তাহা বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া যায়, সুতরাং তাহাতে বিশেষ ফল হয় না; মাঘ বা ফাল্গুন মাসে সার দিলে তাহা অপচয় হইতে পারে না। সারের বিস্তৃত বিবরণ স্বতন্ত্ররূপে লিখিত হইবে, এজন্য এস্থানে উহার বাহুল্য বর্ণনা করা গেল না।

জলসিঞ্চন—জল উদ্ভিজ্জের জীবন স্বরূপ; জলহীন স্থানে উদ্ভিজ্জ সমূহ জন্মিতে পারে না। উষ্ণ দেশের অনেক বালুকাময় ক্ষেত্রে বর্ষাকালে বহুল উদ্ভিজ্জ জন্মিতে দেখা যায়, কিন্তু বর্ষান্তে ভূমি নিরস হইলেই তাহা মরুভূমির আকার ধারণ করে। ভারতবর্ষ দেবমাতৃক দেশ; এদেশের কৃষকেরা বৃষ্টির জলের প্রতি অধিক নির্ভর করে। যে বৎসর আবশ্যক মত বৃষ্টি হয়, সে বৎসর কৃষিকার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে; বৃষ্টির অভাব ঘটিলে বা অতি বৃষ্টি হইলে, এ দেশীয় কৃষিকার্য্যের পক্ষে বিলক্ষণ বাধা হইয়া থাকে। কারণ এদেশের কৃষকেরা জল সিঞ্চনের ভাল বন্দোবস্ত করে না অথবা অতিরিক্ত জল নির্গমনের উপায় রাখে না; এজন্য শুকার সময় বা পূর্ণবর্ষার সময় অনেক শস্য ও ফল পুষ্পাদির বৃক্ষের হানি হইয়া থাকে।

শস্যক্ষেত্রেই প্রচুর জলের আবশ্যক। জলদ্বারা ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিতে পারা যায়, শস্যক্ষেত্রের পক্ষে তদ্রূপ ব্যবস্থা রাখিতে হয়। ফলপুষ্পের উদ্যানে তাদৃশ জলের প্রয়োজন হয় না। তোলা জল সিঞ্চন দ্বারাই ফল পুষ্পের উদ্যানে জলের আবশ্যকতা পূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু উদ্যানের জলসিঞ্চনে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। প্রবল ধারায় জল দিলে চারার মূলে গর্ত্ত হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে; এজন্য ফল বা পুষ্পের চারার মূলে বোমা অথবা তাদৃশ সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট পাত্র জল পূর্ণ করিয়া ক্ষীণ ধারায় জল সেচন কর্ত্তব্য। বীজ বপনের পর অধিক জল সেচন করা উচিত নহে। কারণ অধিক

জল সেচন করিলে, বীজ অধিক মাটির নীচে যায় অথবা বীজের উপরিস্থ মৃত্তিকা ধৌত হইয়া বীজ বাহির হইয়া পড়ে; বিশেষতঃ জলের পরিমাণ অধিক হইলে অনেক বীজ পচিয়া যায়। বীজে অঙ্কুর জন্মিলে এবং শিকড় বহির্গত হইলে সেই সকল শিকড় যেমন অল্পে অল্পে মাটির নীচে প্রবেশ করে, সেইরূপ হিসাবে অর্থাৎ অল্প অল্প মাটি ভিজিবার উপযুক্ত জল দিতে হয়। পুনশ্চ ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জল না পাইলেও বীজ শুষ্ক হইয়া অঙ্কুরোৎপাদনে অক্ষম হয়।

গাম্‌লায় বা টবে বীজ বপন করিলে, তাহাতে দুর্ব্বার আটি ভিজাইয়া জলের ছিটা দেওয়া উত্তম। অঙ্কুর না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ গাম্‌লা বা টবের উপরে উলু খড় বিছাইয়া তদুপরি বোমার সূক্ষ্ম-ধারায় জল সেচন করিলে, বীজের উপরিস্থ মৃত্তিকা ধৌত হইতে পারে না কিম্বা প্রবল ধারার নিমিত্ত বীজ অধিক মাটির নীচে যাইতে পারে না। এই প্রক্রিয়ার আর একটী গুণ এই যে, অন্ধকারে অঙ্কুরোৎ-পাদন ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অধিকাংশ ফুলের চারা উৎপন্নের জন্য এই নিয়ম ভাল।

উদ্যানস্থ আম, কাঁটাল, নিচু প্রভৃতি বৃহৎ বৃক্ষের মূলে আলবাল প্রস্তুত করিয়া জল সেচন করিবে। অপরাহ্ণে জল সেচন করাই উচিত। রৌদ্রের সময় জল দিলে চারার অপকার হয়। গ্রীষ্মকালে প্রতি দিবস প্রাতে ও অপরাহ্ণে জল সেচন করিবে। বর্ষার জলে যখন চারার মূলস্থ মৃত্তিকা সরস থাকে তখন জল সেচনের আবশ্যক হয় না। ফলতঃ বৃক্ষ ও ঋতুর অবস্থা বুঝিয়া জল সেচন করাই কর্ত্তব্য। জল উদ্ভিজ্জের অত্যন্ত আবশ্যকীয় হইলেও অতিরিক্ত জলে হানি হইয়া থাকে। সন্ধ্যাকালের একবারের জল সেচন, প্রাতঃকালের দুই বারের সমান; কারণ প্রাতঃকালে জল দিলে তাহার অনেক বাষ্প হইয়া যায়। সন্ধ্যাকালের জল খুব কম বাষ্প হয়।

চারারোপণ—যে সকল উদ্ভিজ্জের কাণ্ড মৃত্তিকার উপরে থাকিয়া বৃদ্ধি পায়, তাহাদের চারা রোপণ সময়ে এরূপ সতর্ক হইবে,

যেন মূলের সীমা অতিক্রম করিয়া মৃত্তিকা গর্ত্তে কাণ্ড প্রোথিত না হয়। বৃক্ষের পূর্ণাবস্থায় মূল ও শাখা যতদূর বিস্তৃত হইতে পারে তাহা স্মরণ করিয়া জমিতে স্থায়ীরূপে বীজ বা চারা রোপণ করিবে। বৃক্ষ ঘন ঘন জন্মিলে, পরে পরস্পরের শাখায় শাখায় ও মূলে মূলে সংস্পৃষ্ট হইয়া নিপীড়িত হয়, তাহাতে ভালরূপ ফল ফুল জন্মিতে পারে না।

চারা স্থানান্তরিত করিতে হইলে শরৎকালে বা বর্ষার প্রারম্ভে করা ভাল, কারণ এ সময়ে মূলের রস পরিশোষণ শক্তি অপেক্ষাকৃত কম তেজস্বিনী থাকে। সুতরাং ঐ শক্তি তেজস্বিনী হইবার পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত হওয়া নিবন্ধন উদ্ভিজ্জের যাবতীয় ক্লেশ দূর হইয়া যায়। বড় বড় বৃক্ষের চারা বর্ষাকালে রোপণ করিলে হানি হয় না; কারণ বৃষ্টির জল চারাকে জীবিত রাখার পক্ষে বিশেষ সাহায্যকারী হইয়া থাকে। উদ্যানে রোপণযোগ্য যাবতীয় ফল ও পুষ্প বৃক্ষের রোপণ প্রণালী পৃথক পৃথক রূপে লিখিত হইবে।

পুষ্পবীথিকা—জগদীশ্বরের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে পুষ্প অতি মনোহর পদার্থ। পুষ্প সজ্জিত স্থান দর্শন করিলে, অন্তঃকরণে অসীম আনন্দ জন্মে এবং তাহা দৃষ্টিমাত্রেই মন হরণ করে। ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকারের পরম সুন্দর যথেষ্ট পুষ্প আছে। বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ সকল পুষ্পে ক্ষেত্র সাজাইতে পারিলে উদ্যানের অনুপম সৌন্দর্য্য সম্পাদিত হয়। দেবার্চ্চনার জন্য এদেশে হিন্দুদিগের মধ্যে পুষ্পের অতিশয় আদর। পুষ্প বাস্তবিকই দেবযোগ্য উপহার, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পুষ্পক্ষেত্র সাজাইবার পক্ষে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই যত্ন দৃষ্ট হয় না, এবং কাহারও প্রস্ফুটিত পুষ্পপূর্ণ সজ্জিত উদ্যান দেখিলে ক্ষেত্রের শোভা নষ্ট করিয়া অতি অন্যায়রূপে পুষ্পগুলি অপহরণ করাকে তাঁহারা দোষের কার্য্য মনে করেন না। আমাদের মতে পুষ্প শোভিত ক্ষেত্রের পুষ্প চয়নযোগ্য নহে। যখন পুষ্পগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া বৃক্ষের ও উদ্যানের শোভা সংবর্দ্ধন করিবে, তখন তাহা না তুলিয়া সেই অবস্থাতেই প্রীতি উপহারস্বরূপ ঈশ্বরের পদে

সমর্পিত হওয়াই ভাল। যাঁহারা এরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন অপেক্ষা পুষ্পচয়ন অধিক ভাল বাসেন, তাঁহাদের নিজের পুষ্পক্ষেত্র থাকা উচিত।

এদেশের পুষ্পোদ্যানগুলির সজ্জীকরণ প্রণালী প্রায় একই প্রকার। সচরাচর রাস্তাগুলি পার্শ্বস্থ জমি অপেক্ষা উচ্চ করা হইয়া থাকে। তাহাতে জল সেচনের অত্যন্ত সুবিধা হয়। রাস্তার উভয় পার্শ্বের ভূমিতে লোকের রুচি অনুসারে গোলাকার, ডিম্বাকার, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, পঞ্চকোণ প্রভৃতি নানাবিধ আকারের ভূমি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বহুবিধ অনতিবৃহৎ পরম সুন্দর ফুলের গাছ রোপণ করা হয়। পুষ্প সজ্জিত ঐ সকল ভূখণ্ডকে পুষ্প বীথিকা বলে। পুষ্প বীথিকায় গুল্মের ন্যায় ঝাড়াল গাছ দেখিতে অতি সুশ্রী ও তাহাতে অনেক ফুল ফোটে। এজন্য তাহাই লোকের অধিক মনোনীত।

উপরে যে সকল বিবিধ আকার ভূখণ্ডের কথা উল্লেখিত হইল, তাহাদের প্রত্যেকটীর অভ্যন্তর ভাগ, আবার কতকগুলি অংশে বিভক্ত। ঐ সকল অংশ একাকৃতিক ও একটী অপরটীর সম্মুখ ভাগে থাকে। অংশগুলি এইরূপ শৃঙ্খলে চিহ্নিত হইলে সাজাইতে সুবিধা ও দেখিতে সুন্দর হয়। পুষ্প বীথিকার ঠিক মধ্যস্থলে ও অংশগুলিতে বিভিন্ন বর্ণের ফুলের গাছ রোপণ করিবে। মধ্যস্থলের ফুলেরবর্ণ তাহার পার্শ্বস্থ সকল অংশের ফুলেরবর্ণ অপেক্ষা পৃথক হইলে এবং পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী দুই দুইটী অংশে ফুলেরবর্ণগত ঐক্য থাকিলে, দেখিতে অতি মনোজ্ঞ হয়। যদি গাছগুলি সমোচ্চ এবং ফুলগুলি সুশ্রী ও নানাবর্ণের হয় এবং এক সময়ে সকল গাছে ফুল ফুটিয়া উঠে, বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক এরূপ ফুলের গাছ নির্ব্বাচন করিয়া রোপণ করা হইলে ঐ সমুদায় পুষ্পবীথিকার যে অপূর্ব্ব শোভা হয়, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না।

অধুনা অনেকে দেশীয় পুষ্প অপেক্ষা বহুবিধ বিলাতী পুষ্প দ্বারা পুষ্পবীথিকা সাজাইতে ভাল বাসেন। বস্তুতঃ বিলাতী অনেক প্রকার

ঋতু পুষ্পের সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার। উহাদের দ্বারা সজ্জিত পুষ্প-ক্ষেত্রের শোভা বড়ই মনোরম্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ সকল সুন্দর পুষ্পগুলি প্রায়ই সৌরভবিহীন। উহারা কেবল রূপের জন্যই আদরণীয়।

জারানিয়ম্‌স নামক ফুল পুষ্পবীথিকার মধ্যস্থলের জন্য বড় মনোহর। এই জাতীয় ফুলেরগাছ টব সমেত বা টব ভিন্ন মধ্যস্থলে রোপণ করিয়া তাহার চারিপার্শ্বস্থ অংশ গুলির পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী দুই দুইটী অংশে শ্বেতবর্ণের ভারবিনা, হরিদ্রাবর্ণের কলশিওরিয়া, নীলবর্ণের লবেলিয়া, লালবর্ণের ভারবিনা প্রভৃতি ফুলেরগাছ রোপণ করিলে, পুষ্পবীথিকার দৃশ্য অতি চমৎকার হয়।

পুষ্পবীথিকার মধ্যস্থলে নানা বর্ণের ফুল দিয়া, চতুস্পার্শ্বে এক বর্ণের ফুল দিলেও সুন্দর সজ্জিত হইয়া থাকে। চতুর্দ্দিকের অংশ গুলি নানাবর্ণের ফুল দিয়া সাজান দুরূহ বোধ হইলে, তাহা ঘাসের দ্বারা সাজাইবে। চারিদিকে সমোচ্চ ও পরিষ্কৃত গোলাকার ঘাসের মধ্যে বিবিধ বর্ণের ফুলেরগাছ থাকিলেও অতি সুন্দর দেখায়। কাণপুরে তৃণ বেষ্টিত গোলাপবাগান বড় চমৎকার দৃশ্য।

গোলাকার পুষ্পবীথিকা সাজানের পক্ষে পশ্চাল্লিখিত বন্দোবস্ত ভাল। মধ্যস্থলে গাঢ়লাল অথবা হলুদ রঙ্গের গোলাপ রোপণ করিয়া, তাহার চারিপার্শ্ব বেষ্টনপূর্ব্বক সাদারঙ্গের গোলাপ রোপণ করিবে। অনন্তর সাদা ভারবিনা, মিগ্‌নোনেট, নীলরঙ্গের নিমোফিলা প্রভৃতি বিলাতী ফুলগুলি ক্রমান্বয়ে গোলাকারে রোপণ করিবে।

এদেশে, বেল,যুঁই মল্লিকা, গন্ধরাজ, গোলাপ, গান্ধা, দোপাটী, রজনীগন্ধা, স্থলপদ্ম, জবা,অতসী প্রভৃতি সহজ প্রাপ্য ফুলগুলি দ্বারাও পুষ্পক্ষেত্র সুন্দর রূপে সজ্জিত হইতে পারে। পুষ্পবীথিকার, সমুদায় গাছ সমোচ্চ না হইলে, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ জাতীয় গাছগুলি মধ্যস্থলে রোপণ করিয়া পার্শ্বে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র জাতীয় গাছ রোপণ করিবে। তাহাতে সৌন্দর্য্যের হানি হইবে না, অধিকন্তু জল সেচনের সুবিধা হইবে।

তৃণবীথিকা—উদ্যানের মধ্যে পুষ্করিণীর কিছু দূরে এক খণ্ড ঘাসের জমি প্রস্তুত করিতে পারিলে, বড় সুন্দর শোভা হয়। তাহা দেখিয়া মনে যে সুখ হয়, কোন সুমিষ্ট ফলের আস্বাদ বা সুগন্ধি ফুলের অঘ্রাণে সে সুখ পাওয়া যায় না; এজন্য এরূপ এক খণ্ড ঘাসের জমি প্রস্তুত করা কখনই অলাভ জনক নহে। সুসজ্জিত এবম্বিধ তৃণ-ক্ষেত্রকে, তৃণবীথিকা শব্দে উল্লেখ করা গেল।

তৃণবীথিকা প্রস্তুত করিতে হইলে, মৃত্তিকা উত্তমরূপে খুঁড়িয়া তাহার কাঁকরাদি কঠিন দ্রব্য বাছিয়া ফেলিবে। পরে কিছু পুরাতন সার ছড়াইয়া মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে এবং লৌহ নির্ম্মিত রুল টানিয়া সেই মৃত্তিকা সমানরূপে চাপিয়া বসাইবে। রুল টানিবার পূর্ব্বে মাটি এরূপ সাজাইয়া লইবে, যেন রুল টানিলে ভূমিখণ্ড ক্রমশঃ ঢালু হইয়া আইসে। এই ঢালু বেশী না করিয়া এরূপ ভাবে করিবে যে, কেহ সহসা দেখিলে ঢালু বলিয়া বুঝিতে না পারে। ঢালুর উচ্চদিক জলের দিকে রাখিবে। তাহা হইলে সঞ্চিত জল বা বৃষ্টির জল অনায়াসে গড়াইয়া যাইবে; তাহাতে উপরিভাগ কোথাও উচ্চ কোথাও নীচ হইয়া দেখিতে খারাপ হইবে না। এই প্রকারে জমি প্রস্তুত হইলে, ঘাসের বীজ ছড়াইয়া পুনরায় রুল টানিবে। এই কার্য্যে আমদানী বীজ ভাল নহে; কারণ আমদানী বীজের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বীজ মিশান থাকে। গাছ বাহির হইলে সে গুলি নীড়ান দিয়া তুলিয়া ফেলিতে হয়, সুতরাং কাকে ঠোকরানের ন্যায় এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো হইয়া বিশ্রী দেখায়। এদেশে দুর্ব্বাঘাস দিয়া এইরূপ জমি সাজানই সৎপরামর্শ। উহা দেখিতেও যেমন মনোহর, উৎপাদন প্রণালীও তেমনি সহজ।

দুর্ব্বাঘাস দিয়া জমি সাজাইতে হইলে উল্লিখিত রূপে জমি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আট অঙ্গুল অন্তর রেখা টানিবে এবং প্রতি রেখায় পাঁচ অঙ্গুল অন্তর দুর্ব্বার ছোট ছোট শিকড় হেলাইয়া পুতিবে ও তাহাতে বেশী পরিমাণে জল সেচন করিবে। ছয় দিন গত হইলে পুনরায় রুল টানিয়া জল দিবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ঘাসের

জমিতে গ্রীষ্মকালে বেশী জলের প্রয়োজন। তখন তথায় তিন চারি দিন অন্তর জল দিতে হয়।

যদি জমিকে শীঘ্র শীঘ্র ঘাসের দ্বারা আচ্ছাদনের ইচ্ছা হয়, তবে দুর্ব্বার শিকড় ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া তাহা মাটি ও গোবরের সহিত মিশাইবে এবং সেই মাটি প্রস্তুত জমিতে বিছাইয়া দিবে। এই জমিতে মধ্যে মধ্যে তরল সার দিলে ঘাস খুব ঘন হইয়া সবুজ মকমলের আকার ধারণ করে। তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঘাস বাড়িতে দিবে। এই অবকাশে যে যে স্থানে ঘাস জন্মে নাই সেই সেই স্থানে নাড়িয়া পুতিলে সেখানেও ঘাস হইবে। যদি কাঁচি কিম্বা কাস্তে দ্বারা সমান করিয়া ঘাস ছাটিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বড় সুন্দর হয়। ছাটিবার আগে ও পরে এক একবার রুল দিতে হইবে। ঘাস সমান রূপে ছাটিবার জন্য একরূপ বিলাতী যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহা ব্যবহার করিলে ঘাস ছাটা ও রুল টানা এক সঙ্গেই হইয়া যায়। ঘাস ছাটিবার সময় সতর্ক হইবে, যেন ঘাসের শিকড় কাটিয়া বা মৃত্তিকা খুঁড়িয়া না যায়। গোলাকার ঘাসের জমির প্রান্তে ফুলের গাছ দিলে অতিশয় শোভা হয়।

উদ্যান সাজাইবার আরও কতকগুলি বিষয় আছে। চিত্র ব্যতীত সেগুলি ভাল বুঝান যায় না। এজন্য সে সকল সচিত্র প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। এখন উদ্যানকে ফল, পুষ্প ও শাকসবজি এই তিন অংশে বিভক্ত করিয়া ক্রমান্বয়ে তাহাদের উৎপাদন প্রণালী বর্ণন করিব। উদ্যানে রোপণযোগ্য ফল বৃক্ষাদির উৎপাদন নিয়ম অগ্রে লিখিত হইবে।

আম্র।

উৎকৃষ্ট আম্র যে কি উপাদেয় পদার্থ এদেশের লোককে তাহা বুঝাইতে হইবে না, সকলেই অবগত আছেন; ঐগুণের জন্যই বোধ হয় আম্রকে এদেশে অমৃত ফল বলে। বস্তুতঃ আম্রের তুল্য উত্তম

ফল আর দেখা যায় না। ল্যাঙরা, ফজলি, বোম্বাই প্রভৃতি এখন যত প্রকার উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্র দেখা যায় বঙ্গদেশে পূর্ব্বে এত ছিল না; ঐ সকল উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত হইয়াছে; বঙ্গদেশের মধ্যে মালদহ উৎকৃষ্ট আম্রের জন্য পূর্ব্বাবধি বিখ্যাত।

আম্রের আঁটির চারা রোপণের প্রথা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এখন আঁটির চারা অপেক্ষা কলমের চারা লোকে অধিক পছন্দ করে। দোষ গুণ উভয় প্রকার চারারই আছে। কলমের চারা অপেক্ষা আঁটির চারায় বিলম্বে ফল ধরে এবং কলমের চারার ফল যেমন জনকবৃক্ষের অনুরূপ হয়, আঁটির চারা সেইরূপ হয় না, কিন্তু কলমের চারা অপেক্ষা আঁটির চারা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও প্রচুর ফলশালী হইয়া থাকে এবং ইহা অপেক্ষাকৃত নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধি পায়।

এদেশে জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত সুপক আম্র সচ্ছল রূপে পাওয়া যায়। সচরাচর লোকে আম খাইয়া তাহা মনোমত হইলে, চারা উৎপাদনার্থ আঁটি গুলি সামান্য ভাবে কোন স্থানে পুতিয়া রাখে। কিন্তু উৎপন্ন চারায় ফল লাভের প্রত্যাশা থাকিলে বীজ রোপণে অত তাচ্ছীল্য করা উচিত নহে। বীজে চারা জন্মাইতে হইলে কোন দো-আঁশ মৃত্তিকা-বিশিষ্ট স্থান উত্তমরূপে খুঁড়িয়া তাহার কাঁকরাদি বাছিয়া ফেলিবে এবং সেই স্থানে পরস্পর অর্দ্ধহস্ত অন্তর রাখিয়া বীজ রোপণ করিবে। রোপণ সময়ে বীজের বুকের দিক অর্থাৎ যে দিক হইতে অঙ্কুর বহির্গত হইয়া থাকে, সেই দিক উপরে রাখিবে। বীজ এইরূপ অন্তরে অন্তরে রোপণ করিলে চারা তুলিয়া তাহার ভবিষ্যতের স্থায়ী আবাসস্থানে রোপণ করিবার সময় গোড়ার মাটি সমেত তুলিয়া লইতে কোন অসুবিধা হয় না। বর্ষার জল পাইয়া উক্ত বীজে চারা জন্মিলে, কেহ কেহ ভাদ্র বা আশ্বিন মাসে, কেহ কেহ বা পর বৎসর বর্ষাকালে তাহাদিগকে স্থায়ীরূপে উদ্যানে রোপণ করা পছন্দ করেন। উভয় নিয়মই অবলম্বিত হইতে পারে; কিন্তু এক বৎসরের চারা স্থানান্তরিত

করিতে হইলে, একটু বেশী সতর্কতার আবশ্যক; কারণ এক বৎসরে যতদূর শিকড় বিস্তার করে, তত দূরের মৃত্তিকা গভীররূপে খুঁড়িয়া গোড়ার মাটি সমেত চারা তুলিতে হয়; অন্যথা শিকড়ে আঘাত পাইলে চারার অনিষ্ট ঘটে। এইরূপ সতর্কতা অবলম্বিত হইলে, দুই তিন বৎসরের চারা স্থানান্তরিত করিলেই হানি হয় না। চারাগুলি উদ্যানে স্থায়ীরূপে রোপণ করিবার সময় পরস্পর ১৬ হইতে ২০ হাত পর্য্যন্ত ব্যবধানে রাখিবে। ঘন ঘন রোপণ করিলে, বৃক্ষের পূর্ণ অবস্থায় মূলে মূলে ও শাখায় শাখায় সংঘর্ষিত হইয়া নিস্তেজ হয় ও ফলোৎপাদন শক্তি বিহীন হইয়া পড়ে।

যাঁহারা বীজের চারা পছন্দ না করেন, তাঁহারা কলমের চারা সংগ্রহ করিয়া রোপণ করিবেন। যোড় ও গুলকলমে আম্রের চারা প্রস্তুত হইতে পারে; তন্মধ্যে যোড়কলমের চারাই অধিক প্রচলিত। যেরূপে এই কলম করিতে হয়, তাহার প্রণালী কলমের প্রকরণে লিখিত হইয়াছে; সুতরাং এখানে তাহা পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

আম্রের আঁটির চারা বা কলম, বর্ষা, শরৎ কিম্বা বসন্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে রোপণ করাই ভাল। শীতকালে রোপণ করিলে চারা বাঁচাইতে বিশেষ যত্নের আবশ্যক। উদ্যানের যে যে স্থানে চারা রোপিত হইবে, পূর্ব্বেই তথায় গর্ত্ত করিবে এবং সেই স্থানের মৃত্তিকার সহিত কিছু উদ্ভিজ্জ সার বা মিশ্রিতসার মিশাইবে। গর্ত্তগুলি এরূপভাবে হওয়া উচিত, যেন মূলের মাটি সমেত চারা তথায় নির্ব্বিঘ্নে বসিতে পারে এবং গর্ত্তের গভীরতা অধিক হইয়া চারার কাণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত না হয়। অনেকে কলমের চারার যোড় স্থানের কিয়দংশ পর্য্যন্ত মৃত্তিকাগর্ত্তে প্রোথিত রাখিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে ঐ যোড়ে প্রায় উই ধরে। আবার যোড় অত্যন্ত উচ্চে থাকাও ভাল নহে, কারণ তাহা হইলে প্রবল বাতাস বা ঝড়ে দুলিবার সময় যোড় চিরিয়া চারার অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অতএব চারার একবারে মস্তকের দিকে যোড় বান্ধিয়া কলম করা উচিত নহে। চারা পোতা হইলে, গোড়ায় মাটি দিয়া চারিপার্শ্ব

ঠাসিয়া দিবে কিন্তু গোড়ার দিকের মাটি বেশী ঠাসিবে না; কারণ অধিক চাপ পাইলে গোড়ার জমাট মাটি আল্‌গা হইয়া শিকড়ে আঘাত লাগিবে। যত দিন পর্য্যন্ত এই স্থানে শিকড় না ধরে, তাবৎ একদিন অন্তর বৈকালে জল সেচন করিবে। বৃষ্টি হইলে জল দেওয়ার আবশ্যক নাই। বর্ষাকালে যে স্থানে জল দাঁড়ায় বা যে স্থান পার্শ্বস্থ জমি অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া রস শূন্য হয়, তথায় চারা রোপণ করিবে না। চারার গোড়া সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিবে।

কলমের চারার অতি শীঘ্র মুকুল উৎপন্ন হয়। প্রথম দুই এক বৎসরের মুকুল ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা তাহাতে ফল জন্মিলে, চারা অতিশয় নিস্তেজ হইয়া পড়ে। গাছ বড় হইলে, প্রতিবৎসর আষাঢ় মাসে কিছুদিন বর্ষার জল খাওইবার জন্য মাটি খুঁড়িয়া গোড়ায় আলবাল প্রস্তুত করিয়া দিবে এবং কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে পুনরায় গোড়া খুঁড়িয়া শিকড়গুলি বাহির করতঃ তাহাতে রৌদ্র বাতাস শিশিরাদি লাগিতে দিবে। কুড়ি বাইস দিন পরে পুরাতন মৃত্তিকার পরিবর্ত্তে নূতন মৃত্তিকা ও সার দিয়া পুনরায় শিকড়গুলি ঢাকিয়া দিবে। এইরূপ করিলে বৃক্ষ অত্যন্ত সতেজ হয় ও প্রচুর ফল প্রসব করে।

ভারবর্ষে অনেক জাতীয় উৎকৃষ্ট আম্র আছে। তন্মধ্যে ল্যাংড়া ফজলি, বিবিধ প্রকার বোম্বাই, গোপালে ধোপা প্রভৃতি কতকজাতি বিশেষ বিখ্যাত। একজাতীয় আম্রবৃক্ষে বৎসরে দুইবার মুকুল ও ফল জন্মে; পৌষমাসে একবার এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার, সুতরাং তাহাতে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই আম্র থাকে; এজন্য ঐ জাতীয় বৃক্ষ বারমেসে ও দোফলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সামান্য ব্যবসায়ীরা কলমের চারা বিক্রয় সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রতারণা করে। তাহাদের নিকট অতি নিকৃষ্ট জাতীয় আম্রের কলম, উৎকৃষ্টজাতি বলিয়া বিক্রীত হয়। যাবৎ ফল না ধরে, তাবৎ ভালমন্দের পরিচয় পাওয়া যায় না। পাতার লক্ষণ দেখিয়া বহুদর্শী ব্যক্তিদিগের দ্বারা কতিপয় প্রসিদ্ধ জাতীয় আম্রের অনুমান হইতে

পারিলেও অনেক সময়ে ঐ অনুমান ঠিক্ হয় না। এজন্য কলমের চারা বিশ্বস্ত ভদ্র ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে ক্রয় করাই কর্ত্তব্য।

যশোহর, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার আম্রে একরূপ পোকা জন্মিয়া ফল অখাদ্য করিয়া ফেলে। কি কারণে ঐ পোকা জন্মে এবং কি উপায়ে উহা নিবারিত হইতে পারে, অদ্যাপি তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, কোন কোন স্থানে জল মৃত্তিকার প্রকৃতি অনুসারে স্বভাবতঃ এক প্রকার কীটাণু জন্মে, তাহারা বায়ুতে উড্ডীয়মান হইয়া আম্রের মুকুলে পতিত এবং মধুপানে লিপ্ত হয়, ঐ মুকুল ফলে পরিণত হইলেও তাহারা প্রস্থান করে না, ফলের মধ্যে থকিয়াই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং ক্রমে পুষ্ট দেহ হইয়া ফলের পক্কাবস্থায় বা তৎপূর্ব্বে ফলের গাত্রে ছিদ্র করতঃ বাহির হয়, কোন কোনটী বা পক্কাবস্থাতেও ফলের মধ্যে থাকিয়া যায়। আম্রে পোকা জন্মিবার সম্বন্ধে যতগুলি কথা শুনা যায় তন্মধ্যে এই উক্তিটীর সহিত আমাদের মতের ঐক্য হয়, কিন্তু যাবৎ ইহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধান না হইতেছে তাবৎ কোন কথাই তৃপ্তিজনক রূপে স্বীকার করা যায় না; আর এই কারণ সত্য হইলে, কীট নিবারণ সম্বন্ধে কোন সহজ উপায় হওয়ার সম্ভাবনা দেখি না।

কাঁটাল।

কাঁটাল অতি বৃহৎ ও সুখাদ্য ফল। ইহা বাঙ্গলার প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মিয়া থাকে। দো-অাঁশ জমিতে কাঁটালের গাছ ভাল জন্মে। জমি একটু উচ্চ হওয়া আবশ্যক; কারণ বন্যার জল উঠিলে বা বর্ষার জল জমা হইয়া গোড়ায় বসিলে এই গাছের বিশেষ অনিষ্ট হয়। বীজ রোপণ দ্বারাই চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কলমে চারা জন্মাইতে এ পর্য্যন্ত কেহ কৃতকার্য্য হন নাই। কিন্তু সম্প্রতি ইহার যোড়কলম করিবার নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে। অন্যান্য বৃক্ষের যোড়কলম করি-

ষার যে নিয়ম, কাঁটালের পক্ষেও সেই নিয়ম। কেবল প্রভেদ এই, কলম করিবার সময় ইহার চারা ও শাখার সংযোগ যোগ্যস্থান কাটিলেই ক্ষীরবৎ ঘন যে আটা নির্গত হইবে, তাহা উদ্গত হওয়া বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ মুছিয়া ফেলিবে এবং ততক্ষণ যোড়বান্ধা বন্ধ রাখিয়া অপেক্ষা করিবে। ঘন আটা নির্গম বন্ধ হইলেই যোড় বান্ধিবে। এরূপ না করিলে ঐ উদ্গত আটা সঞ্চিত হইয়া শুষ্ক হয়, তাহাতে যোড় লাগে না। ক্যালবিয়ম নামক যে নির্য্যাসে যোড় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কাঁটালের উক্ত ঘন আটা বন্ধ হইলেই সেই নির্য্যাসে যোড় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কাঁটালের উক্ত ঘন আটা বন্ধ হইলেই সেই নির্য্যাসের সঞ্চার হইয়া থাকে। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শুড়াস্থ উদ্যানে ঐরূপ কাঁটালের যোড় কলমের চারা প্রস্তুত হইয়াছে। বটের চারার সহিত কাঁটালের যোড়কলম হইতে পারে শুনিয়া আমরা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু যত্ন সফল হয় নাই। যাঁহাদের কৌতূহল আছে তাঁহারা এ বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

চারা উৎপাদনার্থ বীজ একস্থানে পাতো না দিয়া একেবারে উপযুক্ত অন্তরে স্থায়ীরূপে উদ্যানে রোপণ করাই ভাল; কারণ ইহার চারা স্থানান্তরিত করিতে বিশেষ সতর্কতার আবশ্যক; শিকড় অল্প আহত হইলেই চারা বাঁচান দুষ্কর হইয়া উঠে। এদেশে একটী প্রবাদ আছে যে কাঁটালের চারা নাড়িয়া পুতিলে সে গাছে ভুয়ো অর্থাৎ কোশশূন্য ফল হয়। একথা সত্য নহে, ইহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। চারা স্থানান্তরিত ক্রিয়ার কষ্টসাধ্যতাই বোধ হয় ঐ প্রবাদের মূল। ফল পরিপক্ক হওয়ার অব্যবহিত পরেই বীজ রোপণ করিতে হয়, শুষ্কবীজে গাছ জন্মে না। অনেক সময়ে সুপক্ক ফলের মধ্যেও বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায়।

চারা প্রস্তুতের আর এক প্রকার প্রণালীর কথা শুনিয়া তাহার পরীক্ষা হইতেছে। পরীক্ষায় চারা জন্মান গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ফল জন্মে নাই। সে প্রণালী এই,—এক একটী বীজ পৃথক পৃথক

না পুতিয়া সুপক্ক আস্ত কাঁটাল বোঁটারদিক উপরে রাখিয়া রোপণ করিবে এবং শৃগালাদিতে তুলিয়া না খায় এজন্য চারিপার্শ্ব উত্তমরূপে ঘেরিয়া দিবে। দুই তিন দিন পরে বোঁটা ধরিয়া টানিলে কোষ-দণ্ড (অর্থাৎ যাহা বেষ্টন করিয়া কোষগুলি থাকে) উঠিয়া যাইবে। তাহাতে ফলের মধ্যস্থলে যে গর্ত্ত হইবে, সজ্জিত কোষগুলির বীজ হইতে সেই গর্ত্ত দিয়া অনেক চারা উর্দ্ধদিকে উদ্গত হইবে। কোমলাবস্থায় সেই চারাগুলি একত্রপূর্ব্বক বিচালীদ্বারা জড়াইয়া দিলে সমুদায়ের কাণ্ড যোড়া লাগিয়া একটী গাছের মত হইবে। কাঁটালের ভোতা চারার গোড়ায় পচিয়া সারের কার্য্য করে। এই প্রকারের উৎপন্ন গাছ খুব সতেজ হয়, এরূপ গাছে বড ফল ধরিবারই সম্ভব।

চারার গোড়া সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিবে। গাছ বড় হইলে, আম্র বৃক্ষের ন্যায় প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে গোড়া খুড়িয়া বর্ষার জল খাওয়াইবে এবং কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে মাটি খুঁড়িয়া দিবে। ঘন ঘন শাখাপল্লব দ্বারা বৃক্ষ অত্যন্ত ঝাকড়া হইয়া উঠিলে সে বৃক্ষে ফল কম ধরে, সেরূপ অবস্থা হইলে তাহার সরু সরু কতকগুলি শাখা প্রশাখা কাটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। কাঁটালের সরুডালে যে সকল ফল ধরে, তাহা প্রায় ঝরিয়া পড়ে। মোটা ডালে বা কাণ্ডে যে সমুদয় ফল জন্মে, তাহারই অধিকাংশ স্থায়ী হয়।

বিনষ্ট পত্রকলিকা প্রভৃতির নিমিত্ত বৃক্ষের গাত্রে স্থানে স্থানে চিবি বা ব্রণের মত উচ্চ চিহ্ন হয়। ফল ফুরাইয়া গেলে অর্থাৎ শ্রাবণ বা ভাদ্রমাসে সেইগুলি অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া দিলে পরবৎসর অধিক ফল ধরে। বৃক্ষে কোন লতা আশ্রয় করিলে কিম্বা পরগাছা জন্মিলে, উপড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য নতুবা বৃক্ষের তেজ হানি করিয়া ফলোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মায়। মূলের উপর হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত কাণ্ডে, শাখায়, প্রশাখায় সকল অংশেই এই বৃক্ষে যেমন ফল ধরে, অন্য কোন বৃক্ষে এমন চমৎকার নিয়মে ফল ধরিতে দেখা যায় না। কাঁটালের তক্তা সুন্দর, দীর্ঘকাল স্থায়ী ও মূল্যবান। বৃক্ষের কাণ্ডের

কোন স্থানে ক্ষত হইয়া বৃষ্টির জল বসিতে দেখিলে সেই ক্ষতস্থান পরিষ্কারপূর্ব্বক আলকাতরার প্রলেপ দিয়া গোময়ের দ্বারা গর্ত্ত বুজাইবে, নতুবা গাছ শীঘ্র বিনষ্ট হইবে এবং তাহাতে ভাল তক্তা হইবে না।

নিচু।

নিচু এই নামটী দ্বারাই অনুমিত হয় যে, ইহা এ দেশের ফল নহে। বস্তুতঃ ইহা সত্য। চীনদেশ হইতে ইহা এ দেশে আনীত হইয়াছে এবং এখন ভারতবর্ষের অনেক স্থানে জন্মিতেছে। যে নিচুর ফল বড় আটি ছোট ও আস্বাদ মধুর তাহাই উৎকৃষ্ট। ওয়াফো, মেকলিন, বোম্বাই, গোলা প্রভৃতি কয়েকজাতি নিচু উল্লিখিত গুণের জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

নিচুর বীজের চারা অপেক্ষা কলমের চারারোপণ করাই ভাল, কারণ বীজের চারায় বহু বৎসর পরে ফল ধরে এবং ফল নিকৃষ্ট হয়। যে দো-আঁশ মাটিতে বালির ভাগ অপেক্ষা এটেল মাটির ভাগ বেশী সেই স্থানেই ইহা ভাল জন্মে। চারারোপণের পূর্ব্বে মৃত্তিকা খুঁড়িয়া এবং খৈলের সার মিশাইয়া মৃত্তিকা পাইট করিয়া লইবে। চারার অবস্থায় ইহা প্রখর রৌদ্র সহ্য করিতে অক্ষম, এজন্য উদ্যানের যে অংশে অন্যান্য বৃক্ষের ছায়া পড়ে অর্থাৎ সর্ব্বদা রৌদ্র না থাকে, সেই অংশেই ইহার স্থান নিরূপিত হওয়া উচিত। গোড়ার মৃত্তিকায় রসাভাব বোধ হইলে, জলসেচন আবশ্যক। গাছ বড় হইলে প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মজঃফরপুরের নিচু অত্যন্ত বিখ্যাত। কলিকাতা, চব্বিশপরগণা, হুগলি প্রভৃতি বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এখন উৎকৃষ্ট জাতীয় নিচুর গাছ বিস্তর দেখা যায়।

পেয়ারা।

বঙ্গদেশে এই ফল যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে, কিন্তু বঙ্গদেশ অপেক্ষা বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পেয়ারা উৎকৃষ্ট। পাটনা ও কাশী হইতে বিস্তর পেয়ারা কলিকাতায় আমদানী হয়। দো-আঁশ মৃত্তিকা এই বৃক্ষের উপযোগী। বীজোৎপন্ন চারা ও কলমের চারা উভয়ই রোপিত হইয়া থাকে। সুপক্ব পেয়ারার বীজ টাটকা অবস্থায় কোন ঝুরা মৃত্তিকাপূর্ণ পাত্রে পাঁতোদিয়া আবশ্যক মত জল দিলে, কিয়দ্দিবসের মধ্যে চারা জন্মে। কলমে চারা জন্মাইতে হইলে গুল কলম করিবে। পচাপাতার সার, খৈল ও বোদমাট্টী এই সকল সারে চারার অত্যন্ত তেজ হয়। চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। কলমের চারা হইলে আরও শীঘ্র ফল ধরে। এক সময়ের সমুদায় চারা প্রায় এক সময়েই বিনষ্ট হয়; কারণ এই গাছ অধিক সারাল হইলেই মরিতে আরম্ভ করে। এজন্য কতক গাছ বড় হইয়া উঠিলে পুনরায় কতক নূতন চারা রোপণ করিবে।

বৃক্ষের পুরাতন শুষ্কপ্রায় নিস্তেজ শাখাগুলি কাটিয়া ফেলিলে, অনেক নূতন তেজাল ফেকড়ী জন্মে, তাহাতে অনেক ফল ধরে। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া সার দিতে পারিলে ফলের আকার অপেক্ষাকৃত বড় হয়। ছেড়া কাপড় বা চট দিয়া বান্ধিয়া রাখিলে, ফলগুলি অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ ও বৃহদাকার হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে আস্বাদের কিছু ব্যতিক্রম ঘটে। একবারে পাকা পেয়ারা অপেক্ষা ডাসা পেয়ারার আস্বাদ ভাল। কচি পেয়ারায় মুখের জড়তা নষ্ট হয়।

গোলাপজাম।

গোলাপ জাম উত্তম ফল। ইহার আস্বাদ মধুর এবং গন্ধ ভাল; এজন্য ইহার বৃক্ষ যত্নপূর্ব্বক উদ্যানে রোপিত হইয়া থাকে। বীজের

চারা বা কলমের চারা উভয়ই রোপণ করা যাইতে পারে, কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র ফল লাভের আশায় কলমের চারাই লোকে অধিক পছন্দ করে। গুল কলমে চারা প্রস্তুত হয়। সমান জমিতে চারা রোপণ করিবে। পার্শ্বস্থ জমি অপেক্ষা উচ্চ স্থানে চারা রোপণ করিলে রসাভাব ঘটিয়া এবং নিম্ন স্থানে রোপণ করিলে জল বসিয়া গাছের অনিষ্ট হয়। যদি গাছে ফুল ধরিবার পূর্ব্বে গোড়া খুঁড়িয়া পচা মাছের সার বা পাতার সার দেওয়া যায়, তাহা হইলে ফল অপেক্ষাকৃত বড় ও উৎকৃষ্ট হয়। কাপড় দিয়া ফল বাঁধিয়া রাখিলে ফলে প্রায় পোকা ধরে না ও ফল বড় হয়।

জামরুল।

জামরুলের রোপণ প্রণালী অবিকল গোলাপজামের মত। ইহার সুপক্ক ফলগুলি মিষ্ট ও রসাল এবং পিপাসা নিবারক। সুপক্ক ফলের বীজে চারা জন্মে, কিন্তু গুল কলমের চারাই অধিক রোপিত হইয়া থাকে। সাদা রঙ্গের এবং সাদা ও লাল মিশ্রিত রঙ্গের দুই প্রকার জামরুল দেখিতে পাওয়া যায়, গুণে উভয়ই সমান।

কাল জাম।

গোলাপ জামের সহিত কাল জামের কোন বিষয়ে ঐক্য নাই। আম কাঁটালের ন্যায় ইহার বড় গাছ হয় এবং গাছে প্রচুর ফল ধরে। অতি সামান্য যত্নে এই গাছ এ দেশে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহার তলায় পাকা ফল পড়িয়া তাহাদের আটিতে বর্ষাকালে বিস্তর চারা জন্মে। গুল কলমেও ইহার চারা প্রস্তুত হইতে পারে কিন্তু প্রায় কলম করিতে দেখা যায় না, বীজের চারাই রোপিত হইয়া থাকে। ইহার গাছ বড় হইলে ভাল তক্তা হয়। ইহার পত্র ও ত্বক কবিরাজেরা অনেক ঔষধে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কামরাঙ্গা।

কামরাঙ্গার বৃক্ষ ও ফল দেখিতে সুন্দর। চীনের কামরাঙ্গা বলিয়া যে জাতি প্রসিদ্ধ তাহাই অপেক্ষাকৃত ভাল, অন্য জাতি গুলিতে অম্লরস বেশী। সুপক্ক ফলের বীজে গাছ জন্মে। শাখায় গুল-কলম করিয়াও চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সার বিশিষ্ট দো-আঁশ মাটিতে চারা রোপণ করিবে। বর্ষাকাল চারা রোপণের উপযুক্ত সময় চারার মূলে জল বসিতে দিবে না। শীতের প্রারম্ভে মূলের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দিবে এবং সর্ব্বদা গোড়া পরিষ্কৃত রাখিবে।

কথ্‌বেল।

ইহার সংস্কৃত নাম কপিত্থ এবং ইংরেজি নাম এলিফেণ্ট য়্যাপল। গাছ প্রকাণ্ড হয় এবং বিস্তর ফল ধরে। উপরের আবরণ ভিন্ন বেলের সহিত ইহার অন্য সৌসাদৃশ্য নাই। ইহার ফলের দ্বারা প্রস্তুত অম্বল মুখ রোচক কিন্তু যে সকল গুণের নিমিত্ত বেল শ্রেষ্ঠ ফলের মধ্যে গণ্য, কথ্‌বেলে তাহার কিছুই দেখা যায় না। বীজের চারায় গাছ হয়। সামান্য যত্নে ও সামান্য মৃত্তিকাতেই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

আঁশ ফল।

ইহার গাছ নিচু গাছের মত বড় হয়। গাছে ছোট ছোট গোল গোল অনেক ফল ধরে। ফলের উপরের খোসা ও শাঁস পাতলা, নিচুর খোসা ও শাঁসের সহিত ইহার আকৃতিতে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু গুণে কোন অংশেই তাহার তুল্য নহে। বস্তুতঃ ফলের বিশেষ কোন উপাদেয়ত্ব নাই। তবে উদ্যানে নানাবিধ বৃক্ষের সঙ্গে ইহাকেও রোপণ করা যাইতে পারে। বীজের চারা রোপিত হইয়া থাকে। গুল কলম করিলেও চারা জন্মাইতে পারা যায়, কিন্তু ফল

তত ভাল নয় বলিয়া কেহ তাহা করে না। বালি মিশ্রিত এটেল মাটি এই গাছের পক্ষে উপযোগী। গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দেওয়া ও পরিষ্কার রাখা ভিন্ন বেশী যত্নের আবশ্যক করে না।

করঞ্চা।

করঞ্চার গাছ, তত বড় হয় না। গাছে অত্যন্ত কাঁটা এজন্য বেড়ার পক্ষে এই গাছ ভাল। এই গাছের বেড়া দিলে যেমন গবাদি পশুর প্রবেশ বারণ হয়, তেমনি ফলও পাওয়া যায়। ফলগুলি টক, এজন্য অম্বলের জন্যই প্রায় ব্যবহৃত হয়। ফলগুলি পাকিয়া রক্ত বর্ণে গাছ সুশোভিত করে। কিছু রসাল মৃত্তিকায় এই গাছ ভাল জন্মে।

আমড়া।

দেশী ও বিলাতি এই দুই প্রকার আমড়ার মধ্যে বিলাতী আমড়াই ভাল। পাকা বিলাতী আমড়ার আস্বাদ অম্ল মধুর, কিন্তু দেশী আমড়া তীব্র অম্ল-রস বিশিষ্ট এবং উহার আঁটি বড় ও শাঁস অতি অল্প। কচি অবস্থায় তাদৃশ টকের সঞ্চার থাকে না এজন্য দেশী আমড়ার কচি ফলে উত্তম অম্বল প্রস্তুত হয়। বিলাতী আমড়া ভাল বলিয়া লোকে তাহাই অধিক যত্নপূর্ব্বক রোপণ করে। কয়েক জাতীয় পোকা ও পতঙ্গ বৃক্ষের প্রধান শত্রু; তাহারা কচিপাতা সমেত শাখা ও কাণ্ডের অগ্রভাগ ভক্ষণ করে, তাহাতে গাছ মরিয়া যায়। সরস জমিতে ও অন্য গাছের নিকটে চারা রোপণ করিলেই ঐ উপদ্রব অধিক ঘটে। পোড়ামাটি, বালি ও উদ্ভিজ্জসার সামান্য মৃত্তিকার সহিত সমভাগে মিশাইয়া তথায় এই চারা রোপণ করিবে। বীজের চারাই রোপিত হইয়া থাকে।

চাল্‌তা।

চাল্‌তার যে অংশ আহার করা যায় তাহা ফল নহে, পৌষ্পিক আবরণ, উহা পরিণত হইলে কষায়, অম্ল ও মধুর এই ত্রিরস মিশ্রিত একরূপ আস্বাদ জন্মে। সচরাচর অম্বলের নিমিত্তই ইহা বেশী ব্যবহার হয়, কিন্তু অম্ল অপেক্ষা চাল্‌তার আচার অতি উপাদেয় পদার্থ। আচার প্রস্তুত করিতে হইলে পক্কাবস্থায় চাল্‌তার উক্ত আবরণ গুলিকে অল্প ছেচিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। উত্তম শুকাইলে ঢেঁকিতে কুটিয়া চূর্ণ করতঃ চূর্ণ গুলি কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হয়। অনন্তর চূর্ণের চতুর্থাংশ পরিমাণ ঘন তেঁতুল গোলার সহিত চূর্ণ গুলি মিশাইয়া তাহাতে এরূপ গুড় দিতে হয় যে, এই তিন পদার্থ একত্র চট্‌কাইলে কাদার মত হইবে অথচ অম্বলত্ব অধিক থাকিবে না। এইরূপ করা হইলে তখন উহা কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিয়া শুষ্ক করিতে হয়, ইহাকেই চাল্‌তার আচার বলে। মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিয়া রাখিলে এই আচার অনেক দিন থাকে। ইহা অতি মুখ রোচক, এই আচার দুধের সঙ্গে খাওয়া যায়। অতএব কেবল অম্বলে ব্যবহার না করিয়া ইহাদ্বারা আচার প্রস্তুত হইলে ইহা আদরের সামগ্রী।

বর্ষার জল গড়াইয়া যে স্থানে পলিমাটি সঞ্চিত হয়, সেই স্থানে এই গাছ উত্তম জন্মে। মৃত্তিকা কিছু সরস থাকা ভাল। বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হয়, চারার গোড়া সর্ব্বদা পরিস্কৃত রাখিয়া শীতের প্রারম্ভে গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দিলেই গাছ নিরাপদে বৃদ্ধি পায়।

আর একপ্রকার চাল্‌তা আছে তাহা লতার ন্যায় গাছে ধরে বলিয়া তাহাকে লতাচাল্‌তা কহে। বৃক্ষজাত চাল্‌তা অপেক্ষা লতা চাল্‌তার আকার কিছু ছোট কিন্তু গুণ প্রায় তুল্য। কলিকাতায় লতা চাল্‌তার চারা কিনিতে পাওয়া যায়। রোপণ প্রণালী ও পাইট চাল্‌তা বৃক্ষের ন্যায়, তবে এই গাছ লতার মত হয় বলিয়া

আশ্রয় জন্য মাচা প্রস্তুত করিয়া দিলে ভাল হয়। মাটিকলম ও গুল কলমে লতা চাল্‌তার চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

জলপাই।

ইহার গাছ বৃহদাকার হয়; গাছে ফলও বিস্তর ধরে। ফলের আস্বাদ অম্ল বলিয়া টকের জন্যই ব্যবহৃত হয়। অনেকে আমচুর প্রস্তুতের মত জলপাই কাটিয়া শুষ্ক করিয়া রাখে, তাহাকে জলপাই-শুঁট বলে, তাহা অসময়ে ব্যবহার করে। বীজের চারাই সচরাচর রোপিত হইয়া থাকে। কিন্তু বীজের চারা অপেক্ষা কলমের চারা পুতিলে শীঘ্র শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। বর্ষাকালে ইহার শাখায় গুল-কলম বান্ধিলে অল্প দিনের মধ্যে চারা প্রস্তুত হয়। দো-আঁশ মাটিতেই গাছ ভাল জন্মে। গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া ও সার দিয়া এই সকল বৃক্ষ প্রতিপালন করিতে কেহই যত্ন করে না, করিলে যে ভাল হয় তাহা বলা বাহুল্য।

ডেফল।

ডেয়ো ও মাদার ডেফলের আর দুই নাম। ডেয়ো নামটিই অনেক স্থানে প্রচলিত। ডেফল বলিলে বাঙ্গালার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে আর একপ্রকার ফল বুঝায়। তাহার গাছ ডেয়ো গাছের মতই বড় হয়, পাতাগুলি রবরের পাতার ন্যায় লম্বা এবং ফল ছোট ছোট পেপিয়ার অনুরূপ, পাকিলে হরিদ্রা বর্ণ হয়, এবং আস্বাদ তীব্র অম্লরস বিশিষ্ট। যাহাহউক ডেয়ো ও শেষোক্ত ডেফল দুয়েরই রোপণ প্রণালী সামান্য, দুয়েরই বীজ-জাত চারা রোপিত হইয়া থাকে; বিনা যত্নে সামান্য মৃত্তিকায় উভয়ই বর্দ্ধিত হয়। ডেফল অপেক্ষা ডেয়ো গুণে কিঞ্চিৎ ভাল, কিন্তু ফলের উপাদেয়ত্ব কাহারও নাই।

কেফল।

এই গাছ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চলে অনেক জন্মে। ইহার গাছগুলি ১৫। ১৬ হাত উচ্চ হয়। কোন কোন স্থানে ইহাকে কাউফল কহে। ঘন ঘন শাখা জন্মিয়া বৃক্ষকে ঝাকড়া করিয়া ফেলে। ইহার ফলগুলি কমলা লেবুর ছোট ছোট ফলের মত, পাকিলে হরিদ্রা বর্ণ হয়। উপরের আবরণ ছাড়াইলে মধ্যে কমলা লেবুর কোয়ার ন্যায় বীজগুলি সজ্জিত দেখা যায়। বীজগুলি নিরেট, তাহাদের গাত্রে যে শাঁস থাকে, লোকে তাহাই চুষিয়া খায়; খাইতে টক লাগে কিন্তু তীব্র অম্ল রস নহে।

বীজ পড়িয়া তলায় বিস্তর চারা জন্মে এবং তাহারা বিনা যত্নেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এদেশে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ফল-বৃক্ষের অভাব নাই; সেই জন্যই লোকে এইরূপ বৃক্ষের তাদৃশ আদর করে না। ফল ব্যবহৃত হয় বলিয়াই আমরা উদ্যানে রোপণযোগ্য ফল বৃক্ষাবলীর সঙ্গে ইহাদের নাম উল্লেখ করিলাম।

আমলকী।

এ দেশের মৃত্তিকায় আমলকীর গাছ অতি অল্প যত্নেই জন্মিয়া থাকে। গাছের আকার বৃহৎ ও দেখিতে সুন্দর হয়। কাশী প্রভৃতি স্থানের ফল অপেক্ষাকৃত বড় হয়। কলিকাতায় ঐ সকল ফল আমদানী হইয়া থাকে। এক একটা প্রকাণ্ড গাছে অনেক ফল ধরে। আমলকী অনেক ঔষধে লাগে। আমলকীর মোরব্বা উৎকৃষ্ট পদার্থ। পাকা আমলকী চিবাইয়া জল খাইলে চমৎকার মধুরত্বের অনুভব হয়।

যে স্থানে এটেল মৃত্তিকার ভাগ বেশী সেই স্থানে এই গাছ ভাল জন্মে। বীজরোপণেই চারা উৎপন্ন হয়। এ দেশে এই সকল

বৃক্ষের জন্য কোন যত্নের আবশ্যক হয় না। চারার অবস্থায় গোড়া পরিষ্কার রাখিলে এবং গাছ বড় হইয়া উঠিলে বৎসরান্তে একবার গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দিলে গাছে ফল অধিক ও ফলের আকার অপেক্ষাকৃত বড় হইতে পারে।

হরিতকী।

হরিতকী অনেক কাজে লাগে। দেবার্চ্চনার সময় হিন্দুরা ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার গাছ ও ফলের ছালে রং ও কালী প্রস্তুত হয়। হরিতকী নানা ঔষধে লাগে, ইহা রেচক ও পাচক। বৈদ্যশাস্ত্রে হরিতকীর অশেষ গুণ ব্যাখ্যাত আছে।

বর্ষার জল গড়াইয়া যে স্থানে পলিমাটির সঞ্চার হয়, সেই স্থানে এই গাছ ভালরূপ জন্মিতে দেখা যায়। এ দেশে একটি প্রবাদ আছে, পাকা হরিতকী খাইলে যাবজ্জীবন ক্ষুধা হয় না। ফলগুলি সম্পূর্ণ পুষ্ট হইবার পূর্ব্বেই ঝরিয়া তলায় পড়ে। সুতরাং সুপক্ক ফল পাওয়া দুর্ল্লভ বলিয়াই বোধ হয় লোকে ঐ কথা বলে। ইহার বৃক্ষ প্রকাণ্ড ও প্রচুর ফলশালী হয়। রাশি রাশি ফল তলায় পড়িয়াও অপুষ্টতা নিবন্ধন তাহাদের বীজে চারা জন্মে না। যদি দৈবাৎ দুই একটী পুষ্ট ফল থাকে, তবেই চারা জন্মে। পূর্ব্বোক্ত-কার্য্য সকলের জন্য ফলগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখা হয়। হরি-তকীর যেরূপ প্রয়োজনীয়তা তাহাতে ইহার বৃক্ষের প্রতি একটু যত্ন করা আবশ্যক।

নোর।

নোরেরগাছ দেখিতে সুন্দর। কোন কোন স্থানে ইহাকে রোয়াল বলে। গাছের আকার বড় হয় এবং অপর্য্যাপ্ত ফল ধরে;

ফলের আস্বাদ টক। বীজ জাত চারাই রোপিত হইয়া থাকে। সামান্য যত্নেই গাছ বৃদ্ধি পায়। বালি মিশ্রিত এটেল মৃত্তিকা এই বৃক্ষের উপযোগী। গোড়া পরিষ্কার রাখা ও খুঁড়িয়া, দেওয়া ভিন্ন ইহার আর কোন পাইট নাই।

উদ্যানে রোপণযোগ্য অনেক প্রকার ফল বৃক্ষের বিষয় লিখিত হইল; উহাদের মধ্যে কতকগুলি বৃক্ষের প্রতি এদেশীয় লোকের যত্ন কম, তাহার কারণ এই,—আম, কাঁটাল, নিচু, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ফল বৃক্ষের প্রতিই লোকের মন অধিক আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য ঐ সকল বৃক্ষই উদ্যানে প্রথম স্থান পায়। উদ্যানের আয়-তন বৃহৎ হইলে তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য বৃক্ষ রোপিত হয়, নতুবা ক্ষুদ্র আয়তনের উদ্যানে প্রায়ই তাহারা স্থান পায় না। গুণের ইতর বিশেষই আদর ও যত্নের হ্রাস বৃদ্ধির কারণ। গাব, ডুমুর, শজিনা, প্রভৃতি কতকগুলি বৃক্ষের ফল লোকের ব্যবহারে আইসে, অথচ কেহই ঐ সকল গাছ রোপণে যত্ন করে না। বাড়ীর আশ পাশে ঐ সকল গাছ আপনা হইতে জন্মিয়া ও বৃদ্ধি পাইয়া যখন ফল ধরিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহাদের প্রতি লোকের লক্ষ্য পড়ে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে শজিনার আদর বেশী; এজন্য এই সকল স্থানের লোকে শজিনার ডাল কাটিয়া নরম মাটিতে পুতিয়া ইহার গাছ জন্মাইতে কিঞ্চিৎ যত্ন করে। বিলাতী গাব, অলিগেটর পেয়ারা প্রভৃতি বৈদেশিক বৃক্ষ সকল যাঁহারা যত্নপূর্ব্বক উদ্যানে রোপণ করেন, দেশীয় এই সকল বৃক্ষকে উপেক্ষা করা তাহাদের কর্ত্তব্য নহে; কারণ ইহারা নিকৃষ্ট হইলেও বৈদেশিক ঐ সকল ফল-বৃক্ষ অপেক্ষা গুণে ও প্রয়োজনীয়তায় শ্রেষ্ঠ।

তেঁতুল।

তেঁতুল অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষ। ইহার শাখা ও শিকড় বহুদূর বিস্তৃত হয়, সুতরাং এই বৃক্ষের গোড়ার চতুস্পার্শ্বে অনেক দূর পর্য্যন্ত

অন্য কোন বৃক্ষ বা শাক সবজি জন্মিতে পারে না। এজন্য উদ্যানের এক প্রান্তে ইহার স্থান হওয়া উচিত। উদ্যানের বা বাটীর উত্তর-দিকে এই গাছ রোপণ করিবে। দক্ষিণদিকে থাকিলে গ্রীষ্মকালে বায়ু সঞ্চালনের ব্যাঘাত ঘটিবে।

এ দেশে যে সে স্থানে অতি সামান্য মৃত্তিকায় বিনা যত্নে ইহার গাছ বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। বীজ ভূমিতে পুতিলে অতি সহজেই চারা জন্মে। ছয় সাত বৎসরের কমে বৃক্ষে ফল ধরে না। এক একটা গাছের প্রচুর ফল হয়। অম্বলের নিমিত্ত পাকা তেঁতুল বিস্তর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টার্টরিক এসিড্ নামক ডাক্তারী ঔষধ তেঁতুল হইতে প্রস্তুত হয়। জ্বর হইলে তেঁতুল খাইতে কবিরাজেরা নিষেধ করেন কিন্তু কোন কোন ডাক্তারের মতে তেঁতুল জ্বরঘ্ন। ইহার কাষ্ঠ অত্যন্ত শক্ত, কিন্তু তাহা জালানিকাষ্ঠ ভিন্ন তদ্দ্বারা বাক্সাদি কোন কাঠের গড়ন প্রস্তুত হয় না।

ফল্‌সা।

ফল্‌সার গাছ প্রকাণ্ড কিন্তু ফলগুলি বড় ছোট। ফল ছোট হইলেও পক্ক ফলের আস্বাদ অতি উত্তম,—অম্ল মধুর। বীজের চারাই রোপিত হইয়া থাকে। ইচ্ছা হইলে গুল কলম করিয়াও চারা জন্মান যায়। সামান্য যত্ন ও সামান্য মৃত্তিকাতেই গাছ বৃদ্ধি পায়। চারার অবস্থাতেই একটু যত্নের আবশ্যক; তখন প্রয়োজন মত জল না পাইলে বা গোড়া পরিষ্কার না থাকিলে, চারা বাঁচে না। গাছ বড় হইলে বৎসরান্তে শীতকালে একবার গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

নারিকেল।

যাবতীয় ফলবৃক্ষের মধ্যে নারিকেল বৃক্ষ মনুষ্যের অধিক উপকারী। এই বৃক্ষের প্রত্যেক অংশ প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ কাণ্ড, পত্র ও পত্রের শলা, এবং ফলের প্রত্যেক অংশ অর্থাৎ ছোব্ড়া, মালা, শাঁস, জল সমুদায়ই আবশ্যকীয়, এমন উপকারী বৃক্ষ ছেদনার্থ মূলে অস্ত্রঘাত করিতে হিন্দু শাস্ত্রে নিষেধ আছে। ভারতবাসী আর্য্যসন্তানগণের অন্য দোষ যাহাই থাকুক, কিন্তু তাহারা কস্মিন কালেও কৃতঘ্ন নহে। উপকারী হইলে চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকলের নিকটেই তাহারা মস্তক অবনত করে। উপকারীর বিরুদ্ধ কার্য্যে তাহাদের হস্ত মুখ বন্ধ থাকে। এই জন্যই হিন্দুদিগের মধ্যে সূর্য্যাদি জড়পদার্থের, গবাদি পশুর ও অশ্বত্থাদি বৃক্ষের পূজা প্রচলিত এবং এই জন্যই তাহারা মহোপকারী নারিকেল বৃক্ষ ছেদনে মহাপাপ মনে করে।

নারিকেল গাছের বাল্যাবস্থায় অপেক্ষাকৃত শীতল জমির আবশ্যক। এইজন্য চারিধারে কলার গাছ রোপণ পূর্ব্বক মধ্যে নারিকেলের চারা রোপণ করিয়া থাকে। ইহার জমি সর্ব্বদা সরস থাকা উচিত, তন্নিমিত্ত কিছু নাবাল জমিতেই গাছ ভাল হয়। নারিকেলের কোমল মূল সকল কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিতে অসমর্থ, একারণ বেহার প্রভৃতি দেশে নারিকেল গাছ জন্মে না। লবণাক্ত মৃত্তিকা নারিকেল গাছের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, এজন্যও উক্ত অঞ্চলে এই গাছ ভাল জন্মে না। পলিপড়া মাটি অথবা যে দোআঁশ মাটিতে বালির অংশ বেশী তাহা নারিকেল গাছের পক্ষে উত্তম। ঝুনা নারিকেল কিছুদিন ঘরে রাখিলে তাহার বোঁটার দিক ভেদ করিয়া অঙ্কুর উদ্গত হইয়া থাকে। তখন উহা হাপোরে পুতিয়া রাখিলে উত্তম চারা জন্মে। অধিক চারা জন্মাইতে হইলে, উত্তম ঝুনা নারিকেল, বোঁটার দিক উপরে রাখিয়া হাপোরে বসাইবে। সেই স্থানেই অঙ্কুর উদ্গত হইয়া চারা জন্মিবে। চারা

বাহির হইতে অনেক বিলম্ব হইয়া থাকে। বৃক্ষ হইতে ঝুনা নারিকেল পাড়িয়া রোপণ করা অপেক্ষা যাহারা সুপক্ব হইয়া আপনা হইতে তলায় পড়ে, সেই সকল নারিকেল রোপণ করাই ভাল। চারা জন্মিলে, পর বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত হাপোরে রাখিয়া আষাঢ় মাসে পূর্ব্বোক্ত প্রকার মৃত্তিকাবিশিষ্ট কলাগাছ বেষ্টিত স্থানের মধ্যে অথবা তাদৃশ শীতল স্থানে পরস্পর আট নয় হাত অন্তরে শ্রেণীবদ্ধ রূপে চারাগুলি রোপণ করিবে। নারিকেল গাছের পক্ষে উদ্ভিজ্জ সার উত্তম। এবং ইহার জমিতে কিছু লবণের সার দেওয়া ভাল। কিন্তু সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানে বা লোণা দেশের মৃত্তিকায় লবণ সার দেওয়ার আবশ্যক হয় না। গবাদি পশুতে চারা না খাইতে পারে, এজন্য প্রত্যেক চারায় বাঁশের ঘেরা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আম্রাদি দ্বিবীজপত্রিক উদ্ভিজ্জের চারা গরুতে খাইলেও তাহাদের কাণ্ডে পুনরায় শাখা জন্মিয়া, বাঁচিতে পারে, কিন্তু নারিকেলাদি একবীজপত্রিক উদ্ভিজ্জের মাইজপত্র একবার বিনষ্ট হইলে বৃক্ষ বাঁচে না।

চারা বড় হইয়া উঠিলে আর শীতলতার প্রয়োজন হয় না। তখন কলার গাছ কাটিয়া রৌদ্র প্রাপ্তির সুবিধা করিয়া দিবে। পাঁচ ছয় বৎসর পরেই, গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। যদি কোন কারণে অধিক বয়সেও গাছ অফলা হয়, তবে তাহার গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া উপরের শিকড়গুলি বাহির করতঃ দুই এক দিন বাতাস খাওয়াইবে, অনন্তর পুষ্করিণীজাত শৈবালদ্বারা শিকড়গুলি ঢাকিয়া দিবে। সেই শৈবাল পচিয়া মাটির মত হইলে পুনরায় নূতন শৈবাল দিবে। ক্রমান্বয়ে তিন চারি মাস এইরূপ করিলে, বৃক্ষের অফলা দোষ দূর হইবে। নারিকেলের মোচ ঊর্দ্ধদিকে সরল ভাবে উঠিলে তাহা হইতে প্রথমাবস্থায় অনেক ফল ঝরিয়া পড়ে, এজন্য অনেক স্থানে ঐ প্রকার মোচের অগ্রভাগে লোষ্ট্রাদি কোন ভারী জিনিস ঝুলাইয়া তাহাকে নত করিয়া দেওয়া হয়। বস্তুতঃ এরূপ করায় উপকার দর্শে। প্রতি বৎসর নারিকেলের শুষ্ক বাইল ও

শুষ্ক মোচ ফেলিয়া গাছ পরিষ্কার করিয়া দিলে ফলন বেশী হয়। কেহ কেহ বলেন, নারিকেলের ডাব যত কাটা যায়, ফলন তত অধিক হইয়া থাকে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানের ডাবের আদর বেশী বলিয়া অধিক ডাব কাটা হয়। অন্য স্থানে তত ডাব পাড়া হয় না, অথচ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান অপেক্ষা মফঃস্বলের গাছে আমরা বেশী ফলন দেখিতে পাই; এজন্য ডাব কাটায় ফলন বাড়ে কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

নারিকেলের চারা যে যে স্থানে রোপণ করিবে, সেই সেই স্থানে চৈত্র মাসে গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখিলে ভাল হয়, কারণ বৃষ্টির জলে চারিদিকের মৃত্তিকা ধৌত হইয়া ঐ সকল গর্ত্তের মধ্যে জমা হইলে, গর্ত্তগুলি সসার পলিমৃত্তিকা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে চারা রোপণ করিলে, সেই চারা অত্যন্ত সতেজ হয়। আট হাত অন্তর চারা রোপণ করিলে এক বিঘা জমিতে একশত চারা জন্মিতে পারে। রীতিমত ফলিলে বৎসরে এক একটা গাছে শতাধিক ফল জন্মে। প্রতি গাছের গড় উৎপন্ন ৭৫টী নারিকেল ধরিলে এবং নারিকেলের শ গড়ে দুই টাকার হিসাবে বিক্রয় হইলে, এক বিঘা জমির উৎপন্ন বৃক্ষ হইতে, বৎসর ফলের দ্বারাই দেড় শত টাকা আয় হইতে পারে। গাছ বড় হইয়া উঠিলে তাহাদের প্রতি কোন যত্নের আবশ্যক করে না। সুতরাং তখন ঐ লাভ বিনা খরচে ও নিরাপদে ভোগ করা যায়।

সুপারি।

সুপারি কেবল পানের সহিত খাওয়া গিয়া থাকে, সুধু এই জন্যই উহা বিস্তর প্রয়োজন হয়। নারিকেলের ন্যায় সুপারির জমিও বারমাস সরস থাকা আবশ্যক। পলিপড়া দো-আঁশ মাটি ইহার পক্ষে উপযোগী। এজন্য বর্ষাকালে যে সকল স্থানে জল জমিয়া

পলি পড়ে, সেই সকল স্থানে সুপারির গাছ ভাল হয়। কিন্তু চারা রোপণের পর যেন, গোড়ায় বর্ষার জল না বাধে; কারণ তাহা হইলে গাছ মরিয়া যায়। আওতা জমিতে অর্থাৎ গাছের ছায়া বিশিষ্ট শীতল স্থানে ইহার চারা রোপণ করিবে। চারা উৎপাদনার্থ গাছ হইতে সুপক্ক সুপারি পাড়িয়া ছোবড়ার রস শুকাইতে না শুকাইতে কোন ছায়া বিশিষ্ট শীতল স্থানে কাদা করিয়া সেই কাদার মধ্যে পরস্পর দুই তিন অঙ্গুল অন্তর সাজাইয়া বসাইবে, বোঁটার দিক যেন উপরে থাকে। কাদা শুকাইবার উপক্রম হইলে জল দিয়া সেই স্থানের মৃত্তিকা সর্ব্বদা সরস রাখিবে। ইহার চারা বাহির হইতে অনেক বিলম্ব হয়, দুই মাসের কমে চারা বাহির হয় না।

সুপারির চারা প্রস্তুত করিবার আর এক প্রণালী এই,—দুই হাত দীর্ঘ, দুই হাত প্রস্থ এবং এক বা দেড় হাত গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে দুই তিন কলসী জল ঢালিয়া দিবে এবং নীচে একটু কাদা করিয়া সেই জলে গাছ পাকা সুপারিগুলি ছাড়িয়া দিবে। অনন্তর গর্ত্তের মুখে তক্তা বা বাঁশের বাখারী সাজাইয়া তদুপরি মাটি চাপা দিবে। ঐ চাপা দেওয়া মৃত্তিকা গর্ত্তের মধ্যে পড়িতে না পারে, তক্তা বা বাঁখারীদ্বারা এরূপে মুখ বন্ধ করা কর্ত্তব্য। অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে এইরূপ করিয়া জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে গর্ত্তের মুখ খুলিলে উহার গভীরতা অনুসারে বড় বড় চারা তন্মধ্যে দৃষ্ট হয়। তখন উপযুক্ত মৃত্তিকাবিশিষ্ট শীতল স্থানে দুই বা আড়াই হাত অন্তর চারাগুলি রোপণ পূর্ব্বক কিছু দিন প্রত্যহ গোড়ায় জল দিতে হয়। গবাদি পশুতে না খায়, এজন্য উপযুক্ত বেড়া থাকা উচিত। প্রথম বৎসরেই ঐ প্রকার ঘন ঘন চারা না পুতিয়া চারি পাঁচ হাত অন্তরে পুতিবে। পর বৎসর তাহাদের মধ্যে মধ্যে আর একটী করিয়া চারা বসাইবে। ইহাতে একটী অন্তর একটী গাছের মস্তক নীচে পড়িবে সুতরাং পরস্পরের পত্রে সংস্পর্শ হইবে না এবং অসমবয়স্কতা নিবন্ধন এক সময়ে সকল বৃক্ষ বিনষ্ট হইবেনা।

অনেকগুলি বৃক্ষবিশিষ্ট কয়েকটী সুপারি বাগানের উৎপন্ন হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রতিগাছে ন্যূনকল্পে গড়ে।৶০ ছয় আনা মূল্যের সুপারি জন্মে। পরস্পর আড়াই হাত অন্তর রাখিয়া চারা রোপণ করিলে, এক বিঘা জমিতে প্রতিবৎসর সহস্রাধিক গাছ জন্মিতে পারে। প্রতি গাছের উৎপন্ন গড়ে চারি আনা হিসাবে ধরিলে, এক বিঘা জমিতে বৎসরে ২৫০৲ টাকা লাভ হইতে পারে। চারি পাঁচ বৎসরের গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। তখন উহার প্রতি কোন যত্নের আবশ্যক হয় না। সুতরাং বিনা খরচায় এক এক বিঘা জমিতে চারি টাকা সুদের ৬২৫০৲ টাকার কোম্পানির কাগজের আয়ের তুল্য আয় বিশিষ্ট স্থায়ী সম্পত্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই,—এদেশের লোক যে কার্য্যে শীঘ্র ফল না পায়, সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চায় না। একারণ চারি পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করিয়া এরূপ লাভ ভোগ করিতে সাধ্যসত্ত্বেও অনেকের সহিষ্ণুতা থাকে না।

খর্জ্জুর।

খর্জ্জুরের চাষ অত্যন্ত লাভজনক ; ইহার রস হইতে যেমন অল্প খরচে চিনি প্রস্তুত হয় ; ইক্ষু রসে সেরূপ হয় না। খেজুরিয়া গুড় ও চিনি অপেক্ষা ইক্ষু গুড় ও চিনি কিছু উৎকৃষ্ট হওয়ার কারণ এই, খেজুরিয়া গুড়ে এক প্রকার আটা আছে, ভালরূপ পরিষ্কৃত না হইলে চিনিতে উহা থাকিয়া যায় এবং কিছু দিন গুদামে থাকিলে ঐ আটা মিষ্টতার সঙ্গে মিশিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠে ; ইক্ষু গুড়ে বা চিনিতে তদ্রূপ আটা না থাকায় উহা শীঘ্র নষ্ট হয় না। সংপ্রতি এদেশে অনেক সাহেবের কারখানায় ইউরোপীয় প্রণালীতে খেজুরিয়া চিনিকে অত্যন্ত পরিষ্কৃত করা হইতেছে, এই পরিষ্কৃত চিনি শীঘ্র নষ্ট হয় না।

বঙ্গদেশের মধ্যে যশোহর জেলায় খেজুরের চাস যত, এত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; ঐ জেলা হইতে প্রতিবৎসর বিস্তর গুড় চিনি কলিকাতায় আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। উক্ত দেশের কৃষক ও কারখানাওয়ালারা এই কারবারে বিলক্ষণ লাভ করে।

খেজুরের তলায় বীজ পড়িয়া আপনা হইতেই অনেক গাছ জন্মে, ঐ চারা গুলি বিশৃঙ্খল ভাবে জন্মে এবং যত্নের অভাবে ভাল রূপ বর্দ্ধিত হইতে পারে না। রীতিমত চাষের অভিপ্রায়ে চারা জন্মাইতে হইলে যে সকল সুপক্ক খেজুর তলায় পড়ে তাহার বীজ হাপোরে বসাইতে হয়; চারা জন্মিলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত হাপোরে রাখিবে, অনন্তর আট নয় হাত অন্তরে উপযুক্ত স্থানে স্থায়ীরূপে সারি সারি চারা গুলি রোপণ করিবে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে সমস্ত জমি এক বার কোদ্‌লাইয়া দিবে। আট হাত অন্তর চারা বসাইলে এক বিঘায় একশত গাছ হইতে পারিবে। ছয় সাত বৎসর, বয়স হইলেই গাছ কাটা আরম্ভ হয়; আশ্বিন মাসে গাছ কাটিলে কার্ত্তিকের শেষ বা অগ্রহায়ণের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত রস পাওয়া যাইতে পারে। তিন দিন গাছ কাটিয়া একদিন বিশ্রাম দিতে হয়; উহাকে জিরান কহে; জিরান না দিলে রস ভাল হয় না। প্রতি গাছে গড়ে /৫ পাঁচ সের রস হইলে জিরান বাদে ঐ সময়ের মধ্যে এক একটা গাছের উৎপন্ন রস হইতে পঁচিশ ছাব্বিশ সের গুড় হইতে পারে; উহার মূল্য ন্যূনকল্পে আঠার আনা। সুতরাং এক বিঘা জমির গাছে ১১২৷৷৹ টাকা উৎপন্ন হয়। গুড় প্রস্তুতের খরচ উর্দ্ধ সংখ্যা ৩৭৷৷৹ টাকা, এই খরচা বাদে প্রতি বিঘায় ৭৫৲ টাকা লাভ হয়।

তাল।

বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই তালগাছ দেখা যায়। পাকা তালের আটি পুতিলেই গাছ জন্মে। ইহার পাইট খেজুর বৃক্ষের ন্যায়। চৌদ্দ পনের বৎসরের ন্যূনে গাছে ফল ধরে না। ইহার পত্রে পাখা ছাতি প্রভৃতি প্রস্তুত হয় এবং এদেশের পাঠশালার বালকেরা তাহাতে লেখে। উড়িষ্যা দেশের পুস্তকাদি অদ্যাপি ইহাতে খোদিত হয়। আমাদের দেশেও পূর্ব্বে তাল পত্রে পুস্তক লেখা হইত। ইহার কচি ও পাকা ফল লোকে আহার করে। কচি ফলের কোমল শাঁস লঘু পাক ও স্নিগ্ধকর, পক্ক ফল গুরুপাক। পাকা তালের গোলা দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া জ্বাল দিলে উত্তম তালক্ষীর প্রস্তুত হয়। ইহার কাণ্ড অত্যন্ত সারাল হয়; তদ্দ্বারা লোকে ঘরের পাইড় ও চৌকাট করে, কখন কখন উহাতে পাকাঘরের কড়িও প্রস্তুত হইয়া থাকে। তালের রসে গুড়, চিনি ও মিছরী হয়, কিন্তু তাহার পরিমাণ কম, ঐ রসদ্বারা বেশীরভাগ তাড়ি প্রস্তুত করে।

পেপের চাষ ও সম্ভাবিত লাভ।

পেপে এ দেশের ফল নহে। পাপিয়া নামক দ্বীপ হইতে উহা এদেশে আনীত হইয়াছে। প্রথম প্রথম এই ফলের তত আদর ছিল না, এখন নিজগুণে ক্রমশঃ সর্ব্বত্রই আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ পেপে অতি উত্তম ফল। ইহার চাষ প্রণালী অতি সহজ, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোথাও ইহার রীতিমত চাষ হইতে দেখি নাই। বাটীর আশ পাশে বিনা যত্নে যে দুই চারিটী গাছ জন্মে, লোকে তাহারই ফল ভোগ করে এবং তাহাই বাজারে বিক্রয় হয়। যত্নপূর্ব্বক চাষ করিলে যথেষ্ট ফল উৎপন্ন হইতে পারে। অনেক জেলায় বিশেষ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহার চাষ করিলে, প্রথম প্রথম আশ্চর্য্য লাভ হওয়ার সম্ভব।

এক বৎসরের গাছেই প্রায় ফল ধরিতে আরম্ভ হয়, তিন বৎসর পর্য্যন্ত গাছ সতেজ থাকে। গাছের প্রথম অবস্থায় ফল বড় হয়, পরে ক্রমশঃ ছোট হইয়া আইসে। এক একটী পেপে গাছের জন্য দীর্ঘে চারি হাত ও প্রস্থে চারি হাত পরিমিত স্থান আবশ্যক করিলেও এক বিঘা জমিতে ৪০০ চারি শত গাছ জন্মিতে পারে। এক একটা সতেজ গাছে দুই শতেরও অধিক ফল ধরিতে দেখা যায়। কিন্তু অযত্ন নিবন্ধন অনেক ফল ঝরিয়া পড়ে। এজন্য প্রতি গাছ হইতে বৎসরে ২০।২৫ টীর অধিক পাকা ফল লাভ হওয়া ঘটে না। এই গাছের শিকড় অধিক মাটির নীচে যায় না। ভাসা শিকড় হয় বলিয়া গোড়ার উপরের মাটি শুকাইয়া গেলেই রসের অভাবে গাছের পাতা কটা হইয়া যায় এবং গাছ শীর্ণ হইতে থাকে। এই কারণেই অনেক ফল ঝরিয়া পড়ে। যদি রীতিমত পেপের চাষ করিয়া শুকার সময় ক্ষেত্রে প্রয়োজন মত জল সেচনের উপায় করা যায়, তাহা হইলে গাছ সতেজ থাকে, ফল বড় হয় ও ফল প্রায় ঝরিয়া পড়ে না। এইরূপ যত্ন করিলে এক এক গাছ হইতে বৎসরে শতাধিক পাকা পেপে পাওয়া যাইতে পারে। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের বাজারে এক একটা বড় পেপে সাত আট পয়সা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে। পাকা পেপের গ্রাহকও কম নহে। যদি প্রতি গাছে বৎসরে গড়ে পঞ্চাশটী করিয়াও পাকা ফল পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক ফল গড়ে দুই পয়সার হিসাবে বিক্রয় হয়, তাহাতেও প্রতি বৎসর এক বিঘা জমির উৎপন্ন গাছ হইতে ৬২৫৲ ছয় শত পঁচিশ টাকা আয় হইতে পারে। মালীর বেতন ও জমির খাজানায় বার্ষিক ১২৫৲ এক শত পঁচিশ টাকা খরচ হইলেও প্রতি বিঘার বৎসর ৫০০ পাঁচ শত টাকা লাভ!! এতদ্ভিন্ন তরকারির জন্য কাঁচা পেপে বিক্রয় হইয়া থাকে।

আমরা পেপে গাছের উল্লিখিত প্রকৃতি অল্প সংখ্যক গাছ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছি এবং রীতিমত চাষের উদ্যোগে আছি। যখন সামান্য মূলধনে ও সামান্য যত্নে এরূপ অত্যধিক লাভের সম্ভা-

য়না, তখন অনেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু কথা এই, এরূপ লাভ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার নহে। কারণ অর্থনীতি শাস্ত্রের নিয়ম এই, সহজ উপায়ে যে কার্য্যে লাভ বেশী, সে কার্য্য অনেকেই অবলম্বন করে; তাহাতে অবশ্য অধিক আমদানীর জন্য মূল্য কম হইয়া লাভের হার হ্রাস করে। কিন্তু যদি এই কারণে এরূপ একটী উপাদেয় ফল দেশ মধ্যে সুলভ হইয়া উঠে, তাহা ও পরম লাভ বিবেচনা করিতে হইবে। যে যে স্থানে পেপের আদর ও কাট্‌তি বেশী, সেই সেই স্থানেই ইহার চাষে লাভের সম্ভাবনা। কারণ তথায় বিক্রয় না হইলে, ইহা অন্যত্র চালান দেওয়ার উপযুক্ত ফল নহে।

পেপের চাষ করিতে হইলে, বর্ষা কালে গাছ পাকা ফলের বীজ টাট্‌কা অবস্থায় চারা উৎপাদনার্থ কোন স্থানে পাতো দিবে। বৃষ্টির অভাব হইলে, মৃত্তিকা সরস রাখিবার জন্য তাহাতে আবশ্যক মত জল সেচন করিবে। শুষ্ক বীজে চারা জন্মে না। চারাগুলি অর্দ্ধহস্ত অপেক্ষা বড় হইয়া উঠিলে, জমিতে স্থায়ীরূপে পরস্পর চারি চারি হাত অন্তরে রোপণ করিবে। চারা রোপণার্থ যদি সমুদয় জমি কোদ্‌লান হইয়া থাকে ভাল, নচেৎ ঐরূপ অন্তরে অন্তরে প্রত্যেক চারার জন্য এক হাত দীর্ঘ, এক হাত প্রস্থ, অর্দ্ধ হস্ত অপেক্ষা অধিক গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে। ফাসমাটি অথবা পলিমাটি সামান্য মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া গর্ত্তগুলি পূর্ণ করতঃ তথায় চারা রোপণ করিবে। এইরূপ প্রস্তুত স্থানে চারা রোপণ না করিয়া একেবারে চারি পাঁচটী করিয়া বীজ রোপণ করিয়া গেলেও হয়, তাহাতে যে চারা জন্মে তাহা আর স্থানান্তরিত করার আবশ্যক হয় না। কিন্তু এক স্থানে একের অধিক চারা রাখিবে না। পেপে গাছের পক্ষে পলিমাটির সার ভাল। যে দোআঁশ মৃত্তিকায় বালির অংশ কিঞ্চিৎ বেশী, তাহা ইহার পক্ষে উপযোগী। পুষ্করিণী বা খাল কাটিলে যে নূতন মাটি উঠে, সেই মাটিতে এই গাছ উত্তম জন্মে এবং তথায় ডাব নারিকেলের মত

খুব বড় ফল হয়। বর্ষাকালে চারা স্থানান্তরিত করিলে নূতন স্থানে শীঘ্র শীঘ্র শিকড় লাগিয়া যায়। গাছের গোড়ার মাটিতে বেশী রস থাকা-বা একেবারে রসের অভাব হওয়া ভাল নহে। গোড়ায় বর্ষার জল দাঁড়াইলে শিকড় পচিয়া গাছ উপড়িয়া পড়ে।

যে গাছে লম্বা লম্বা শীষ বাহির হইয়া ঝাড়ের ন্যায় ফুল ধরে, সে গাছ অকর্ম্মণ্য, তাহাতে সুফল লাভের প্রত্যাশা নাই, সুতরাং তাহা কাটিয়া সেই স্থানে অন্য চারা রোপণ করা কর্ত্তব্য। অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে যে, চারা নাড়িয়া পুতিলেই ঐরূপ অকর্ম্মণ্য গাছ জন্মে; পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এ কথা সত্য নহে। অপর কেহ কেহ বলেন, ফলের অগ্রভাগের দিকের বীজে যে গাছ জন্মে, তাহাতেই ঐরূপ ফুল ধরে। এ কথার সত্যতাও বিনা পরীক্ষায় বিশ্বাস করা যায় না। ফলতঃ কি কারণে গাছের ঐরূপ অবস্থা হয়, তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই।

কলা।

ভরতবর্ষে অনেক জাতীয় কলা দৃষ্ট হয়; আমরা অনুসন্ধান করিয়া এ পর্য্যন্ত আটাশ প্রকার কলার পরিচয় অবগত হইয়াছি; তন্মধ্যে চাঁপা, কাঁটালি, সবরি, অগ্নীশ্বর, রাম, অনুপান, কানাইবাঁশী, মোহনবাঁশী, সিঙ্গাপুরী, পিনাং, কাবুলি, মর্ত্তমান প্রভৃতি জাতিগুলি অধিক উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ। সিঙ্গাপুরী, পিনাং, কাবুলি, মর্ত্তমান এই সকল কলার নামের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উহারা ভিন্ন দেশ ও দ্বীপ হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে। আদিম অবস্থায় সকল কলাই বীজ পূর্ণ ছিল, চাষের পারিপাট্যে ক্রমশঃ বীজ হ্রাস হইয়া শাঁসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কতক জাতি একেবারে

বীজ শূন্য হইয়াছে। তরকারির জন্য কাঁচা অবস্থায় দুই এক জাতি কলা ব্যবহার হয়, তদ্ভিন্ন সমুদায়ই পক্কাবস্থায় আদরণীয়। কলার মোচা ও থোড় উৎকৃষ্ট তরকারি এবং পত্র উত্তম ভোজন পাত্র। সংপ্রতি নববিভাকর পত্রিকায় কলার ফল, পত্র, খোলা প্রভৃতি প্রত্যেক অংশের বিবিধ গুণ ও উপকারিতা বুঝাইয়া একটী সুন্দর প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। আমাদের পাঠকগণের অবগতির জন্য এস্থলে তাহার অধিকাংশ উদ্ধৃত করা গেল। বস্তুতঃ এদেশের লোকে মনোযোগ পূর্ব্বক কলার বিস্তৃত চাষে প্রবৃত্ত হইলে অল্পদিনের মধ্যে বিলক্ষণ লাভবান হইয়া বড় মানুষ হইতে পারেন।

"আধুনিক ডাক্তারেরা কলাকে কি কি কাজে লাগাইয়া থাকেন পাঠক শুনুন। ক্ষত স্থানে কচি কলাপাতা জড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে হয়, তাহার পর শেষ দুই দিন উল্টাদিকটা ক্ষত স্থানে রাখিতে হয়। অনেক প্রসিদ্ধ ডাক্তারের মত যে মলম (Spermacetti ointment) প্রয়োগ অপেক্ষা কলারপাতা বাঁধা অধিক উপকারী। ঘা অথবা নালির স্থানে গটাপারচা যে কাজে লাগে কলাপাতাও ঠিক সেই কাজে লাগে ও তাহাতে সেইরূপ উপকার দর্শে। চোখ ওঠা বা চোখের অন্য কোন ব্যারাম হইলে চস্‌মা কি সবুজ কাপড়ের পরিবর্ত্তে কচি কলাপাতা দিয়া ঢাকিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। কলাগাছে ছুরি মারিলে যে পরিষ্কার সাদা জল বাহির হয় তাহা রীতিমত পান করিলে দুঃসাধ্য রক্তবমন ও কাশরোগ আরোগ্য হয়।

এইত গেল কদলীর ঔষধব্যবহার। তাহার পর দেখা যাউক কদলী ভোজনে লাভ কি। যিনি যাহাই বলুন সকলে স্বীকার করিবেন যে, কদলীর ন্যায় উপাদেয় ও মধুর অথচ বলকারক এবং স্বাস্থ্য প্রদায়ক ফল অতি অল্পই আছে। অথচ এত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আর কোন ফল উৎপন্ন হয় না। তাই বুঝি আমাদের দেশে বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবে কদলী বৃক্ষ ও ফলের এত আদর হইয়া থাকে। কদলীর পুষ্টিকারক গুণ সম্বন্ধে স্কটলণ্ডের ডাক্তার জন্‌সন

বলিয়াছেন,* "আলুতে যে যে দ্রব্য আছে, কলাতেও ঠিক সেই সেই দ্রব্য পাওয়া যায়। সুতরাং উভয়েই একরূপ পুষ্টিকারক। আলুতে শতকরা ২৫ ভাগ সার পদার্থ আছে, কিন্তু কলাতে শতকরা ৩৭ ভাগ পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস, শীত প্রধান দেশেও শুধু কলা খাইয়া স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষা করিতে পারা যায়, গ্রীষ্ম প্রধান দেশের ত কথাই নাই।" রসায়নজ্ঞ পণ্ডিত প্রসিদ্ধ বুসিগো সাহেব বলেন, কলা আলু অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। তিনি স্বয়ং কতকগুলি শ্রমজীবীকে প্রত্যহ তিন সের অৰ্দ্ধপক্ক কদলী ও এক ছটাক লবণ খাওয়াইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল রাখিয়া ছিলেন। তিনি বলেন কলাতে ম্যাগনেসিয়া, ফস্‌ফরস প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ যেরূপ পাওয়া যায় তাহাতে কলা অন্ততঃ আলুর ন্যায় শরীরের পুষ্টিকারক সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। আবার যে যে গুণে চাউল আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য হইয়াছে, তাহা কলাতে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্লটেন্ চাউলে শতকরা পাঁচ ভাগ কিন্তু কলাতে শতকরা ছয়ভাগ পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত উভয়েই ষ্টার্চের অংশ খুব অধিক পরিমাণে আছে। তাই জনসন সাহেব আরও বলিয়াছেন কলা এই কারণে চাউলের কাজও অনেকটা করিতে পারে।

এই জন্য আমেরিকার কোন কোন স্থানে কলাই প্রধান খাদ্য। সে খানে কাঁচা কলা কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া কলার গুঁড়ার রীতিমত বাণিজ্য হইয়া থাকে। বিলাতেও এই কলার গুঁড়ার রপ্তানি হয় এবং সেখানে সাহেবেরা সুখাদ্য বলিয়া তাহা ভোজন করেন। বোম্বাই সহরেও এইরূপ কলার গুঁড়ার ব্যবসায় হইয়া থাকে। ১৮৫০ সালে বোম্বাই হইতে এইরূপ ৩০০।৪০০ মণ কলার গুঁড়া বিলাতে রপ্তানি হইয়াছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিসে শিশু ও পীড়িতদের পুষ্টি সাধনের জন্য কলা খাওয়ান হয়।

কলা যখন এত উপকারী ও উপাদেয় তখন কি কারণে ইহা

* Journal of Agriculture Society of Scotland.

হনুমানের তৃপ্ত্যর্থে দেওয়া হয় বলিতে পারি না। বিশেষ চাল কলা ভোজী ব্রাহ্মণের উপর এত ঘৃণা কেন তাহাও বুঝিতে পারি না। সাহেবেরা উপরোক্ত কারণেই বোধ হয় কলার এত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

এইত গেল ফলের গুণ। আবার গাছের গুণ কত দেখ। মাটিতে রস রাখিতে হইলে কলাগাছ বসাইলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। নূতন বাগানে চারা গাছ বসাইবার পূর্ব্বে ভূমি সরস থাকিবে বলিয়া আগে কলাগাছ দেওয়া হয়। কলার বাসনার ছাই হইতে অতি উৎকৃষ্ট ক্ষার (Potash ash) পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামে রজকেরা সাবানের পরিবর্ত্তে এই ক্ষার দিয়া অতি সুন্দর কাপড় কাচিয়া থাকে। ভবিষ্যতে দেশে যদি কখন ব্যবসায় বিস্তার হয়, তবে এই কলার ক্ষার হইতে অনেক উপকার পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কলার পাতা সচরাচর গৃহস্থের কিরূপ আবশ্যক তাহা এস্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। আফ্রিকাতে পান্থ-পাদপ (Travellers'tree) নামক একপ্রকার বৃক্ষ আছে, তাহা এক প্রকার কল্পতরু বলিলেই হয়। তাহার পাতায় সে দেশের লোকেরা ঘটী, বাটী, থালা প্রস্তুত করে, ঘরের চাল ছায়, তাহার ডাঁটায় ঘরের দেওয়াল হয়, আবার সেই বৃক্ষে লৌহ ফলক মারিলেই তাহা হইতে যে সুস্বাদু ও উপাদেয় জল বাহির হয়, মরুভূমে তাহাতেই পথিকেরা জীবন রক্ষা করে। আমাদের দেশের কলা গাছও প্রায় সেইরূপ উপকারী। কলা গাছ আমাদের দেশের এক প্রকার কল্পতরু। সেই জন্য বুঝি দুর্গোৎসবে কদলীরূপী নব পত্রিকার এতদূর সম্মান।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কদলী বৃক্ষের যে প্রধান উপযোগিতা তাহা এখনও বলা হয় নাই। সকল প্রকার কলা গাছ হইতেই অতি সুন্দর ও দৃঢ় আঁশ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কাঁটালি কলার গাছ হইতে যে সুন্দর আঁশ বাহির হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও রেসমের ন্যায় উজ্জ্বল এবং মসৃণ। তাহা হইতে অতি চমৎকার কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। সম্প্রতি কলিকাতার আন্তর্জ্জাতিক

প্রদর্শনীতে ভারত প্রদর্শনী ক্ষেত্রে যে স্থানে ঢাকার কাপড় প্রদর্শিত হইয়াছিল, সেই স্থানে একখানি সুন্দর ৪০৲ টাকা মূল্যের কলার কাপড় ছিল, তাহা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহার সুতা কারিকরের দোষে রেসমের মত তত পরিষ্কার ও মসৃণ হয় নাই। এই কলার আঁশে সুন্দর সুতা হইতে পারে। এই আঁশ হইতে মোটা সালটির কাপড়, জাহাজের কাছি ও দড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। দক্ষিণ সমুদ্রে যে সকল জাহাজ মৎস্য ধরিবার জন্য নিযুক্ত আছে, তাহাতে এই কলার দড়িই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কলা গাছের খোলা হইতে মোটা ও শক্ত দড়ি প্রস্তুত হয়। কলার আঁশ হইতে উপরি উক্ত দ্রব্য ব্যতীত সুন্দর কাগজও প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কলাগাছ প্রায় কোন ব্যবহারে আইসে না। প্রায় তাহা গরুর উদরস্থ হইয়া থাকে। অথচ এদেশের সর্ব্বস্থানেই অপর্য্যাপ্ত কলা গাছ পাওয়া যায়। অতএব যদি কেহ ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করেন ও কলার আঁশ প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে সূতা, কাপড়, দড়ি, কাছি প্রভৃতি প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে তাঁহার যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের লোক চাকরির জন্যই ব্যস্ত, কে ব্যবসায়ের দিকে মন দিবে? নতুবা অল্প টাকায় মূলধন ব্যতীত এরূপ ব্যবসায় করিতে কেন আমরা অগ্রসর হই না? ড্রুরি সাহেব বলেন, শুধু কলা গাছ হইতেই যথেষ্ট ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আঁশ পাওয়া যাইতে পারে, এবং তাহা যেরূপ সুন্দর ও উপযোগী তাহাতে নিশ্চয়ই ইউরোপের সহিত এই দ্রব্যের ভারি ব্যবসায় চলিতে পারে। সম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশে কলার আঁশের কারবার আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে কবে এরূপ কারবার আরম্ভ হইবে বলিতে পারি না।

তিন বৎসর হইল, বোম্বাই অঞ্চলে দুইজন সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কলার সূতায় কাজ চলে। সূতায় কাপড় হয়, সূতা বাহির করিয়া লইলে যাহা পড়িয়া থাকে, তাহার অধিকাংশে আবার কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। কলাবাসনায় যে বেশ কাগজ হয়

তাহার পরীক্ষাও হইয়াছে। ৮০০ কদলী বৃক্ষে ৪০০৲ টাকা লাভ হয়। যথা—

সূতা	২৮ মণ	৩০০৲	টাকা
ঝড়তী	১৪ মণ	৫০৲	„
কাগজের উপযুক্ত বাসনা	১৪ মণ	৫০	„৲
মোট	৫৬ মণ	৪০০৲	টাকা

১৮৮০ অব্দে ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই সহর হইতে লিভারপুলে এই মাল লইয়া গিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে। এই মাল উৎপন্ন করিতে ৫২৲ টাকা খরচ পড়িয়াছে—

৮০০ কলাগাছ শতকরা	২৲ হিঃ	১৬৲
গাড়িভাড়া	ঐ	১৬৲
কাট ফাড়া ধোয়া শুকান বস্তাবন্দী প্রভৃতি দঃ		
৪০ টা মজুর খরচ	।০ হিঃ	১০৲
কলের কাঠ কয়লা ...	... ...	৫৲
হরেক রকম ...	... ...	৫৲
মোট		৫২৲ টাকা

বোম্বাই সহর হইতে ১৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী-বাসীন প্রদেশে সাহেবদের কলার কারখানা হইয়াছিল। সেখান হইতে বোম্বাই লইয়া যাইতে এবং জাহাজ ভাড়া দিয়া লিভারপুলে পৌছিতে যে খরচাটা পড়িয়াছিল, তাহা মাল তৈয়ারী খরচা উক্ত ৫২৲ টাকার উপর লাগাইলেও ২০০৲ টাকার অধিক পড়িবে না। তবুও দেখ লাভ কত।

কলার আঁশ বাহির করিবার প্রণালী যেরূপ ডাক্তার হণ্টার বলিয়াছেন তাহা এস্থলে লিখিত হইল। "কলার সরস ও তাজা খোলগুলি ভিন্ন কর ও পাতার মাঝের শির বাহির করিয়া লও। খোলার ভিতর দিক উপর করিয়া শোয়াইয়া লোহার ভোঁতা কুরাণি দিয়া খোলার মধ্যে শাঁস বাহির করিয়া ফেল, তাহার পর এইরূপ খোলার পিছনের দিকও আচড়াইয়া শাঁসগুলি বাহির কর, তাহার পর তাড়াতাড়ি জলে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইয়া ক্ষারের

জলে কিম্বা বিলাতী সাবানে সিদ্ধকর। তাহা হইলেই আঁশের সমস্ত রস নির্গত হইবে ও আঁশ পরিষ্কার হইবে। তাহার পর জলে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ছায়ায় শুকাইয়া লও। অধিকক্ষণ জলে রাখিলে বা রৌদ্র লাগাইলে আঁশ অপরিষ্কার ও কম শক্ত হয়। রাত্রে শিশির লাগাইলে আরও পরিষ্কার হইবে।” ইহা যত পরিষ্কার হইবে তত শক্ত ও সুন্দর হইবে। সম্প্রতি ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট আলিপুরের বাগানের পাশে যে আঁশ বাহির করিবার কল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে গুলিতে কলার আঁশ বাহির করিবার তত সুবিধা নাই। একটী শুধু কলার আঁশ বাহির করিবার কল ছিল, সেটাও ভাল চলে নাই। বোধ হয় আকমাড়া কলের ন্যায় কল করিয়া তাহাতে কলার খোলা মাড়িয়া আছড়াইয়া লইলে সুবিধামত ভাল আঁশ প্রস্তুত হইতে পারে।

কলার আঁশের আর এক গুণ এই যে, ইহা পাট, শণ ও ঘৃতকুমারীর আঁশ অপেক্ষা অনেক হাল্‌কা অথচ ইহা খুব শক্ত। যদি ইহা সুন্দররূপে পরিষ্কৃত হয় ও শীঘ্র রস নির্গত করান যায় তবে তাহা শোণের অপেক্ষাও শক্ত হয়, আর জলে পচিয়া যায় না। বড় ও মোটা কলা যে গাছে হয়, তাহা হইতে শক্ত ও মোটা আঁশ পাওয়া যায়; আর যাহার ফল ক্ষুদ্র তাহা হইতেই সূক্ষ্ম আঁশ পাওয়া যায়। ইহাতেই ভাল কাপড় হয়। কাঁটালে কলার আঁশই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রেসমের মত।

ডাক্তার রয়লি কলার দড়ির ও কাছির ভারসহতা পরীক্ষা করেন। তিনি দেখিয়াছেন ১২ গাছি সূতায় যে দড়ি হয় তাহা দশ মণ ভার সহিতে পারে। তিনি বলেন, ইউরোপের বাজারে মণকরা ১৮। ২০ টাকা মূল্য হইতে পারে। অন্ততঃ যদি ইহার ব্যবসায় চলে তাহা হইলে কলার দড়ির মণকরা যে ১৩।১৪ টাকা মূল্য হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, সকল প্রকারের কাগজ প্রস্তুতের জন্য কলার আঁশ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ও কলাগাছে সকল গাছ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আঁশ উৎপন্ন হয়।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে কলার আঁশ হইতে মোটা রকম কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফ্রান্সে কলার আঁশ হইতে সুন্দর ও অতি উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়। এদেশে কলার চাষ এত অধিক হইলেও তাহার গাছ কোন কাজেই ব্যবহৃত হয় না। ইহার আঁশ অতি অল্প খরচে ও অল্প পরিশ্রমে উৎপন্ন হইতে পারে। রয়লি সাহেব অনেক কৃষিবিদ্যাবিদ্ লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন আঁশ প্রস্তুত করিতে মণ করা সাড়ে তিন টাকা খরচ হয় মাত্র। যদি অন্ততঃ ১৩।৷০ টাকা মণ করা বিক্রয় হয় তথাপি মণ করা দশ টাকা লাভ থাকে।"

কলার চাষ অতি সহজ; বর্ষাকালে কলার ঝাড় হইতে ছোট ছোট তেউড় তুলিয়া সাত আট হাত অন্তর এক হাত গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া রোপণ করিবে। রোপণের পূর্ব্বে সমুদায় জমি একবার কোদ্‌লাইয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। যেস্থানে বর্ষার জল বাধে সেস্থানে চারা রোপণ করিবে না। এক বৎসরের গাছ হইলেই প্রায় ফলিতে আরম্ভ করে। এক একটা গাছের গোড়ার চারি পার্শ্বে অনেকগুলি চারা জন্মিয়া বৃহৎ ঝাড় হয়, কিন্তু এক এক ঝাড়ে ঊর্দ্ধ সংখ্যা তিনটীর বেশী গাছ রাখা কর্ত্তব্য নহে। অধিক থাকিলে গাছ নিস্তেজ হইয়া কলা খারাপ হয়, এজন্য প্রতি বর্ষায় অনেক তেউড় তুলিয়া ফেলিতে হয়। মোচা ধরিবার পূর্ব্বে ঝড় বাতাসে কোন গাছ ভাঙ্গিয়া গেলে যদি ভগ্ন স্থানের নীচে কাটিয়া ফেলা যায়, তবে পুনরায় পত্র উদ্ভূত হইয়া গাছ বাঁচিয়া থাকে। কলার চাষ সম্বন্ধে দুইটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

(১) "আট হাত অন্তর, এক হাত বাই,
কলা পোতগে চাষা ভাই।
পুতে কলা না কেটো পাত,
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।"

(২) "তিনশ ষাট ঝাড় কলা রুয়ে,
থাকগে চাষা ঘরে শুয়ে।
পুতে কলা না কেটো পাত,
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।"

দুইটী প্রবাদই প্রায় একরূপ; বিশেষ শেষ অংশে উভয়ের অবিকল মিল আছে। কলার চাষ যে বেশ লাভজনক উভয় প্রবাদেই তাহার আভাস রহিয়াছে। প্রথম প্রবাদের প্রথম চরণে আট হাত অন্তর এক হাত গর্ত্ত করিয়া কলা রোপণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। পাতা কাটা উভয় প্রবাদেই নিষেধ। বস্তুতঃ শীতকালে কলার পাতা কাটা বড় অনিষ্টজনক; অন্যকালে পাতা কাটায় তত অনিষ্ট দেখা যায় না কিন্তু অধিক পাতা কাটিলে গাছের মস্তক সরু হইয়া যায় সুতরাং মোচা ও কলা ভাল হয় না।

আনারস।

আনারস বর্ষার একটি প্রধান ফল। পাকা আনারস জলপানে ব্যবহৃত হয়। ইহার আস্বাদ অম্ল মধুর, কোন কোন জাতি তীব্র অম্লরস বিশিষ্ট। বর্ষা ভিন্ন অন্য কালেও ইহার পাকা ফল পাওয়া যায় কিন্তু অকালের ফল গুলির আস্বাদ কালের ফলের ন্যায় উৎকৃষ্ট হয় না। এই গাছের চতুস্পার্শ্ব হইতে কলার বোগের মত অনেক চারা উৎপন্ন হয়; ঐ সকল চারা বর্ষাকালে তুলিয়া রোপণ করিতে হয়।

ফলের পার্শ্বেও ইহার চারা জন্মে, তাহাকে আনারসের মুখী কহে; আনারসের ঐ সকল মুখী রোপণ করিলেও গাছ জন্মে। ছায়া-বিশিষ্ট সরস স্থানে চারা রোপণ করিবে; কারণ বেশী রৌদ্রে ও শুষ্ক স্থানে চারা বাঁচে না। দুই দুই হাত অন্তর আধ হাত গর্ত্ত করিয়া চারা রোপণ করিতে হয়, ঘন ঘন রোপিত হইলে অল্পদিনের মধ্যে আনারসের বন হইয়া পড়ে; তাহাতে ফল ভালরূপ জন্মে

না। প্রতি বর্ষায় কতকগুলি করিয়া চারা তুলিয়া গাছ ফাক ফাক রাখিতে পারিলে ভাল হয়।

একবার চারা রোপণ করিলে ক্রমান্বয়ে অনেক বৎসর তাহার বংশাবলীতে ফল প্রসব করে। এই গাছের পক্ষে আর কোন পাইট নাই। ইহার পাতার রস কৃমিনাশক। পাতায় অতি সূক্ষ্ম চিক্কণ আঁশ আছে, তাহাতে সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে।

বেল।

বেল অতি উৎকৃষ্ট ফল। ইহার পুষ্টিকারিতা শক্তি অত্যন্ত অধিক। শুদ্ধ বেল ভক্ষণ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত কোন লোককে সুস্থ ও সবল থাকিতে দেখিয়াছি। পুরাণাদিতে মুনি ঋষিদিগের কেবল ফল মূল ভক্ষণ দ্বারা জীবন ধারণের কথা জানা যায়। বোধ হয় এই প্রকার পুষ্টিকর ফলাদি তাঁহাদের আহারার্থ নির্দ্ধারিত ছিল। বেল উদরাময় রোগের মহৌষধ। শ্রীফল ও বেল পৃথক পদার্থ নহে; ছোট আকৃতির ফল হইলে তাহাকে সচারাচর শ্রীফল বলিয়া থাকে।

এই গাছের শিকড় অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করে, এবং উহা হইতে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ফেকড়ি (ওজ) বহির্গত হইয়া থাকে।* লোকে এই শিকড়ের কিয়দংশের সহিত ঐ ফেকড়ি কাটিয়া লইয়া উদ্যানে রোপণ করে; কিন্তু এই প্রকারে ফেকড়ি তুলিলে উহা অনেক সময় মরিয়া যায়। নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিলে প্রায় মারা যায় না। যে স্থান হইতে ফেকড়ি উদ্গত হয়, সেই স্থানের মৃত্তিকা খুড়িয়া গুল কলমের ন্যায় উহার (ফেকড়ির) উভয় পার্শ্বস্থ শিকড়ের কতক অংশের চতুস্পার্শ্বস্থ ছাল তুলিয়া রস গমনা-

---

* শিকড় হইতে পত্র কলিকা জন্মিতে পারে না; সুতরাং উহা বাস্তবিক শিকড় নহে, কাণ্ডের অংশ বলাই কর্ত্তব্য। কিন্তু সাধারণে উহাকে শিকড় বলিয়া থাকে একারণ সকলের বোধগম্যের জন্য আমরাও শিকড় বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

গমন বন্ধ করিতে হয়। পরে মাটি চাপা দিয়া কয়েক দিন জল দিলে তথা হইতে ক্ষুদ্র২ শিকড় বহির্গত হয়, তখন সাবধানে তীক্ষ্ণ ছুরী দ্বারা নব জাত শিকড় সমেত কর্ত্তন করিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিতে হইবে।

সুপক্ক বেলের বীজ কোন ঝুরা মৃত্তিকাপূর্ণ পাত্রে পাতো দিয়া চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু বীজজাত চারায় অপেক্ষাকৃত বিলম্বে ফল ধরে। দো-আঁশ মাটি বেল গাছের পক্ষে উপযোগী। যে স্থানে বর্ষার জল বসে, সে স্থানে চারা রোপণ করিবে না। চারা রোপণের পূর্ব্বে মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক তাহাতে খৈল বা গোবরের সার মিশাইবে। শাখা প্রশাখা সহ অধিক পরিমাণে পত্র তুলিয়া লইলে গাছের অনিষ্ট হয়। চারা গাছ হইতে এইরূপে পত্র সংগৃহীত হইলে উহারা প্রায় মরিয়া যায়। শীতের প্রারম্ভে গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দিলে এবং আষাঢ় মাসে গোড়ায় আইল বান্ধিয়া বর্ষার জল খাওয়াইলে বৃক্ষের বিলক্ষণ তেজ থাকে। যে বেলের আবরণ পাতলা, আঠা ও বীজ কম সেই বেলই ভাল। ঐ গুণ ছোট ও বড় উভয় জাতীর মধ্যেই দৃষ্ট হয়। বেলের আকার খুব বড় হইয়া থাকে, ৬।৭ সের ওজনের বৃহৎ বেলও সময় সময় দেখা যায়। উদরাময় রোগে কাঁচা বেল পোড়াইয়া খাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। কচি বেল খণ্ড খণ্ড করিয়া শুকাইলে তাহাকে বেল শুঁট বলে, উহা ঔষধে লাগে। বেলে মোরব্বা ও বেলপানা উপাদেয় খাদ্য।

কুল।

কুলের সংস্কৃত নাম বদরী। এই নামের অপভ্রংশ করিয়া কোন কোন দেশে ইহাকে বরই বলে। বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ভাল জাতীয় কুল জন্মে। আমরা যাহাকে নারিকেলি কুল বলি, তাহার গাছ বঙ্গদেশে উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে আনীত হইয়াছে, এরূপ বোধ হয়। নারিকেলিকুল এখন বঙ্গদেশের নানাস্থানে

বিস্তর জন্মিতেছে। কুলের মধ্যে নারিকেলি কুলই উৎকৃষ্ট। দেশীয় কুলের আঁটি বড় এবং অধিকাংশই তীব্র অম্লরসবিশিষ্ট। বালকেরা অপক্ক অবস্থাতেই বৃক্ষ হইতে কুল পাড়িয়া খাইতে আরম্ভ করে। কাঁচা কুলে কফ, কাশি, উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মে, এজন্যই বোধ হয় সরস্বতী পূজায় না দিয়া কুল খাওয়া বালকদিগের পক্ষে নিষেধ ছিল।

ইহার আঁটির চারা ও কলমের চারা উভয়ই রোপিত হইয়া থাকে। চোঙ্গকলমে চারা প্রস্তুত হয়। সচরাচর দেশী কুলের চারার মস্তকে নারিকেলি কুলের চোঙ্গ বসাইয়া কলম করা হইয়া থাকে। দেশী কুলের আঁটি পড়িয়া অযত্নে যেখানে সেখানে চারা জন্মে এবং ফলও তাদৃশ ভাল নয় বলিয়া উহার কলম করিবার আবশ্যক হয় না। দো-আঁশ মৃত্তিকা, কুলগাছের পক্ষে উপযোগী।

কলমের চারা রোপণ করিয়া বড় সতর্ক থাকিতে হয়; কারণ কলমের নিম্নস্থ চারার কাণ্ড হইতে পুনঃ পুনঃ ফেকৃড়ী বাহির হইয়া কলমের মস্তকস্থ চোঙ্গের তেজ হানি করতঃ তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। এজন্য অনেক সময়ে নারিকেলি কুলের কলম রোপণ করিয়া তাহাতে দেশী কুল ফলিতে দেখা যায়। এই দোষ নিবারণের নিমিত্ত সর্ব্বদা তদারক আবশ্যক; চারার গাত্র হইতে নূতন শাখা (ফেকড়ী) উদ্গত হইলেই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। কিন্তু সাবধান—যেন চারার ফেকৃড়ী ভ্রমে চোঙ্গের ফেক্ড়ী না ভাঙ্গা হয়। কিছুদিন এইরূপ করিলে, চোঙ্গের শাখা প্রশাখাগুলি নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধি পাইয়া প্রবল হইয়া দাঁড়াইবে; তখন আর চারায় সেরূপ ফেক্ড়ী বাহির হইবে না; হইলেও চোঙ্গকে বিনষ্ট করিতে পারিবে না। কলমের চারা রোপণ করিয়া যাবৎ তাহার শিকড় না লাগিবে, তাবৎ আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে গোড়ায় জল দিতে হইবে। কার্ত্তিক মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া সার দিলে ফল বড় হয়। ফল ফুরাইয়া গেলে এই গাছের সমুদায় ডাল কাটিয়া ফেলার যে রীতি আছে, তাহা ভাল। কারণ তাহাতে অল্পদিনের মধ্যেই

অসংখ্য নূতন ফেকড়ী জন্মিয়া বৃক্ষের যুবত্ব রক্ষা করে; সুতরাং বার্দ্ধক্য দোষ ঘটিলে বৃক্ষের ফল ছোট হওয়া বা অল্প ফল প্রসব করা প্রভৃতি যে সকল দোষ হয়, তাহা হইতে পারে না। ঐ নূতন ফেকড়ী জন্মিলেই এই গাছের কলম করা ভাল, কারণ তখন চোঙ্গ তোলা সহজ।

লেবু।

ভারতবর্ষে অনেক জাতীয় লেবু দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে কমলা, বাতাবি, কলম্বো, কাগচি ও পাতি অধিক প্রচলিত। স্থানভেদে ফলের উৎকর্ষাপকর্ষ ঘটিয়া থাকে। শ্রীহট্ট জেলায় যেরূপ কমলা জন্মে, বিস্তর চেষ্টা করিয়া দেখা গিয়াছে যে বঙ্গদেশের অন্যত্র সেরূপ উৎপন্ন হয় না। বাতাবি ও কলম্বো এদেশী লেবু নহে। বাতাবি বটেভিয়া এবং কলম্বো লঙ্কা দ্বীপ হইতে আনীত হইয়াছে। চীনের কাগচি বলিয়া যে লেবু বিখ্যাত তাহা চীন দেশের আমদানী। ইহা দেশীয় কাগচি অপেক্ষা আকৃতিতে বড়। কিন্তু তীব্র ও অম্ল-রস বিশিষ্ট। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক প্রকার ছোট জাতীয় লেবু কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অনেক উদ্যানে দৃষ্ট হয়, তাহা সুখাদ্য নহে কিন্তু ফলগুলি পক্কাবস্থায় লাল রঙ্গে বৃক্ষকে অতিশয় সুশোভিত করে।

সাধারণতঃ সমুদায় লেবুর চাষ প্রণালীই একরূপ। বীজ রোপণ করিয়া ও কলম বান্ধিয়া চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বীজোৎপন্ন চারা অপেক্ষা কলমের চারায় শীঘ্র ফল ধরে ও ফলের গুণের ব্যতি-ক্রম হয় না। এজন্য কলমের চারাই অধুনা বেশী আদরণীয়। বর্ষাকালে গুল কলম করিলে দেড় বা দুই মাস মধ্যে চারা জন্মে। বর্ষা অন্তে বা শরতের প্রারম্ভে সেই চারা উদ্যানে রোপণ করা যাইতে পারে। গাছ হইতে কলম নামাইয়া কিছুদিন হাপোরে

রাখিলে ভাল হয়। তাহা না করিয়া যদি একেবারেই উদ্যানে রোপণ করা যায় তাহাহইলে সেই স্থানের মৃত্তিকায় শিকড় যাবৎ বদ্ধ না হইবে তাবৎ যাহাতে রৌদ্র না লাগে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৃষ্টি না হইলে মধ্যে মধ্যে গোড়ায় জল দিবে। বীজ রোপণ পূর্ব্বক চারা জন্মাইতে হইলে সুপক্ক লেবুর বীজ কোন মৃত্তিকা পূর্ণ পাত্রে পাতো দিবে। চারা জন্মিয়া ৪।৫ অঙ্গুলি বাড়িয়া উঠিলে স্থায়ীরূপে উপযুক্ত স্থানে রোপণ করিবে। দো-আঁশ মৃত্তিকায় গাছ ভাল জন্মে। গাছের গোড়া পরিষ্কৃত রাখিয়া এবং প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া সার দিলে গাছ বিলক্ষণ সতেজ থাকে ও তাহাতে প্রচুর ফল ধরে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অনেক উদ্যানে এক জাতীয় বাতাবি দেখা যায়, তাহার খোসা অত্যন্ত পাতলা এবং রোয়াগুলি রসে পরিপূর্ণ ও আস্বাদ অম্ল মধুর। এরূপ উৎকৃষ্ট বাতাবি অন্যত্র প্রায় দেখা যায় না।

আতা।

আতা ও নোনা এক জাতীয় বৃক্ষ। আতা ফলের পৃষ্ঠদেশ বন্ধুর হইয়া থাকে, নোনার সেরূপ হয় না পাকিলে নোনা লাল বর্ণ হয়, আতা সবুজ বর্ণই থাকে। নোনার আকৃতি আতা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ হয়। ফলের এই প্রভেদ ভিন্ন কাণ্ড, পত্র ও ফুল প্রভৃতি সকল বিষয়েই ইহাদের ঐক্য আছে। গুণানুসারে বিচার করিলে নোনা অপেক্ষা আতা উৎকৃষ্ট; এজন্য লোকে আতা গাছ যেমন যত্নপূর্ব্বক রোপণ করে, নোনা গাছ রোপণে সেরূপ যত্ন করে না।

আতার কলম হয় না, বীজ দ্বারা চারা জন্মাইতে হয়। দো-আঁশ মাটি ইহার পক্ষে উপযুক্ত। চারার মূল সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। শীতের প্রারম্ভে গোড়া খুঁড়িয়া সার দিলে বৃক্ষ সতেজ

থাকে ও ভাল হয়। এই গাছের ছাল দিয়া উদ্যানের বেড়া বাঁধিয়া থাকে। বোধ হয় চেষ্টা করিলে উহা হইতে সূক্ষ্ম সূত্রও বাহির করা যাইতে পারে।

দাড়িম্ব।

ডালিমের ফল উৎকৃষ্ট এবং গাছ দেখিতে সুন্দর। ইহার মূল, ত্বক, পত্র, ফল সকলই ঔষধে লাগে, এ জন্য উদ্যানে রোপণ করা ভিন্ন প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতেও এই গাছ জন্মান উচিত। বঙ্গদেশের মধ্যে পাটনা অঞ্চলের ডালিম অপেক্ষাকৃত বড় ও উৎকৃষ্ট। আরব ও আফগানি স্থানের ডালিম বিশেষ বিখ্যাত। বাজারে বেদানা ও মস্কট নামে যে ডালিম বিক্রয় হয়, তাহা ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও আফগানিস্থান হইতে আমদানী। তদ্রূপ ডালিম ভারতবর্ষের অন্যত্র জন্মে না।

যে দো-আঁশ মৃত্তিকায় এটেল মাটিরভাগ বেশী, তাহাতেই ডালিমের গাছ ভাল জন্মে। গাছের গোড়ায় বেশী রস-সঞ্চিত থাকিলে ফল মন্দ হয়, এজন্য পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অপেক্ষা একটু উচ্চ স্থানে চারা রোপণ করা কর্ত্তব্য। বীজরোপণ করিয়া অথবা গুল কলম করিয়া ইহার চারা প্রস্তুত হয়। বীজের চারা উৎপাদন জন্য বড় ও নিখুত সুপক্ক ডালিমের বীজ পছন্দ করিবে। বীজের চারা ও কলমের চারা উভয়ই রোপিত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে কলম করিলে শীঘ্র চারা প্রস্তুত হয়, অথচ অধিক তদারকের আবশ্যক করে না। বীজরোপণ করিয়া চারা করিতে হইলে, ঝুরা মৃত্তিকাপূর্ণ পাত্রে পক্কডালিমের বীজ টাট্‌কা অবস্থায় রোপণ করিবে, এবং মৃত্তিকা নীরস বোধ হইলে, মধ্যে মধ্যে জল দিবে। তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যেই অঙ্কুর উদ্গত হইয়া চারা জন্মিবে। চারা কিছু বড় হইয়া উঠিলে উপযুক্ত স্থানে স্থায়ীরূপে রোপণ করিবে। প্রতি

বৎসর কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া শিকড়ে রৌদ্র বাতাস লাগাইবে। ১২।১৪ দিন পরে কিছু সার মিশ্রিত নূতন মৃত্তিকাদ্বারা পুনরায় গোড়া ঢাকিয়া দিবে। ইহাতে গাছের তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইবে।

ডালিমের পুরাতন ও শুষ্কপ্রায় ডালগুলি কাটিয়া দিলে, নূতন ফেকড়ী গজাইয়া বৃক্ষকে সুশোভিত করে এবং তাহাতে ফলও বেশী হয়। ফলের প্রধান শত্রু কীট। অনেকে বলেন ফলের মস্তকে যে ফুল থাকে, তাহাতেই কীটের সঞ্চার হয়। ফলতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ফলের প্রথম অবস্থায় তাহা ছিন্ন বস্ত্রদ্বারা বান্ধিয়া রাখিলে পোকায় কম ধরে; এ জন্য এই কথা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। ঐরূপ বান্ধিয়া রাখার আর একটি গুণ এই, উহাতে ফল বড় হয়। বান্ধিবার সময় ফল বৃদ্ধির সুবিধা থাকার জন্য উপযুক্ত সল রাখিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, বৃক্ষের মূল অধিক নিম্নে প্রবেশ করিলে, ফলে কীট জন্মে, এ নিমিত্ত তাঁহারা মৃত্তিকার কিছু নিম্নে টালি পাতিয়া তদুপরি চারা রোপণের পরামর্শ দেন। কিন্তু ফল পোকায় ধরায় এই কারণ কতদূর যুক্তিযুক্ত বলিতে পারি না। ডালিম গাছের ভাসা শিকড়ই হইয়া থাকে, টালি না দিলেও ইহার শিকড় অধিক মৃত্তিকার নিম্নে যায় না, তবে টালি দেওয়ায় এক উদ্দেশ্য এই দেখা যায় যে, ডালিম গাছের গোড়ার মাটি অধিক রসাল থাকা ভাল নহে। নীচে টালি পাতা থাকিলে মৃত্তিকার আর্দ্রতা অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে।

পিচ।

পিচ আমাদের দেশীয় গাছ নহে, কিন্তু আ'জ কা'ল কলিকাতার অনেক উদ্যানে ইহা দেখা যায়। পিচের কাণ্ড ও শাখা দ্বারা উৎকৃষ্ট যষ্টি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইউরোপীয়েরা ইহার ফলকে

অতি উপাদেয় খাদ্য বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু সচরাচর এদেশের উদ্যানে যে পিচ জন্মে তাহা ছোট ফল এবং তাহাকে উপাদেয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না; তবে চাষের পারিপাট্যে ফল বড় হইলে ভাল গুণ হইবারই সম্ভব, এগ্রিকল্‌চার হর্টিকল্‌চার সোসাইটির রিপোর্ট পাঠে জানা গেল, ডাক্তার স্কট গৌহাটীর উদ্যানে বিশেষ, যত্ন করায় এক সের অপেক্ষা ও বেশী ওজনের ফল লাভ করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহারই মতানুসারে পিচের চাষ লিখিলাম।

বীজের চারা অপেক্ষা কলমের চারা ভাল। যোড় কলমে চারা প্রস্তুত হয়। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস পিচের চারা রোপণ করিবার উপযুক্ত সময়। প্রথমে ৪।৫ হাত পরিমিত বর্গ ভূমিতে ২ কি ২।০ হাত গভীর করিয়া একটী গর্ত্ত কাটিতে হইবে। পরে এই গর্ত্ত সার দিয়া পূর্ণ করিবে। ভেড়ার বিষ্ঠা, গোবর, কাষ্ঠের কয়লা, চুণ, ছোট মাছ, পুরাতন চামড়া, অস্থিচূর্ণ এবং খৈল পিচের চাষে সার দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভেড়ার বিষ্ঠা, গোবর ও কাষ্ঠের কয়লা একত্র মিশাইয়া তদ্দ্বারা উক্ত গর্ত্তের ১৬ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত পূর্ণ করিতে হয়; পরে তদুপরি দশ সের আন্দাজ ছোট মাছ ফেলিয়া দিয়া উপরে এক সের চূণ দিবে। যত দিন গর্ত্ত পূর্ণ না হইবে ততদিন এই প্রকারে স্তরে স্তরে সার দেওয়া আবশ্যক। ২।১ মাস পরে গাছে কুঁড়ি ধরিতে আরম্ভ হয়। এই সময় এরূপ সতর্কতার সহিত গাছের গুঁড়ির চতুর্দ্দিকের ১।০ হাত পর্য্যন্ত নীচে যে সকল শিকড় থাকে তৎসমুদায়কে ছিদ্র করিয়া দিবে যেন কোন ক্রমে উহারা ছিঁড়িয়া না যায়। পরে মাটি খুঁড়িয়া শিকড়গুলিকে ২০।২১ দিন পর্য্যন্ত খোলা রাখিতে হইবে। তদনন্তর পুনরায় সার দিয়া উহাদিগকে আবৃত করিবে। এই সার পুরাতন চামড়া, অস্থি, ভেড়ার বিষ্ঠা, গোবর এবং চূণ একত্র মিশাইয়া ৭।৮ মাস পর্য্যন্ত মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত রাখিলে প্রস্তুত হইবে। পিচের ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে কতক ফল ভাঙ্গিয়া পাতলা করিয়া দিবে।

ফল পোকায় না ধরিতে পারে এজন্য কাঁচা থাকিতে থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া রাখিতে হয়।

আঙ্গুর।

বঙ্গদেশে আঙ্গুরের চাষ প্রায় দেখা যায় না; কিন্তু আঙ্গুর যেরূপ সুস্বাদু ফল তাহাতে ইহার চাষে প্রয়াস পাওয়া অনুচিত নহে। আফগানিস্থান, পারস্য প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর জন্মিয়া থাকে এবং সচরাচর সেখান হইতেই আমাদের দেশে আমদানি হয়। ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগেও অনেক আঙ্গুর জন্মে।

আঙ্গুর গাছ লতার ন্যায়; শাখা কলম করিয়া ইহার চারা জন্মাইতে হয়। এক বৎসর বয়স্ক কলমের চারা ক্ষেত্রে রোপণ করিবে এবং জাফরি করিয়া তদুপরি বিস্তৃত করিয়া দিবে। শীতের প্রারম্ভে উহাদের ডগা ও পাতা ছাঁটিয়া দিয়া গাছের গোড়ার কিয়ৎদূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকা উঠাইয়া খুলিয়া দিতে হইবে। অনন্তর বসন্তকাল উপস্থিত হইলে জল ঢালিয়া মূলগুলি ধৌত করিবে এবং পচা মাছের সার দিবে ও দুর্গন্ধ নিবারণার্থ মৃত্তিকা চাপা দিবে। গাছের গোড়া খুঁড়িয়া শিকড় সকল বাহিরে রাখিবার তাৎপর্য্য এই যে, রাত্রিতে শিশির লাগিয়া গাছের বৃদ্ধি স্থগিত রাখিবে এবং তৎকালে এই প্রকারে বৃদ্ধি স্থগিত থাকিলে, পরে বসন্তকালে ঐ সকল গাছ আপাদমস্তক বলবান্ হইয়া উঠিবে। আলো ও তাপ আঙ্গুর গাছের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং এইজন্যই ইহার ডগা ও পাতা সকল জাফরির উপর বিস্তীর্ণ করিয়া রাখা হইয়া থাকে। আঙ্গুর ক্ষেত্র প্রস্তুত কালে যাহাতে পূর্ব্বদিকের বাতাস হইতে গাছগুলি রক্ষা পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ ঐ বাতাসে ফলের গাত্রে কাল কাল দাগ পড়ে এবং তাহাতে ফলগুলি আর বৃদ্ধি হইতে পারে না। এই গাছে থলো থলো ফল ধরে এবং সেই ফল বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পরিপক্ক হয়। কাপ্তেন সেজ দানাপুরে

উল্লিখিত প্রণালী অনুসারে আঙ্গুরের চাষ করিয়া বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

তেজ-পত্র।

সুগন্ধি বলিয়া ব্যঞ্জনাদিতে তেজপত্র মসলা রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতসাগরীয় অনেক দ্বীপে এবং ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ইহার গাছ জন্মে। আম, কাঁটালের ন্যায় তেজপত্রের প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়। একটী বৃক্ষের পত্রে শতাবধি গৃহস্থের প্রয়োজন সম্পন্ন হইতে পারে। যত্ন করিলে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই এই বৃক্ষ উৎপাদনে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। কবাবচিনির চারার সহিত তেজ-পত্রের শাখায় যোড়কলম করিয়া ইহার চারা প্রস্তুত করিতে হয়। কলিকাতার চারাবিক্রয়ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে এই কলম কিনিতে পাওয়া যায়, এক একটী চারার মূল্য আট আনার অধিক নহে।

চারা রোপণ সময় এক হাত গভীর একটী গর্ত্ত খনন করিবে এবং উদ্ভিজ্জসার পোড়ামাটি ও পলীমাটি সামান্য মৃত্তিকার সহিত সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ঐ গর্ত্ত পূর্ণ করতঃ তথায় চারা রোপণ করিবে। কিয়দ্দিবস প্রতিদিন বৈকালে চারার মূলে জল দিবে। শিকড় লাগিয়া গেলে আবশ্যকমত মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলেই হইবে। গাছ বড় হইয়া উঠিলে প্রতি বৎসর শীতের প্রারম্ভে গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া উপরের শিকড় গুলি তিন চারি দিন বাহির করিয়া শিশির বাতাসাদি লাগিতে দিবে। তৎপরে প্রাণীসার বা উদ্ভিজ্জসার দ্বারা শিকড়গুলি ঢাকিয়া দিয়া উপরে মাটি চাপা দিবে। এরূপ করিলে বৃক্ষ অত্যন্ত সতেজ হইয়া প্রচুর শাখা পত্র-বিশিষ্ট হইবে। এক সময়ে একবারে অধিক পত্র সংগৃহীত হইলে কিম্বা পত্র সংগ্রহ জন্য অধিক শাখা ভাঙ্গিলে গাছের অনিষ্ট হয়।

লবঙ্গ।

লবঙ্গ বলিয়া আমরা যে জিনিষ ব্যবহার করি, তাহা ফল নহে, বৃক্ষের ফুল। ভারত সাগরীয় দ্বীপশ্রেণী হইতে উহা এদেশে আমদানী হয়। এদেশে যে লবঙ্গের গাছ জন্মে, তাহাতে গোলাকৃতির একরূপ ফুল ধরিয়া পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে না হইতেই ঝরিয়া পড়ে। সুতরাং পূর্ণাবস্থায় তাহা লবঙ্গের ন্যায় আকৃতি প্রাপ্ত হয় কি না দেখা যায় নাই। ঐ অসম্পূর্ণ পুষ্পের গন্ধাদি লবঙ্গের অনুরূপ। শিবপুরে কোম্পানির বাগানে লবঙ্গ বৃক্ষ রোপণ করিয়া বিস্তর যত্ন করা হইয়াছিল, কিন্তু আমদানী লবঙ্গের অনুরূপ পুষ্প লাভের আশা সুসিদ্ধ হয় নাই। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক ধনীলোকের বাগানে সখ করিয়া বাগান সাজাইবার উদ্দেশ্যে ইহার বৃক্ষ রোপিত হইয়া থাকে। বৃক্ষগুলি বার চৌদ্দ হাত উচ্চ ও সতেজ হয়। বাকস পত্রের সহিত ইহার পত্রের আকৃতিগত কতক সাদৃশ্য আছে। পত্র মর্দ্দন করিলে লবঙ্গের গন্ধও অনুভূত হয়। যাহাহউক যখন এই বৃক্ষ উদ্যানে রোপণ করিতে সকলে যাত্নিক তখন যেরূপে ইহা জন্মাইতে হয়, তাহা উল্লেখ করা অসঙ্গত নহে।

গুলকলমে চারা প্রস্তুত করিতে হয়, তোলা মাটিতে গাছ ভাল জন্মে, মৃত্তিকার সহিত উদ্ভিজ্জসার বা প্রাণিসার মিশ্রিত করিয়া চারা রোপণ করিলে গাছের অত্যন্ত তেজ হয়। শরতের প্রারম্ভে চারা রোপণ করা ভাল। গাছের গোড়া পরিষ্কৃত রাখিবে এবং শীতকালে গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া সার মিশ্রিত নূতন মৃত্তিকা দ্বারা গোড়া ঢাকিয়া দিবে। লবঙ্গের যেরূপ গুণ এবং এদেশে উহার যেরূপ প্রচুর ব্যবহার তাহাতে বৃক্ষগুলি প্রকৃত পুষ্পশালী হইলে উহার চাষ যে অত্যন্ত লাভজনক হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

দারুচিনী।

দারুচিনী একজাতীয় বৃক্ষের বল্কল। ভারতসাগরীয় দ্বীপশ্রেণী হইতে উহা ও এদেশে আমদানী হয়। দারুচিনী বৃক্ষ এদেশে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু আমদানী দারুচিনীর ন্যায় তাহা হইতে বল্কল সংগৃহীত হয় না। সুতরাং ইহাও উদ্যানের শোভা বর্দ্ধক সখের গাছ। ইহার চারা রোপণ প্রণালী লবঙ্গ বৃক্ষের ন্যায়। কবাবচিনীর চারার সহিত ইহার শাখায় যোড় কলম বান্ধিয়া চারা প্রস্তুত হয়। এই বৃক্ষের আকার খুব বড় এবং দেখিতে সুন্দর হয়।

কবাবচিনী।

বীজ রোপণ করিলে ইহার চারা জন্মে। সারমিশ্রিত ঝুরা দো-আঁশ মাটি ইহার পক্ষে উপযোগী। ইহার ফল গোলমরিচের ন্যায় ক্ষুদ্র ও গোল, ঔষধের জন্যই তাহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এদেশে এই গাছ ভালরূপ জন্মিতে পারে।

সেগুণ।

সেগুণ আমাদের যেরূপ প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ তাহা সকলেই অবগত আছেন, আ'জ কা'ল এই কাষ্ঠেই কড়ি, বরগা, কপাট, চৌকাট, দরজা, জানালা, বাক্স, আলমেরা, প্রভৃতি অধিকাংশ দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। এই কাষ্ঠের বিশেষ গুণ এই, ইহা শক্ত, টেকসহি অথচ হাল্কা এবং ইহা দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যগুলি অত্যন্ত পরিষ্কৃত হয়। এই সকল কারণে সেগুণ উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ বলিয়া গণ্য। এই মূল্যবান বৃক্ষ বঙ্গদেশের মৃত্তিকায় উত্তমরূপে উৎপন্ন ও বৃদ্ধিশীল হইতে পারে। ইহার আবাদ কিরূপ লাভজনক যাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক এই প্রস্তাব পাঠ করিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। এরূপ লাভজনক বৃক্ষের দুই

একটি উদ্যানে রোপিত হউক, এই অভিপ্রায়ে ইহার বিবরণ পাঠক-বর্গকে অবগত করান আমাদের বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের ইচ্ছা যাঁহাদের সাধ্য ও চেষ্টা আছে, তাঁহারা বিস্তৃতরূপে সেগুণের আবাদ করুন; তাহা হইলে নিশ্চয়ই বড় মানুষ হইতে পারিবেন। জমি-দারেরা মনোযোগ করিলে সেগুণের আবাদ করিয়া জমিদারীর আয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। তাঁহাদের দ্বারা বাহুল্যরূপে ইহার চাষ হইতে পারে।

কার্ত্তিকমাসে সেগুণের ফল সুপক্ক হয়। প্রত্যেক ফলে আটটী করিয়া বীজ থাকে। এই সময়ে বীজ সংগ্রহ করিয়া বর্ষার প্রারম্ভে রোপণ করিতে হয়। চারা বাহির হইতে অনেক বিলম্ব হইয়া থাকে। এক মাসের কমে চারা জন্মে না; কখন কখন দেড় বৎসর পরেও অঙ্কুর জন্মিতে দেখা গিয়াছে। অতএব শীঘ্র শীঘ্র অঙ্কুর না জন্মিলে, বীজগুলি অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া তাহা তুলিয়া ফেলা কিম্বা তথায় অন্য কোন বীজ বা চারা রোপণ করা কর্ত্তব্য নহে। বীজ রোপণ করিয়া অন্ততঃ এক বৎসর অপেক্ষা করিয়া দেখা উচিত। বীজ রোপণ নিমিত্ত কোন স্থান উত্তমরূপ খুঁড়িয়া তাহাতে দুই অঙ্গুলি অন্তর বীজগুলি বসাইবে। পরে আধ অঙ্গুলি পুরু মৃত্তিকা উপরে ছড়াইয়া বীজ গুলি ঢাকিয়া দিবে এবং তদুপরি পচা ঘাস বা উলু বিছাইয়া আবশ্যক মত এরূপ জল দিবে যে মৃত্তিকা সর্ব্বদা সরস থাকে। ঐ স্থানে রৌদ্র না লাগে এজন্য উপরে আচ্ছা-দন রাখিয়া ছায়া করিয়া দিবে।

বীজ হইতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্কুর বহির্গত হয় এবং অল্প কালের মধ্যে তাহা বাড়িয়া উঠে। চারাগুলি দুই অঙ্গুল বড় হইলে তুলিয়া অন্য স্থানে আট অঙ্গুলি অন্তর রোপণ করিবে এবং বৎসরাধিক তথায় রাখিয়া বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে স্থায়ী রূপে চারা গুলিকে উপযুক্ত স্থানে রোপণ করিবে। যে জমি বর্ষার জলে প্লাবিত হয় বা যে স্থানের মৃত্তিকা অত্যন্ত রসাল সেরূপ স্থানে চারা রোপণ করিবে না। চারা রোপণ করিয়া প্রথম বৎসর শুকার সময় অল্প

অল্প জল দিবে। চারার গোড়ায় কোন প্রকার ঘাস, খড় জন্মিতে দিবে না। ডাক্তার রাক্সবরা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, যৎসামান্য তদারকে কলিকাতার চতুর্দ্দিকে এই গাছ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। চারাগুলি ভাল স্থানে রোপিত হইলে ছয় মাস তদারকের পর আর তাহাদের প্রতি তাদৃশ সতর্কতার আবশ্যক হয় না। উর্ব্বরা ভূমি হইলে দেড় বৎসরের মধ্যে চারাগুলি ছয় সাত হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়।

সেগুণ গাছ স্বভাবতঃ সরল হয়; এজন্য চারাগুলি বেশী অন্তরে রোপণ অনাবশ্যক। ডাক্তার রাক্সবরা বলেন, পাঁচ পাঁচটী চারা লইয়া ছয় সাত হাত অন্তরে রোপণ করিবে যে, মধ্যে একটী ও তাহার চারিদিকে চারিটী থাকে। এই প্রকারে রোপিত হইলে ঝড় বাতাসে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতে পারে এবং গাছগুলি অধিক সরল হইয়া উঠে। উত্তর পশ্চিমের বায়ু চারার পক্ষে অনিষ্টকারী; রোপণের এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে তাহার অপকারিতা হইতেও অনেক পরিমাণে রক্ষা পায়।

চারাগুলি বাড়িয়া উঠিলে, কতক গাছ কাটিয়া ফেলিতে হয়। সেই সকল কর্ত্তিত বৃক্ষের কাষ্ঠ বৃথা নষ্ট হয় না, অনেক কর্ম্মে লাগে। এদেশে সেগুণের বীজ প্রচুর পাওয়া যায়। এক শত বিঘা সেগুণের চাষ করিতে পারিলে, একটী ক্ষুদ্র জমীদারীর সমান আয় হইতে পারে। যদি ছয় হাত অন্তর পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পাঁচ পাঁচটি চারা রোপণ করা যায়, তাহা হইলে এক বিঘা জমিতে প্রায় দেড়শত গাছ জন্মিতে পারে। প্রথম বৎসর ঐ সকল গাছের অর্দ্ধেক কাটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য; কারণ তাহা না করিলে, অবশিষ্ট বৃক্ষগুলি বৃদ্ধির নিমিত্ত স্থান পায় না। তখন ঐ কর্ত্তিত গাছের এক একটা এক এক টাকায় বিক্রয় হইতে পারে। অনন্তর দশ বৎসর পর হইতে বিশ বৎসরের মধ্যে অবশিষ্ট গাছের অর্দ্ধেক ছেদন করিতে হইবে; কারণ তাহা না করিলে তদবশিষ্ট বৃক্ষ সকল যথেষ্ট স্থানাভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে না, কিন্তু তৎকালে ঐ সকল বৃক্ষের এক একটা চারি টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে।

, ত্রিশ বৎসরের পর পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তদবশিষ্ট গাছেরও অর্দ্ধাংশ, কাটিয়া ফেলিবে। তাহা হইলে প্রথম রোপিত চারার অষ্টমাংশ মাত্র শেষে অবশিষ্ট থাকিবে এবং তখন তাহারা প্রচুর স্থান পাইয়া উত্তম বৃদ্ধিশীল হইতে পারিবে। এই শেষের কর্ত্তিত বৃক্ষ-গুলির এক একটা আট টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। যে গাছগুলি বৃদ্ধির জন্য অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার এক একটা ন্যূনকল্পে ৩০৲ টাকা করিয়া বিক্রয় হইবে। বিবিধ কার্য্যে এদেশে সেগুণ কাষ্ঠের প্রয়োজন যেরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে কাষ্ঠের মূল্য হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হওয়ারই সম্ভাবনা। ডাক্তার রাক্সবরা এক বিঘা জমির উৎপন্ন বৃক্ষের সংখ্যা ও মূল্য উভয়ই অতি কম ধরিয়া, ত্রিশ বৎসরে যে লাভ হইতে পারে, তাহার হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে তাহা প্রকাশ করা গেল। তিনি এক বিঘা জমির উৎপন্ন গাছের সংখ্যা ১৫০ না ধরিয়া ১৪৪টী ধরিয়াছেন এবং শেষের বৃক্ষগুলির মূল্য সম্ভাবিত ৩০৲ স্থলে ২০৲ টাকা ধরিয়াছেন।

প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে ১৭০টী গাছ কাটিতে হইবে তাহার মূল্য এক এক টাকার হিসাবে ... ... ১৭০৲

দ্বিতীয় দশ বৎসরের মধ্যে ৮৫টী গাছ কাটিতে হইবে, তাহার মূল্য চারি টাকার হিসাবে ... ... ৩৪০৲

তদনন্তর পাঁচ বৎসর পরে ৪৩টী গাছ কাটিতে হইবে, তাহার মূল্য আট টাকার হিসাবে ... ... ৩৪৪৲

অবশেষে ত্রিশ বৎসর পরে অবশিষ্ট ৪২টী গাছ ন্যূনকল্পে কুড়ি টাকার হিসাবে বিক্রীত হইলে ... ... ৮৪০৲

অতএব এক বিঘা ভূমি হইতে ত্রিশ বৎসর পরে লাভ ... ১৬৯৪৲

কেবল গুঁড়ি বিক্রয় করিয়া উক্ত প্রকার লাভ হইবে, তদ্ভিন্ন গাছের বৃহৎ বৃহৎ শাখা অনেক কর্ম্মে লাগে বলিয়া তাহা বিক্রয়েও অনেক আয় হইতে পারে। উক্ত ১৬৯৪৲ টাকা হইতে ত্রিশ বৎসরের ভূমির খাজনা ও প্রথম কয়েক বৎসর তত্ত্বাবধারণের খরচ বাদ পড়িবেক।

জমির খাজনা উর্দ্ধ সংখ্যা বিঘা প্রতি তিন টাকা ধরিলে ত্রিশ বৎসরে এক বিঘার খাজনা ... ... ৯০৲

চারা রোপণ ও বেড়া দেওনের খরচা অনুমান ... ... ২০৲

প্রথম পাঁচ বৎসর তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত এক জন লোকের বেতন বার্ষিক ৩৬৲ হিসাবে ... ... ১৮০৲

তদনন্তর ২৫ বৎসর এক ব্যক্তি তিন বিঘা জমির গাছ তদারক করিতে পারে; সুতরাং বৎসরে ৩৬৲ টাকা বেতন হইলে প্রতি বিঘার নিমিত্ত তাহার বেতন ১২৲ টাকা ধর্ত্তব্য; অতএব ২৫বৎসরের বেতন ... ... ৩০০৲

অতএব এক বিঘা ভূমির নিমিত্ত ত্রিশ বৎসরে সমুদায় খরচ ৫৯০৲

সেগুণের চারা যাবৎ ছোট থাকে, তাবৎ তাহাদের মধ্যে মধ্যে আলু বেগুন প্রভৃতি রোপণ করা যাইতে পারে, তাহাতে যে আয় হয়, তদ্দ্বারা ঐ সময়ে গাছের প্রতি পরিশ্রমের বেতন পোষাইবার সম্ভব। গবাদি পশুতে চারাগুলি নষ্ট না করে এজন্য চারার অবস্থায় বেড়া দিয়া রাখিতে হয়। সেগুণ গাছ ত্রিশ বৎসরের বেশী সময় বাঁচে। ফলতঃ বয়োবৃদ্ধি অনুসারে যেমন বৃক্ষ বৃদ্ধি পাইবে, মূল্যও সেইরূপ অধিক হইবে।

বাবলা।

বাবলার কাষ্ঠ অত্যন্ত শক্ত এবং টেকসহি, এজন্য আজ কাল ইহা অনেক কাজে লাগিতেছে, গাছের দরও তাহাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে আমরা সঞ্জীবনী পত্রিকা পাঠে ইহার কয়েকটি নূতন গুণের বিষয় অবগত হইয়া তাহাও এই প্রস্তাবের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছি। এই কাষ্ঠে গাড়ির চাকা, ঢেঁকি, লাঙ্গলের বাঁট, রেলওয়ে পাতিবার স্লিপারকাঠ, বরগা, নৌকার অনেক প্রয়োজনীয় গড়ন, কামান বহণের গাড়ি, আকমাড়া কল, ঘানিগাছ, প্রভৃতি অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। বাবলার পরিষ্কৃত আটা আরবিক গঁদের পরিবর্ত্তে

অনেক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে বৃক্ষের গাত্রে এক বা দেড় অঙ্গুল গভীর গর্ত্ত করিয়া দিলে, ঐ আটা বহির্গত হইয়া সূর্য্যোত্তাপে জমাট বাঁধে। কফ, বাত, মেহ ও বহুমূত্র রোগে বাবলার লাল রঙ্গের আটা বিশেষ উপকারী। কালী ও নানা প্রকার রং প্রস্তুত করিবার জন্য ইহা বিস্তর আবশ্যক। চামড়া রং করিতে বাবলার ছাল প্রচুর প্রয়োজন হয়। সঞ্জীবনী পত্রিকায় উল্লিখিত হইয়াছে, ডাক্তার ম্যাক্‌ক্যান সাহেব লিখিয়াছেন, মেদিনীপুরে বাবলা ছালকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটে এবং তাহা /২॥ আড়াই সের জলে সিদ্ধ করিয়া /১॥ সের থাকিতে নামায়, জল শীতল হইলে তাহাতে আধ তোলা ফট্‌কিরির গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার রং প্রস্তুত করে, এই রঙ্গে কোন কাপড় তিন বার ভিজাইয়া তিন বার শুষ্ক করিলে ঘোর পাটকিলে রং হয়। ঢাকাতে এই জলে একটু হীরাকষ মিশাইয়া একরূপ মাঝারি গোছের পাকা রং প্রস্তুত করে। বাবলার ছালে চামড়ায় উত্তম রং হয় বলিয়া সাহেবেরা ঐ ছাল বিলাতে চালান দিয়া উৎকৃষ্ট প্রণালীতে আরও উত্তম রকমের রং করার চেষ্টায় আছেন।

ইহার চাষ অতি সামান্য, বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই এই গাছ জন্মিতে পারে। জমি একবার কোদলাইয়া বীজ ছড়াইয়া দিলেই আট দশ দিনের মধ্যে চারা বাহির হয়। বর্ষাকালে বীজ ছড়াইতে হয়। চারাগুলি একটু বড় হইলে গায়ে কাঁটা বাহির হয়, তখন আর তাহাদিগকে কোন পশুতে নষ্ট করিতে পারে না। বিনা ব্যয়ে ও বিনা পরিশ্রমে এমন লাভজনক সহজ কৃষিতে প্রবৃত্ত থাকা সকলের কর্ত্তব্য। আমরা পল্লিগ্রামে বিস্তর পতিত জমি দেখি; যদি অন্ততঃ তাহার অধিকারীগণও আলস্য পরিত্যাগ করিয়া ইহার বীজ ছড়াইয়া রাখেন, তাহা হইলে তাহারা বিলক্ষণ আয়বান হইতে পারেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়েকোম্পানি রাস্তার ধারে তাঁহাদের যে যায়গা আছে, তাহাতে এই গাছ জন্মাইয়া বিস্তর আয় করিতেছেন। ফলতঃ যে লাভজনক কার্য্যে যত্ন, পরিশ্রম ও

ব্যয় কিছুই নাই, তাহাও যদি উপেক্ষিত হয়, তবে দেশের লক্ষ্মী কিসে থাকিবে বলিতে পারি না।

পুষ্পোদ্যান।

গোলাপ।

গোলাপের যেমন মনোহর রূপ তেমনি সুগন্ধ, এই জন্যই ইহার আদর বেশী। ইহাকে পুষ্পরাজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে গোলাপের উল্লেখ দেখা যায় না; তাহার কারণ ইহা এদেশের ফুল নহে; যবনদিগের অধিকারকালে তুরস্ক প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছে। এখন এদেশে অসংখ্য জাতীয় গোলাপ দৃষ্ট হয়। চাষের পারিপাট্যে এই ফুলের বিলক্ষণ উন্নতিও হইয়াছে। কিন্তু তাহার সকলগুলিতে গন্ধ নাই। সুগন্ধি ফুলগুলির বিশেষ গুণ এই, প্রস্ফুটনান্তে শুকাইয়া গেলেও তাহা গন্ধ শূন্য হয় না। গোলাপজল ও গোলাপের আতর ব্যবহার্য্য যাবতীয় সুগন্ধি পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নিম্নে প্রধান কয়েক জাতীয় গোলাপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) মেরিরেডি—গোলাপের মধ্যে এই জাতির আকার খুব বড়; বর্ণ লাল কিন্তু গাঢ় লাল নহে। প্রস্ফুটিত ফুল দেখিতে অতি সুন্দর এবং তাহা গন্ধময়।

(২) লাফ্রাঙ্ক—ইহা মেরিরেডি অপেক্ষা আকারে কিঞ্চিৎ ছোট হইলেও প্রস্ফুটিত ফুলগুলি স্থলপদ্মের ন্যায় বড়। মেরিরেডি অপেক্ষা ইহাতে অনেক দল হয়। পাপড়িগুলি লালের আভাবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণে ভূষিত; দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনি গন্ধময়।

(৩) মার্শেলনীল—ইহার আকার বড় কিন্তু গন্ধ তত ব্যাপক নহে, বর্ণ পাটকিলে, অনেক দল হয়, দেখিতে অতি সুশ্রী।

(৪) পল-লিরণ—ইহার আকার বড়; গন্ধব্যাপক; দল অনেক; বর্ণ গোলাপী, প্রস্ফুটিত ফুলের শোভা অতি মনোহর।

(৫) প্লিটিনডিনকিনক্লিন—ইহার পাপড়িগুলি গাঢ় লালবর্ণে শোভিত; আকার মধ্যমরূপ; দল অনেক; ব্যাপক গন্ধবিশিষ্ট; সকল ঋতুতেই ইহার ফুল প্রস্ফুটিত হয়। প্রফুল্ল ফুলের সৌন্দর্য্যে উদ্যান অনুপম শোভা ধারণ করে।

(৬) সন্‌ব্রিয়েল—ইহার আকার মধ্যমরূপ; বর্ণ শ্বেত; দল অনেক; গন্ধ মৃদু; প্রস্ফুটিত ফুলের অতিশয় সৌন্দর্য্য।

(৭) সলফেটিয়া—ইহার বর্ণ সাদা; দল নিতান্ত কম নহে; গন্ধ মৃদু; আকার মধ্যমরূপ ও দেখিতে সুন্দর।

নিম্ন শ্রেণীস্থ গোলাপের শাখা কলমে চারা প্রস্তুত হয় কিন্তু উৎকৃষ্ট জাতীয় গোলাপের পক্ষে যোড়কলমই প্রশস্ত। এক শ্রেণীস্থ গোলাপের বৃক্ষে ভিন্ন শ্রেণীস্থ গোলাপের চোক বসাইয়া, এক গাছে নানাপ্রকার ফুল ফুঠান যাইতে পারে। এই সকল কলম করিবার নিয়ম পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

কার্ত্তিক মাসেই গোলাপের পাইট বেশী। এই সময়ে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া সার দিতে হয় ও পুরাতন নিস্তেজ শাখা সকল ছাটিয়া ফেলিতে হয়। বর্ষাকালে ডাল কাটিলে সেইস্থান পচিতে আরম্ভ করে। ইহার কলমে চারা প্রস্তুতও কার্ত্তিক মাসেই করিতে হয়। যে যে জাতির গাছ বড় হয়, তাহাদিগকে টবে না রাখিয়া জমিতে রোপণ করিবে। যাহাদের গাছ তত বড় নয়, জমিতে না পুতিয়া ইচ্ছা হইলে তাহাদিগকে টবে রাখা যাইতে পারে। গোলাপের জন্য বড় টব হওয়া উচিত। টবের গাছে সর্ব্বদা জল সেচন আবশ্যক এবং প্রতি বৎসর টবের মাটি ঝাড়িয়া সার বিশিষ্ট নূতন মাটি দেওয়া কর্ত্তব্য।

গোবরের তরল সার, মেষ, ছাগ, অশ্ব, কুক্কুট, হংস প্রভৃতির বিষ্ঠার সার অথবা পচামাছের সার ও খৈল গোলাপের পক্ষে উৎ-কৃষ্ট। জমিতে চারা রোপণ করিতে হইলে, মৃত্তিকা উত্তমরূপে

খুঁড়িয়া তাহাতে সার মিশাইবে এবং চারা রোপণের পর যাবৎ ঐ স্থানে শিকড় না লাগে তাবৎ প্রতিদিন বৈকালে জল সেচন করিবে।

য়্যাষ্টার।

য়্যাষ্টার অতি মনোহর পুষ্প। এদেশের চন্দ্রমল্লিকার সহিত এই ফুলের আকৃতিগত অনেক ঐক্য আছে। ফুল ফুটিয়া অনেক-দিন গাছে থাকে; তখন গাছের বড়ই শোভা হয়। ইহার নানা-জাতি আছে; তন্মধ্যে জর্ম্মণ ও চীনের য়্যাষ্টারই এদেশে অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয়। কার্ত্তিক মাসের প্রথমে চারা উৎপাদন জন্য টবে বীজ রোপণ করিবে। দো-আঁশ মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে তিন ভাগের এক ভাগ পাতার সার মিশাইয়া তদ্দ্বারা টব পূর্ণ করিবে এবং তদুপরি বীজ বপন করিয়া পাতলারূপে ধূলা ছড়াইয়া বীজগুলি ঢাকিয়া দিবে। অনন্তর সূক্ষ্ম ধারায় অল্প পরিমাণে এরূপ জল সেচন করিবে, যেন বীজগুলি বাহির হইয়া না পড়ে, অথচ মৃত্তিকা সরস হয়। জল প্রদানের অসতর্কতায় অনেক সময়ে এই বীজের অঙ্কুরোৎপত্তির ব্যাঘাত হইয়া থাকে। এজন্য কাহারও মত এই যে, উত্তম চূর্ণিত দো-আঁশ মাটিতে জল দিয়া কাদার মত করিবে এবং এই কাদাদ্বারা টবের তিন অংশ পূর্ণকরতঃ তদুপরি পাঁচ ছয় অঙ্গুল পুরু করিয়া ধূলার ন্যায় চূর্ণ দো-আঁশ মাটি ও পাতার সার এক সঙ্গে মিশাইয়া সেই মৃত্তিকা ছড়াইবে; অনন্তর বীজ বপন করিয়া পাতলারূপে ধূলা ছড়াইয়া বীজগুলি ঢাকিয়া দিবে। টবের নীচে কাদার ন্যায় মৃত্তিকা থাকায় সেই আর্দ্রতায় উপরের মৃত্তিকাও সরস হইয়া উঠিবে এবং ঐ সরস মৃত্তিকা শীঘ্র শুষ্ক হইতে না পারে এজন্য টবের উপরে উলু-খড় ছড়াইয়া রাখিবে। ক্ষুদ্রাকৃতির অনেক বীজের পক্ষে এই নিয়ম উৎকৃষ্ট। কারণ এইরূপে বীজ বপন করিলে, দুই তিন দিন জল প্রদানের আবশ্যক হয় না; পরে একদিন অন্তর একদিন উলু-

খড়ের উপর সূক্ষ্ম ধারায় জল দিলেই হয়। উলুখড় থাকায় জল সেচনে বীজের উপরের মাটি সরিয়া বীজগুলি বাহির হইয়া পড়ে না। বিশেষতঃ আলোক অপেক্ষা অন্ধকারে অঙ্কুরোৎপাদন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় বলিয়া, উলুখড়ের আবরণ সে বিষয়েও সাহায্য করে কিন্তু অঙ্কুর জন্মিলেই উলুখড়গুলি সরাইয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

চারার প্রথমাবস্থায় বেশী রৌদ্র না লাগে এরূপস্থানে টবগুলি রাখিবে। ঘরের বারাণ্ডায় রাখিলে এই উদ্দেশ্য সকল সফল হইতে পারে, অথচ রাত্রিতে শিশির প্রাপ্তির বাধা হয় না। এই গাছ টবেই ভাল হয়, এজন্য চারা একটু বড় হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ সার-মিশ্রিত মৃত্তিকাপূর্ণ অন্য টবে নাড়িয়া বসাইবে। টব বড় না হইলে, একটবে একটীর অধিক গাছ রাখিবে না। গোড়ার মাটি সরস রাখিবার জন্য প্রতিদিন জল সেচন করিবে এবং মধ্যে মধ্যে তরল সার দিবে। শিকড় না কাটে এরূপ সাবধান হইয়া সময়ে সময়ে গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দিবে। যদি ফুল বেশী বড় ও সুন্দর করিবার ইচ্ছা হয়, তবে এক একটী গাছে তিন চারিটী ভাল কুঁড়ি রাখিয়া আর সব ভাঙ্গিয়া দিবে, অন্যথা ভাঙ্গিবার আবশ্যক নাই।

ডিয়ান্থস্।

ডিয়ান্থস্ ফুলের আকৃতি ছোট কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর। যখন উদ্যানের কোন স্থানে চৌকার মধ্যে ছোট গাছগুলিতে রক্তবর্ণ ফুলগুলি ফুটিয়া থাকে, তখন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। অন্যান্য বৈদেশিক ঋতুপুষ্পের বীজের সহিত ডিয়ান্থসের বীজ এদেশে ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে আমদানী হইয়া থাকে। আশ্বিনের শেষ বা কার্ত্তিকের প্রথম বীজ বপনের উপযুক্ত সময়; যে দো-আঁশ মাটিতে বালির অংশ অধিক তাহা ইহার পক্ষে উপযোগী। ইহার চারা জন্মান সহজ। মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে কিছু সার মিশাইবে; অনন্তর বীজ বপন করিয়া প্রতিদিন সরু ধারায়

জল সেচন করিবে। চারা বড় হইয়া উঠিলে মধ্যে মধ্যে নীড়ান-দ্বারা সাবধানে গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দিবে। এতদ্ভিন্ন ইহার অন্য কোন পাইট নাই।

গেইলার্ডিয়া।

গেইলার্ডিয়া সূর্য্যমুখী ফুলের ন্যায় সুন্দর ফুল। রক্ত, পীত ও বেগুণে এই তিন বর্ণের গেইলার্ডিয়া সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গাছ ঝাড়াল হয় এবং এক এক গাছে অনেকগুলি ফুল ফোটে। প্রস্ফুটিত ফুল অনেকদিন গাছে থাকে। যে স্থানের মৃত্তিকায় এটেল অপেক্ষা বালির অংশ বেশী তথায় এই গাছ ভাল জন্মে। ভেড়া, গরু বা কুক্কুটাদি পক্ষীর বিষ্ঠার সার মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া মৃত্তিকা উত্তমরূপে গুঁড়া করিবে। পরে তদ্দ্বারা টব পূর্ণ করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিবে। রোপিত বীজের উপর ধূলীবৎ চূর্ণ মৃত্তিকা পাতলারূপে ছড়াইয়া বীজগুলি ঢাকিয়া দিবে। মৃত্তিকা সরস রাখিবার জন্য বীজ বপনের পরদিন হইতে সূক্ষ্ম ধারায় অল্প অল্প জল সেচন করিবে। অধিক রৌদ্র না লাগে অথচ রাত্রিতে শিশির লাগিতে পারে এরূপ স্থানে টব রাখিয়া দিবে। চারা একটু বড় হইয়া উঠিলে, তুলিয়া অন্য টবে বা জমিতে রোপণ করিবে কিন্তু সেই টব বা জমির মৃত্তিকাও উত্তম পাইট আবশ্যক, অর্থাৎ যেরূপ মৃত্তিকায় বীজ বপনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, চারা নাড়িয়া পুতিবার সময়েও সেই প্রকার মৃত্তিকা হওয়া চাই। সসার চূর্ণিত মৃত্তিকা ভিন্ন ইহার গাছে তেজ থাকে না এবং ফুল ভাল হয় না। শীতের প্রারম্ভে বীজ বপন করিবে।

প্যানসী।

প্যানসীর সৌন্দর্য্য বড় চমৎকার। প্রস্ফুটিত প্যানসী দেখিলে হৃদয়ে অনুপম সুখ অনুভব হয়, এজন্য ইংরেজিতে ইহাকে "হার্টস্-

ইজ” পুষ্প কহে। বিভিন্ন বর্ণের নানাপ্রকার প্যানসী দেখা যায়। এদেশে শীতকালে ইহার গাছ জন্মে। শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে টবে বীজ রোপণ করিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হয়। চারা প্রস্তুত প্রণালী অবিকল য়্যাষ্টরের ন্যায়। যাবৎ রোপণের সময় উপস্থিত না হইবে তাবৎ বীজের মোড়ক গুলি খুব যত্নপূর্ব্বক তুলার মধ্যে করিয়া বাক্সে বদ্ধ রাখিতে হয়। কারণ শীতল বাতাস লাগিলে বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

টবেই ইহার গাছ ভালরূপ হইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় চারা প্রখর রৌদ্র সহ্য করিতে পারে না। বৃষ্টির জল ইহার পক্ষে বড় অপকারী, এজন্য কোন দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিলে চারার টব-গুলি কোন আচ্ছাদনবিশিষ্ট স্থানে তুলিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

কেমেলিয়া।

কেমেলিয়ার গাছ ও ফুল উভয়ই মনোজ্ঞ। বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য স্থানে এই গাছ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লইয়া যাইতে হইলে কাচ নির্ম্মিত পাত্রের মধ্যে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। শীতের শেষে ইহার পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। যখন ফুলের কুঁড়ি হয় অথচ ফুল ফুটিতে বিলম্ব থাকে, তখন গাছের গোড়ায় উত্তম গোবরের সার দিলে গাছের তেজ বৃদ্ধি করে এবং ফুল ভাল হয়। ফুল ফুটিবার সময় পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জলসিঞ্চন আব-শ্যক। ফুলের কুঁড়ি জন্মিলে, খোলা যায়গায় গাছগুলি রাখিবে কিন্তু যেন অতিরিক্ত বৃষ্টি না পায়।

এমারন্থস্।

এই গাছের পাতা অতি সুন্দর এবং নানা রঙ্গে রঞ্জিত। অন্য ফুলগাছের কেয়ারির ধারে এই গাছ রোপণ করিলে বড় সুন্দর

শোভা হয়। এমারান্থসের অনেক জাতি আছে। সকল জাতিই সুশ্রী। আষাঢ় মাসে সারমৃত্তিকা পূর্ণ টবে বা বাক্সে বীজ বপন করিয়া অল্প ঝুরা মৃত্তিকা ছড়াইয়া বীজগুলি ঢাকিয়া দিতে হয়। বীজ বপনের পূর্ব্বে মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ধূলার মত করিবে ও তাহাতে জলসিঞ্চন করিবে। চারা দুই তিন অঙ্গুল বড় হইলে, এক একটী চারা পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে রোপণ করিবে। প্রিন্সেস্ ফেদার এবং লভলাইস ব্লিডিং এই দুই জাতি অতিশয় প্রসিদ্ধ। এট্রোপারপরিয়স্ জাতির ফুল অতিশয় উজ্জ্বল এবং এত অধিক পরিমাণে ফোটে যে, দেখিলে বোধ হয় যেন খৈ ছড়ান রহিয়াছে। বাই-কলার জাতির পাতা বর্ষাফলকের ন্যায় সরু এবং লম্বা; পাতার গোড়া গাঢ় বেগুণে এবং অগ্রভাগ রক্তবর্ণ। সেলেসি ফেলিয়স্ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর; ইহার আকার স্তম্ভের ন্যায়, নীচের পাতা মাটিতে লুটাইয়া পড়ে, পত্রগুলি অত্যন্ত লম্বা, ঢেউ-খেলান এবং দেখিতে অতিশয় সুন্দর ও উজ্জ্বল; কোন পাতার রং সবুজ, কোনটা উজ্জ্বল লাল, কোনটা বা কমলালেবুর রঙ্গের মত, কোনটার রং কটা। ঝোপের ন্যায় গাছগুলি ঝরণার আকার ধারণ করে সুতরাং কি চমৎকার দৃশ্য হয়, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না।

লভেলিয়া।

লভেলিয়ার অনেক জাতি আছে; সকল জাতিই দেখিতে সুন্দর। ফুলের চৌকার ধারে ধারে এই গাছ থাকিলে, বড় সুন্দর শোভা হয়। বীজ বপন করিয়া জলপূর্ণ গাম্‌লা বা অন্য কোন পাত্রের মধ্যে সেই টব বসাইয়া রাখিবে। কিছুদিন এইরূপে রাখিলেই ছোট ছোট চারা জন্মিবে। যে পাত্রের মধ্যে টব বসাইয়া রাখিবে, তাহাতে জল না থাকিলে, চারা শুকাইয়া যাইবে। নীল,

গাঢ়নীল, বেগুণে ও গাঢ় লাল প্রভৃতি রঙ্গের লভেলিয়ার জাতিগুলি অতি চমৎকার দৃশ্য।

ডেয়েসি।

কার্ত্তিক মাসে ঝুরা মাটি-বিশিষ্ট সার জমিতে অথবা বাক্সে ইহার শিকড় পুতিলে অথবা বীজ রোপণ করিলে চারা জন্মে। গাছ বাড়িয়া উঠিলে তুলিয়া অন্যস্থানে রোপণ করিবে। শিকড় দ্বারা গাছ জন্মাইতে হইলে, শিকড়গুলি ছোট ছোট করিয়া কাটিবে এবং শ্রেণীবদ্ধরূপে ফুলের কেয়ারির ধারে ধারে রোপণ করিবে। বর্ষা-কালে চারাগুলি টবে তুলিয়া বেশী বৃষ্টি না লাগে এরূপ আচ্ছাদন বিশিষ্ট স্থানের নীচে রাখিবে এবং বর্ষান্তে খোলা জমিতে যথাস্থানে রোপণ করিবে। এই গাছ পুনঃ পুনঃ তুলিয়া বসাইলে ভাল হয়।

কার্ণেসনস্।

কার্ণেস্নস্ ফুল অতি সুন্দর। কোন বাক্স বা টব সার মিশ্রিত বেলে মাটিদ্বারা পূর্ণ করিয়া কার্ত্তিকমাসে ইহার বীজ বপন করিবে। চৈত্র মাসে ফুলের কেয়ারির ধারে বা অন্য টবে চারা তুলিয়া বসা-ইবে। গোড়ায় জল না-বাধে, এজন্য গোড়ার মাটি কিছু উচ্চ করিয়া দিবে। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এই ভাবে রাখিয়া কার্ত্তিক মাস উপস্থিত হইলে, পচা পাতার সার, গোবরের সার, পাঁক ও বালি সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা টব পূর্ণ করতঃ প্রত্যেক টবে দুই তিনটী করিয়া চারা বসাইবে। অগ্রহায়ণ মাসে নূতন ফেক্ড়ী জন্মিয়া গাছগুলি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে এবং বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিবে। ফুল ফোটার সময় গাছের গোড়ায় অল্প অল্প তরল সার দিবে।

ক্রাইষ্টেন থেমম্।

ইহার বীজ অথবা ডাল পুতিয়া চারা জন্মাইতে হয়। চারা গুলি সার বিশিষ্ট মৃত্তিকায় রোপণ করা কর্ত্তব্য। চারা পুনঃ পুনঃ নাড়িয়া পুতিলে ফুল ভাল হয়। ফুল ফুটিবার পর, পুরাতন গাছ গুলি উঠাইয়া গোড়ার মাটি উত্তমরূপে পরিষ্কার করতঃ মোটা শিকড় গুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে। পরে গোবরের সারবিশিষ্ট মৃত্তিকা দ্বারা টব পূর্ণ করিয়া প্রত্যেক টবে এক এক খণ্ড শিকড় রোপণ করিবে। ফুলের কেয়ারীর ধারের মৃত্তিকায় সার দিয়া ২।৩ অঙ্গুলি অন্তর শিকড়গুলি রোপণ করিয়া জল সেচন করিলে চারা জন্মে। টবে রোপণ করা হইলেও প্রতিদিন জল সেচন করা আবশ্যক। শিকড় হইতে যে সকল ফেকড়ী বহির্গত হইবে, তাহাদিগকে কাটিয়া অন্য স্থানে রোপণপূর্ব্বক জল সেচন করিলেও শিকড়ের ন্যায় ইহার গাছ হয়।

কুঁড়ি হইবার চারি পাঁচ সপ্তাহ অগ্রে, গাছের অগ্রভাগ ছেদন করিয়া দিবে। গাছের ঊর্দ্ধভাগে ৪।৫টী মাত্র শাখা রাখিয়া আর সমুদয় কাটিয়া ফেলিবে। কুঁড়িগুলি উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হইলে কোদাল দিয়া প্রত্যেক গাছের চতুর্দ্দিকের শিকড় কাটিয়া দিবে। ইহার এক সপ্তাহ পরে গাছ তুলিয়া ভিন্ন স্থানে রোপণ করিবে। এরূপ করিলে গাছে প্রচুর ফুল ফুটিবে। প্রবল বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য, উপরে উপযুক্ত আচ্ছাদন রাখা আবশ্যক। ইহার জরদা রঙ্গের ফুলগুলি অতি সুন্দর।

গার্ডিনিয়া ফ্লোরিডা।

ইহা অতি সুন্দর পুষ্প। ফুলগুলির আকৃতি বড়, বর্ণ সাদা এবং গন্ধ উত্তম। ইহার গাছ খুব বড় হয়, কিন্তু ছাটিয়া দিলে তত বড় হইতে পারে না এবং দেখিতে সুন্দর হয়। এই গাছের শাখা

নোয়াইয়া মাটি চাপা দিলে অথবা ডাল কাটিয়া পুতিলে চারা জন্মে। ফাল্গুন মাসে ইহার ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়।

আইপোমিয়া।

এই মনোহর গাছ, লতা জাতীয় যাবতীয় ফুল গাছের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। বর্ষাকালে ইহার বীজ রোপণ করিতে হয়। অল্পদিনের মধ্যে চারা জন্মিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার আশ্রয় জন্য জাফ্‌রি প্রস্তুত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নিকটে কোন বৃক্ষ থাকিলে তদবলম্বনেও ইহা উঠিতে পারে। নীল, লাল, সাদা, গোলাপী ও নানা মিশ্রিত রঙ্গের ফুলবিশিষ্ট ইহার ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে। জাপান দেশীয় আইপোমিয়ার জাতি, নূতন এবং দেখিতে অতি সুন্দর।

জেরানিয়ম্।

জেরানিয়ম্ অতি বিখ্যাত জাতীয় ফুল। বীজ রোপণ করিয়া অথবা শাখা পুতিয়া ইহার চারা জন্মান যাইতে পারে। বিলাতী আমদানী বীজ বর্ষান্তে টব বা বাক্সে রোপণ করিয়া ছায়ায় রাখিবে। ঐ টব বা বাক্সের নীচে দুই বা আড়াই অঙ্গুল কয়লা দিয়া তদুপরে এটেল ও বালিমিশ্রিত মৃত্তিকা দিবে। চারি অঙ্গুল অন্তর একটী বীজ রোপণ করিবে। চারায় ছয়টী পাতা বাহির হইলে শিকড়ে আঘাত না লাগে এরূপ সাবধানে তুলিয়া সারমৃত্তিকা-বিশিষ্ট অন্যস্থানে রোপণ করিবে। ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে গাছে ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়।

ন্যাষ্টার সিয়ম্।

ইহা দুই প্রকার;—প্রথম প্রকার কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও লতানে; ইহারা কোনরূপ আশ্রয় পাইলে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধগামী

হয়। অন্য প্রকার অতি ক্ষুদ্র; পুষ্পবীথিকাতে রোপিত হইয়া যখন বর্দ্ধিত হয়, তখন তাহাদিগকে দেখিতে অতি সুন্দর। কিন্তু যদ্যপি ইহাদের সহিত ডোয়ার্ফ, টম্‌থাম্ব, স্কার্‌লেট এবং ক্রিষ্ট্যালপ্যালেস্‌জেম্‌ প্রভৃতি একত্রে রোপিত ও বর্দ্ধিত করা যায়, তাহা হইলে ইহারা সমধিক মনোহর, হৃদয়গ্রাহী ও নয়ন তৃপ্তিকর হইয়া থাকে।

কার্ত্তিক মাসে ইহার বীজ রোপণ করিবার নিরূপিত সময়। যদ্যপি বীজ অত্যন্ত কঠিন ও শুষ্ক থাকে, তাহা হইলে ঈষৎ উষ্ণ জলে ২।১ ঘণ্টা ভিজাইয়া লইতে হইবে। বীজ রোপণ জন্য অধিক গর্ত্ত করিবার অথবা উপরে অনেক মাটি চাপা দিবার আবশ্যক নাই।

ইহার জন্য জমি অধিক সার-বিশিষ্ট হইবার কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ তাহা হইলে গাছগুলি অস্বাভাবিক পত্রে পরিপূর্ণ হইবে এবং অতি অল্প ফুল ফুটিবে।

ষ্টক্‌।

এম্‌পারার ষ্টক ও টেন্‌-উইক্‌ ষ্টক প্রভৃতি ইহার ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে। বীজ হইতে ইহাদিগকে উৎপন্ন করাই শ্রেয়ঃ। উক্ত দুই জাতির দুইটী গাছ এক সঙ্গে, এক স্থানে, ও এক সময়ে উৎপাদিত করিতে হইলে, বীজগুলি উৎকৃষ্ট ও তাজা হওয়া আবশ্যক। অনেক বহুদর্শী মালীর মত এই;—বীজ প্রথমতঃ কোন মৃৎপাত্রে অর্থাৎ টবে রোপণ করিবে। তৎপরে যখন বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা উৎপন্ন হইবে, তৎকালে ইহাদিগকে বৃহৎ টবে স্থানান্তরিত করিবে। এই শেষোক্ত টবের মাটি বিশেষ সারাল হওয়া আবশ্যক। সাধারণ মালীরা বীজ অঙ্কুরিত হইয়া গাছ উৎপন্ন হইলে, তাহা এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে স্থানান্তরিত করিতে বলে না। তাঁহারা বলে যে, উক্ত প্রণালী অবলম্বন করিলে গাছের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহা সত্য নয়।

সুইট পীজ।

এই জাতীয় পুষ্প অতি সুন্দর। ইহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষিত করিতে হয়। মৃত্তিকা সার-বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। ইহাদের বীজ বৃত্তাকারে রোপণ করিবে। রোপণ করিবার পূর্ব্বে বীজ গুলি জলে ভিজাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। যখন বীজ অঙ্কুরিত হইয়া গাছগুলি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তৎকালে তাহাদের আশ্রয় জন্য চতুষ্পার্শ্বে কাষ্ঠখণ্ড প্রোথিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

পেটুনিয়া।

অল্প উর্ব্বরা জমিতে বীজ রোপণ করিলেই, ইহারা ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। ইউরোপ হইতে তাজা এবং ইহাদের সর্ব্বপ্রকারের মিশ্রিত বীজ আনায়ন করাই কর্ত্তব্য। বীজ কার্ত্তিক মাসে রোপণ করিতে হয় এবং এই সময়েই গাছগুলি পুষ্পিত হইয়া থাকে। অতএব কার্ত্তিক মাসের কিছু পূর্ব্বে বীজ আমদানী হওয়া আবশ্যক। এই জাতীয় যে সকল গাছ বীজ হইতে আপনা আপনি উৎপন্ন হয়, তাহাদের পুষ্প ক্ষুদ্র।

কলম হইতেই উৎকৃষ্ট চারা উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। ইহারা সহজেই টবে, বাসকেটে অথবা পুষ্পবীথিকার ধারে জন্মিয়া থাকে।

পর্টুলাকা।

এই জাতীয় গাছগুলি ভূতলশায়ী হইয়া বর্দ্ধিত হয়। ফুলগুলি উজ্জ্বল, দেখিতে সুন্দর এবং নয়ন তৃপ্তিকর। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে ইহারা উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে টবে রোপণ করিতে হয়। মৃত্তিকা বালিমিশ্রিত হওয়া আবশ্যক। বীজ সম্পূর্ণরূপে বালি অথবা মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করা বিধেয় নহে। যে

টবে বীজ রোপণ করা হয়, তাহার মৃত্তিকা সিক্ত করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ টবটী অন্য এক জলপূর্ণ পাত্রে মগ্ন করিয়া রাখা আবশ্যক, এবং বীজ সম্যকরূপে অঙ্কুরিত হওয়া পর্য্যন্ত কোন আচ্ছাদিত স্থানে রাখিবে। তৎপরে চারা উৎপন্ন হইলে সূর্য্যের উত্তাপে রাখিতে হইবে। যখন গাছগুলি পুষ্পিত হইবে, তখন টবের মাটি উস্‌কাইয়া না দিয়া টবের মাটির উপর পাতলারূপে কিছু চূর্ণ মৃত্তিকা ছড়াইয়া দিবে।

ইহার বৃক্ষচ্যুত বীজ হইতে নিয়মিত সময়ে আপনা হইতেও চারা উৎপন্ন হয়। এই চারা অল্প আয়াসেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া রোপণ করা যাইতে পারে, তাহাতে গাছের বিশেষ ক্ষতি হয় না।

ভারবিনা।

ভারবিনা এক প্রকার সুগন্ধ পত্র বিশিষ্ট মনোহর গাছ। ইহার পত্রের গন্ধ লেবুর ন্যায় এবং অতিশয় প্রমোদকর। পাহাড় অঞ্চলে এই গাছ বড় বড় ঝোপের ন্যায় হইয়া থাকে। বেলেমাটিপূর্ণ টবে ইহার চারা জন্মাইতে হয়। শীতকাল চারা উৎপাদনের প্রকৃত সময়; গ্রীষ্মকালে ছায়ায় এবং শীতকালে যে স্থানে উত্তমরূপে বায়ু সঞ্চালন হয়, অথচ অধিক রৌদ্র না লাগে এরূপ স্থানে টবগুলি রাখিতে হইবে। উত্তমরূপে শিকড় বহির্গত হইলে সার বিশিষ্ট জমিতে চারাগুলি পুতিয়া দিবে। ইহার পাতা অত্যন্ত লম্বা হয় বলিয়া ছাটিয়া দেওয়া ভাল।

এ পর্য্যন্ত যে সকল পুষ্পের বিবরণ লিখিত হইল, তাহার প্রায় সমুদায়ই বিলাতী ফুল। বিলাতী ফুলগুলি দেখিতে অতি সুন্দর, আজ কাল উদ্যান সাজাইবার জন্য অনেকেই বিলাতী ফুল পছন্দ করেন, কিন্তু উৎপাদনের নিয়ম না জানায় অনেকে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। এই জন্যই অনেক গুলি সুন্দর বিলাতী ফুলের রোপণ

প্রণালী লিখিত হইল।

গোলোক্‌সিনিয়া।

এই ফুলের গাছ দেখিতে অতি সুন্দর; ফুলগুলিও অতি মনোহর। অধিক পরিমাণে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া বৃক্ষের অনুপম শোভা সম্পাদন করে। ফুলের পাব্‌ড়ী মকমলের ন্যায় নরম। সূর্য্যের উত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত শীতল স্থানের প্রয়োজন; জলসিঞ্চনের সময় সাবধান হইতে হয়, যেন পাতার উপর জল না পড়ে। বীজ রোপণ করিয়া অতি অল্প আয়াসে চারা প্রস্তুত করা যায়। মাঘমাসে বীজ রোপণ কর্ত্তব্য। ঈষৎ উচ্চস্থানে চৌকা প্রস্তুত করিয়া চারা রোপণ করিলে অতি সুন্দর দেখায়। বর্ষাকালে ইহার ফুল ফোটে। অনেক প্রকার মনোজ্ঞ ঋতুপুষ্পের বীজ এখন ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে এদেশে আমদানী হইয়া থাকে; সুতরাং বীজ দুষ্প্রাপ্য নহে।

লিলি।

লিলির সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার; ইহার ন্যায় সুশ্রী ফুল কম দেখা যায়। ইহার গেঁড় অতি সাবধানে এদেশে আনীত হইলে নিশ্চয় চারা জন্মে এবং নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফুলের কেয়ারির ধারে বা চৌকার মধ্যে কিম্বা টবে গেঁড় রোপণ করা যাইতে পারে। গেঁড় পোতা হইলে সেই স্থানের মৃত্তিকা কোন প্রকারে ঘাটাঘাটী করা না হয়। কারণ তাহা হইলে চারা জন্মিবে না। কার্ত্তিক মাস গেঁড় রোপণের উপযুক্ত সময়। জমিতে রোপণ করিতে হইলে, সারবিশিষ্ট জমির মৃত্তিকা ৭।৮ অঙ্গুল গভীর করিয়া খনন করিবে এবং গেঁড় রোপণপূর্ব্বক হাল্‌কা ঝুরা মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিবে। আবশ্যক-মত জল সেচন করিবে, কিন্তু ফুল ফুটিবার সময় প্রতিদিন জল দেওয়া কর্ত্তব্য। গাছের গোড়ায় সময়ে সময়ে তরল সার দিতে পারিলে খুব ভাল হয়। টবে গেঁড় পোতা হইলে ৩।৪ দিন অন্তর একবার টব জলে ডুবাইয়া উঠাইবে, তাহা হইলে আর স্বতন্ত্র জল দেওয়ার আবশ্যক হইবে না। ফুল ফুরাইয়া গেলে যখন পাতাগুলি শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন গেঁড় তুলিয়া শুকাইয়া রাখিবে, কিন্তু অধিক দিন মৃত্তিকা ছাড়া থাকিলে উহার উৎপাদিকা শক্তি থাকে না। এজন্য শীঘ্র শীঘ্র পুনরায় রোপণ করিবে।

ভিক্টোরিয়া রিগিয়া।

ভিক্টোরিয়া রিগিয়া এক জাতীয় জলজপদ্ম; ইহার ন্যায় সুবৃহৎ পুষ্প অদ্যাপি দেখা যায় নাই। দক্ষিণ আমেরিকার গায়েনা দেশের নদীতে এই পুষ্প বিস্তর জন্মে। ইহার এক একটী পত্রের বেষ্টন বার তের হাত এবং এক একটী ফুলের বেষ্টন দুই হাত আড়াই হাত হয়। ভিক্টোরিয়া রিগিয়া আকৃতিতে যেমন বড় দেখিতেও তেমনি মনোহর। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শিবপুরে কোম্পানির বাগানে এই জাতীয় ফুলের গাছ উৎপন্ন করা হইয়াছে। কিরূপ গভীর জলে বীজ রোপণ

করিলে এদেশে চারা উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা পরীক্ষার্থ ভিন্ন ভিন্ন টবে বীজ রোপণ করিয়া, কোন টব অধিক গভীর জলে, কোন টব অপেক্ষাকৃত অল্প গভীর জলে, কোন টব জল পৃষ্ঠের সহিত সমতল ভাবে স্থাপিত করা হইয়াছিল, কিন্তু বেশী গভীর জলস্থ টবগুলিতে চারা জন্মে নাই। তাহাতে সপ্রমাণিত হইয়াছে, অগভীর জলেই বীজ রোপণ কর্ত্তব্য।

চারা উৎপাদন জন্য বোঁদমাটী, গোবর ও পাঁক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা গামলা বা টবের প্রায় অংশ পূর্ণ করিবে; অবশিষ্টভাগ জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে বীজ রোপণ করিবে। বীজ রোপণের পূর্ব্বে হাতে সহ্য হয় এরূপ গরম জলে কিছুক্ষণ বীজগুলিকে ভিজাইয়া রাখিবে। চারা উৎপন্ন হইলে কোন জলময় অগভীর হ্রদাকৃতি স্থানে বা অগভীর পুষ্করণীর গর্ভে পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ সমভাবে গোবর বোঁদমাটী ও পাঁক দিয়া তাহাতে ঐ চারা রোপণ করিবে। জলাশয়ে সর্ব্বদা জল থাকা চাই। জল শুকাইয়া গেলে গাছ বাঁচিবে না। কাঁকড়া ইহার বড শক্র. উহাতে গাছ না কাটে এ বিষয়ে সাবধান থাকিবে।

জিনিয়া এলিগেন্স।

জিনিয়া নানাবর্ণের দৃষ্ট হয়। যে জাতীয় জিনিয়ার দল অনেক সেই পুষ্পগুলিই দেখিতে সুন্দর। গাঁদাফুলের সহিত এই ফুলের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইহার ফুল ফুটিয়া অনেক দিন গাছে থাকে। জিনিয়া চাষের নিমিত্ত অধিক যত্নের আবশ্যক হয় না। বৎসরের মধ্যে দুইবার বীজ বপন করা যাইতে পারে—বর্ষাকালে একবার এবং শীতের প্রারম্ভে একবার। শীতের ফুল অপেক্ষা বর্ষার ফুলই ভাল হইয়া থাকে; বীজপাতো দিয়া আবশ্যকমত অল্প অল্প জল দিলেই চারা প্রস্তুত হয়। চারাগুলি অর্দ্ধহস্ত প্রমাণ বড় হইলে, তুলিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিতে হয়। টব অপেক্ষা জমিতেই এই গাছ ভাল হইয়া থাকে। উদ্যানের মধ্যে রাস্তার ধারে

ধারে চারা রোপণ করিলে বড় সুন্দর শোভা হয়। মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া পরিষ্কার করা এবং আবশ্যকমত জল দেওয়া ভিন্ন ইহার পক্ষে আর কোন কর্ত্তব্য কার্য্য নাই।

গাঁদার যেমন ফুলের পাব্‌ড়ীগুলি বীজরূপে পরিণত হয় ইহারও সেইরূপ এবং বীজ সংগ্রহের প্রাণালীও গাঁদাফুলের ন্যায়। আর অনেক সুন্দর ফুল এদেশবাসী সাহেবেরা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক আপন আপন উদ্যানে উৎপন্ন করিয়া থাকেন কিন্তু সে গুলির রোপণ প্রণালী অপেক্ষাকৃত কঠিন ও ব্যয়সাধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। এখন কতকগুলি দেশীয় ফুলের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। দেশীয় ফুলের উৎপাদন প্রণালী অতি সহজ, এজন্য বিস্তৃত বিবরণ লেখার আবশ্যক নাই।

সূর্য্যমুখী।
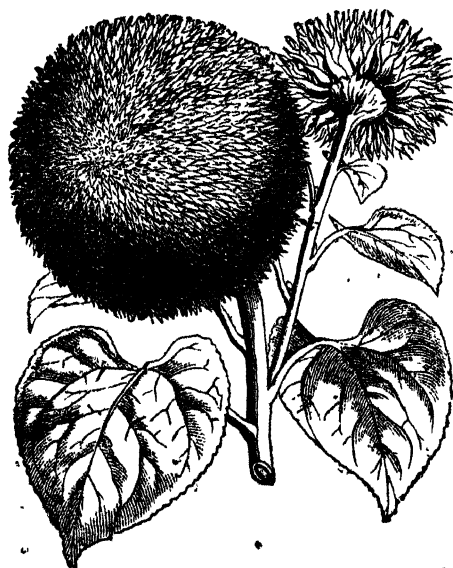
উপরে যে পরম সুন্দর চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, ইহা ডবল সন্‌-ফ্লাওয়ার অর্থাৎ সূর্য্যমুখী ফুলের প্রতিরূপ। সূর্য্যমুখী কিরূপ সুন্দর

ফুল, এদেশে অনেকে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কিন্তু কেহ কেহ ভ্রমবশতঃ রাধাপদ্মকে সূর্য্যমুখী বলিয়া থাকেন। রাধাপদ্মের বর্ণ হরিদ্রা, এবং আকৃতি সূর্য্যমুখী অপেক্ষা বড়; সূর্য্যমুখীর বর্ণ রক্তাভ-পীত, কমলালেবুর খোসার রং যেরূপ সেইরূপ। গাছের উচ্চতা প্রায় চারি হাত হইয়া থাকে। যখন ফুলগুলি ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া থাকে, তখন যে শোভা হয়, কাহার সাধ্য লিখিয়া তাহা প্রকাশ করে।

এই গাছের মস্তক প্রাতে পূর্ব্বদিকে হেলিয়া থাকে এবং সূর্য্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে মস্তক উন্নত করিয়া দিবাবসান সময়ে পশ্চিমদিকে মস্তক নত করে। নিয়ত সূর্য্যেরদিকে মুখ রাখে বলিয়া এই গাছের নাম সূর্য্যমুখী। কেবল পুষ্পের সৌন্দর্য্য এই গাছের গুণ নহে আরও কয়েকটী প্রধান গুণের জন্য ইহা আদরণীয়। জলা-ভূমি হইতে বিষবৎ যে বাষ্প উত্থিত হইয়া সংক্রামক ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশকে উচ্ছিন্ন করে, সূর্য্যমুখীর গাছ সেই ম্যালেরিয়া-বাষ্প-নাশক, ডাক্তারেরা বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। গোলাপ ফুলদ্বারা যেরূপ সুগন্ধ গোলাপজল প্রস্তুত হয়, সূর্য্যমুখী ফুল হইতেও তদ্রূপ একপ্রকার সুবাসিত জল প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার বীজে তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে; এক মণ বীজে দশ এগার সের তৈল পাওয়া যায়।

বৎসরের সকল সময়েই ইহার গাছ জন্মান যাইতে পারে, তন্মধ্যে শীতের প্রারম্ভে ও গ্রীষ্মকালই বীজ রোপণ করার প্রশস্ত সময়। মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ তাহাতে বীজ বপন করিয়া বীজ গুলি ঢাকা মাত্র পড়ে তাহাদের উপরে এমন পাতলা-রূপে, ধূলীবৎ চূর্ণ মৃত্তিকা ছড়াইবে এবং কয়েক দিন অল্প অল্প জল ছিটাইয়া জমি সরস রাখিলে চারা জন্মিবে। চারাগুলি একটু বড় হইয়া উঠিলে কতক চারা তুলিয়া ফাক ফাক করিয়া দিবে। বীজ বপনের পূর্ব্বে মৃত্তিকার সহিত খৈল বা গোবরের সার মিশাইয়া লইলে গাছের তেজ ভাল হয়। সময়ে সময়ে নিড়াইয়া গাছের

গোড়া পরিষ্কার করিয়া দিবে, এবং মৃত্তিকা নীরস বোধ হইলে, জল সেচন করিবে; ইহা ভিন্ন আর কোন পাইট নাই। অল্প চারা জন্মাইতে হইলে, কোন স্থানে বীজ পাতো দিয়া চারা জন্মাইয়া লইবে এবং চারাগুলি ৮।১০ অঙ্গুল উচ্চ হইয়া উঠিলেই তুলিয়া শ্রেণীবদ্ধ-রূপে উপযুক্ত স্থানে রোপণ করিবে।

বেল—নাসিকার তৃপ্তিজনক এই সুগন্ধি ও সুন্দর ফুলের গাছ যে পুষ্পোদ্যানে নাই, সে উদ্যান অসম্পূর্ণ। রায়বেল, মতিয়াবেল প্রভৃতি ইহার প্রসিদ্ধ জাতিগুলির ফুল অপেক্ষাকৃত বড়। খৈল, বোঁদমাটি ও গোবরের সারে গাছের বিলক্ষণ তেজ বৃদ্ধি হয়। শুকার সময় আবশ্যকমত জল না পাইলে রসাভাবে গাছ শুকাইতে আরম্ভ করে। শাখা কলমে চারা প্রস্তুত হয়। যাবৎ বর্ষা আরম্ভ না হইবে, তাবৎ চারাগুলি হাপোরে রাখিয়া বর্ষা আরম্ভ হইলে, উদ্যানে রোপণ করিবে। তিন চারিটী চারা এক সঙ্গে রোপণ করিলে ঝাড়ের মত হয়। চৈত্রমাসে ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইয়া বর্ষার শেষে ফুল ফোটা ক্ষান্ত হয়; তখন কতক ডাল ছাটিয়া দিবে।

মল্লিকা—মল্লিকা ফুলের রোপণ প্রণালী বেল ফুলের ন্যায়। বেল ও মল্লিকা গাছের আকৃতি প্রায় একরূপ, বেলের পাতা গোল, মল্লিকার পাতা কিঞ্চিৎ লম্বা এবং বেল ফুলের দল অপেক্ষা মল্লি-কার দল কিছু সরু। ইহার গন্ধ ব্যাপক ও প্রমোদকর। ইহার ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, সরু সরু পাঁচ ছয় দলবিশিষ্ট এক প্রকার মল্লিকা সচরাচর বনে জন্মে, তাহার ফুলগুলি তত সুশ্রী নহে কিন্তু সুগন্ধ অত্যন্ত ব্যাপক। এই জাতীয় গাছ, ঝোপের ন্যায় না হইয়া কিছু লম্বা হয়, এজন্য ডালগুলি নত হইয়া ভূতলে শয়ন করে, তাহাতে প্রত্যেক ডালের মৃত্তিকাসংলগ্ন স্থান হইতে শিকড় উদ্গত হইয়া নূতন চারা জন্মে। পুষ্প প্রসব শেষ হইলে বেলের ন্যায় মল্লিকা গাছও ছাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গাছের

গোড়া পরিষ্কার রাখা সকল বৃক্ষের পক্ষেই সাধারণ নিয়ম, এজন্য এ কথা সর্ব্বত্রই স্মরণ রাখা উচিত।

যূই—বেল ও মল্লিকার গাছ অপেক্ষা এই গাছ বেশী উচ্চ হয়। শাখাগুলি সরু সরু এজন্য অবলম্বন অভাব হইলে নত হইয়া ভূতলশায়ী হয়। মৃত্তিকায় বালির ভাগ কিঞ্চিৎ বেশী থাকিলে এবং তাহাতে গোবর বা খৈলের সার মিশ্রিত করিয়া রোপণ করিলে গাছগুলি সতেজ হয় ও অধিক ফুল ফোটে। বর্ষাকালে চারা রোপণ করিবে। ফুলের গন্ধ বেল ফুল অপেক্ষা কিছু মৃদু কিন্তু নাসিকার তৃপ্তিজনক। বর্ষাকালে ফুল ফোটে।

চামেলি—সারযুক্ত দো-আঁশ মৃত্তিকায় বর্ষাকালে ইহার চারা রোপণ করিবে। শাখ-কলমে চারা প্রস্তুত হয়। গাছ তত মোটা হয় না, কিন্তু লম্বা হইয়া থাকে, এজন্য লোহার তারের ঘেরা বা অন্যরূপ আশ্রয় না দিলে গাছ ধরাশায়ী হয়। ইহার ফুল দেখিতে তেমন সুন্দর নহে কিন্তু গন্ধ অতি মনোহর ও ব্যাপক।

গন্ধরাজ—গন্ধরাজ অতি সুন্দর ও সুগন্ধি ফুল। গাছের শোভাও উৎকৃষ্ট। শাখা-কলমে চারা প্রস্তুত হয়। বর্ষাকালে চারা রোপণ করিবে। বোঁদ্‌মাটী ও পচা পাতার সারে গাছের তেজ জন্মে। গ্রীষ্মকালে ফুল ফোটে। ফুটন্ত ফুল পানীয় জলে কয়েক ঘণ্টা ফেলিয়া রাখিলে সেই জল সুগন্ধি হয়।

রজনীগন্ধা—এই গাছে একটী লম্বা শীষ উদ্গত হইয়া তাহাতে অনেক কুঁড়ি ধরে এবং সেই গুলি ক্রমান্বয়ে প্রস্ফুটিত হয়। ইহার গন্ধ রাত্রিকালে ব্যাপ্ত হয় বলিয়া ইহার নাম রজনীগন্ধা। এই গন্ধ অতি মনোহর। শীতকালে গাছ মরিয়া যায় কিন্তু গাছের মোথা, মৃত্তিকা মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং বৃষ্টির জল পাইলে তাহা হইতে অসংখ্য চারা উৎপন্ন হয়। বৃষ্টি আরম্ভ হইলে ঐ চারা বা মোথা তুলিয়া বাঞ্ছিত স্থানে রোপণ করিবে। ইহার জমি তত উর্ব্বরা না হইলেও ক্ষতি নাই কিন্তু সর্ব্বদা সরস থাকা চাই। বর্ষাকালে ফুল ফোটে।

চন্দ্রমল্লিকা—চন্দ্রমল্লিকা অত্যন্ত সুশ্রী ফুল। প্রস্ফুটিত ফুলের শোভা যে দেখিয়াছে, সেই মোহিত হইয়াছে। এই গাছ জমিতে না পুতিয়া ইচ্ছা হইলে টবেও রাখা যাইতে পারে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, বেশী দলযুক্ত জাতিই অধিক সুন্দর। গাছের গোড়ায় অনেক ফেক্‌ড়ী জন্মে, তাহাই তুলিয়া পুতিলে গাছ হয়। মাটিকলম করিয়াও চারা প্রস্তুত করা যায়। ভেড়ার বিষ্ঠার সার দো-আঁশ মৃত্তিকায় মিশ্রিত করিয়া চারা রোপণ করিলে গাছ তেজাল ও ফুল বড় হয়।

মেরিগোল্ড—এদেশে যাহাকে গাঁদাফুল বলে, তাহারই ইংরেজি নাম মেরিগোল্ড। গাঁদা অতি মনোহর পুষ্প, ইহার গাছও দেখিতে সুন্দর। শীতকালে বাগান সাজাইবার পক্ষে ইহার ন্যায় জম্‌কাল ফুল অতি কম আছে। পুষ্পগুলি ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত বৃক্ষকে সুসজ্জিত রাখে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন সুন্দর ফুলে গন্ধ নাই। গাঁদা এদেশের ফুল নহে।

বড় জাতীয় গাঁদাগুলিই দেখিতে অধিক সুশ্রী। লাল রঙ্গের এক প্রকার ছোট গাঁদা আছে, তাহাও অতি সুন্দর। সামান্য যত্নে ইহার গাছ প্রস্তুত হয়। বর্ষার প্রারম্ভে কোন স্থানের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া বীজ ছড়াইলে বৃষ্টির জল পাইয়া চারা জন্মে। চারাগুলি অর্দ্ধহস্ত প্রমাণ বড় হইলে ফাক ফাক করিয়া নাড়িয়া পুতিবে এবং বৃষ্টির অভাব হইলে, তাহাতে প্রত্যহ জল দিবে। যখন গাছগুলি এক হস্ত উচ্চ হইবে, তখন মস্তকের দিক হইতে অর্দ্ধহস্ত প্রমাণ কাটিয়া রোপণ করিলে, তাহাও একটী স্বতন্ত্র চারা হইবে। এইরূপ যত কাটা যায়, ততই শাখা প্রশাখা উদ্গত হইয়া গাছ ঝাড়াল হয়; ইহাতে ফুলও বড় হইয়া থাকে। ডালগুলিকেও অধিক লম্বা হইতে দেওয়া উচিত নহে; কারণ অধিক লম্বা হইলে নত হইয়া গাছের শোভা নষ্ট করে। অতএব লম্বা শাখাগুলিকেও ঐ প্রকারে কাটিয়া মধ্যে মধ্যে চারা প্রস্তুত করিবে। সমুদায় গাছকে সমোচ্চ ও ঝাড়াল করিতে পারিলে, ফুল ফুটিয়া সেই স্থানের অপূর্ব্ব শোভা করে। বর্ষার

শেষ হইলে গাছ বা ডাল কাটা উচিত নহে। সে সময়ে তাহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া উচিত। ফাসমাটির সার দিলে গাছের তেজ বৃদ্ধি হয় এবং ফুলের আকারও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়।

বল্‌সম—এদেশে যাহা দোপাটি বা দো-মুখী নামে বিখ্যাত, সেই ফুলেরই ইংরেজি নাম বল্‌সম্। এই জাতীয় ফুল দেখিতে খুব জাঁকাল। বর্ষাকালই বীজ রোপণের প্রকৃত সময়। দেশীয় বীজ অপেক্ষা বিলাতী আমদানী বীজ ভাল। কারণ আমদানী বীজের গাছে পাতা অল্প হয় এবং বড় আকৃতির অনেক ফুল ফোটে।

সার মৃত্তিকা-বিশিষ্ট কোন পাত্রে বা জমিতে বীজ পাতো দিবে। চারা জন্মিয়া যখন ছয়পাতা-বিশিষ্ট হইবে, তখন তুলিয়া শ্রেণীবদ্ধ রূপে চৌকা জমিতে বা রাস্তার ধারে বসাইবে; ইচ্ছা হইলে টবেও রাখা যাইতে পারে। চারা তিন চারিবার নাড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রোপিত হইলে ফুল বড় হয়। সারাল মাটি হইলে গাছে খুব তেজ হয় ও অনেক ফুল ফোটে। গাছের গোড়ায় জল বাধিলে মূল পচিয়া গাছ মরিয়া যায়; ইহার ডাল ছাটিয়া কেয়ারি করিয়া দিলেবড় সুন্দর দেখায়। অগ্রহায়ণ বা পৌষমাসে বীজ রোপণ করিয়া আবশ্যকমত জল সেচন করিতে পারিলে, বর্ষাজাত গাছের ফুল শেষ হইতে না হইতে নূতন গাছের ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়, কিন্তু এই ফুল অপেক্ষাকৃত ছোট হইয়া থাকে। নীল, শ্বেত, লাল গোলাপী প্রভৃতি রঙ্গের নূতন জাতীয় বল্‌সমের বীজ বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে।

জবা—শ্বেত, পীত, পাটকিলে ও লাল প্রভৃতি নানা বর্ণের জবা দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে রক্ত জবাই অধিক সুশ্রী। পঞ্চমুখী জবা অপেক্ষা আকৃতিতে বড় এবং দেখিতে সুন্দর। প্রায় বারমাসই ইহার ফুল ফোটে। একবার গাছ জন্মিলে অনেক কাল জীবিত থাকে। ইহার ফুলে গন্ধ নাই। ডাল পুতিয়া জল দিলেই গাছ জন্মে; বর্ষাকালে পুতিলে জল দেওয়ারও আবশ্যক করে না। চীনের জবা বলিয়া যে জাতি প্রসিদ্ধ, তাহাতে বেশী দল হয় না, এবং দেশী জবা অপেক্ষা তাঁহার সৌন্দর্য্যও অধিক নহে। সাধারণ মৃত্তিকাতেই ইহার গাছ জন্মে।

স্থলপদ্ম—এই ফুলের আকার বৃহৎ এবং দেখিতে অতি সুন্দর। শরৎকালে ইহার ফুল ফোটে। প্রস্ফুটিত ফুলবিশিষ্ট গাছের দৃশ্য বড় চমৎকার। ডাল কাটিয়া পুতিলে চারা জন্মে। জবার সহিত এই গাছের যোড়কলম হইতে পারে। পচা পাতার সারে গাছের তেজ বৃদ্ধি পায় ও ফুল অপেক্ষাকৃত বড় হয়। ফুলের গন্ধ অতি মৃদু।

সন্ধ্যামণি—কোন কোন স্থানে সন্ধ্যামণিকে কৃষ্ণকেলি ফুল বলে। লাল, সাদা, হলুদে প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের নানা জাতি আছে। এক একটী গাছে বিস্তর ফুল ফোটে এবং প্রস্ফুটিত ফুলে গাছের অতি সুন্দর শোভা হয়, কিন্তু ফুলগুলি গন্ধ বিহীন। ডাল পুতিলে বা বীজ রোপণ করিলে চারা জন্মে। চারা রোপণ জন্য বেশী উর্ব্বরা মৃত্তিকার আবশ্যক নাই। দিবা অবসান সময়ে ফুল প্রস্ফুটিত হয় বলিয়াই ইহার নাম সন্ধ্যামণি।

অতসী—ইহার গাছ দেখিতে সুন্দর, ফুলগুলি উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ ও সুশ্রী কিন্তু গন্ধবিহীন, যে মৃত্তিকায় বালির অংশ কিঞ্চিৎ বেশী তাহাতে গাছ ভাল জন্মে। অধিক উর্ব্বরা মাটির আবশ্যক নাই। মৃত্তিকা খুঁড়িয়া বর্ষার প্রারম্ভে বীজ ছড়াইলে বৃষ্টির জল পাইয়া চারা বাহির হয়। ইহার নিমিত্ত বিশেষ পাইটের প্রয়োজন হয় না।

চন্দ্রকেতু—গেঁড় পুতিলে বর্ষার জল পাইয়া চারা জন্মে। ফুল দেখিতে সুন্দর; গাছের গোড়া হইতে অনেক চারা বাহির হইয়া ঝাড় হয়। সাধারণ মৃত্তিকাতেই গাছ জন্মিয়া থাকে। বিশেষ কোন পাইট করিতে হয় না।

ভুই-চাঁপা—ইহার ফুলের বর্ণ শ্বেত, ফুলে মৃদু সুগন্ধ অনুভূত হয়। গেঁড় পুতিলে গাছ জন্মে; কাণ্ড মৃত্তিকার মধ্যে থাকে, কেবল পত্রগুলি মৃত্তিকার উপরে বিস্তৃত হয়, ফুল মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থিত হয়। গাছ ও ফুল দেখিতে সুন্দর। বর্ষাকালে চারা জন্মে; বর্ষান্তে গাছ মরিয়া যায়, কিন্তু গেঁড় মৃত্তিকা মধ্যে সজীব অবস্থায় থাকে। বৃষ্টিজল পাইলে পুনরায় তাহা হইতে চারা জন্মে

দুলাল-চাঁপা—ইহার ফুল সাদা, তাহাতে উত্তম গন্ধ আছে। গাছের পাতা আদার পাতার ন্যায় কিন্তু আদা গাছ অপেক্ষা ইহার গাছ বড় হয়। বর্ষার প্রারম্ভে গেঁড় পুতিলে চারা জন্মে এবং বর্ষা-কালেই ফুল ফোটে। বর্ষান্তে গাছ মরিয়া যায়, কিন্তু গেঁড় সজীব থাকে। যে স্থানের মৃত্তিকায় বালির অংশ অধিক তথায় গাছ ভাল হয়। এই গাছ ইচ্ছা হইলে টবেও রাখা যাইতে পারে।

জহরী-চাঁপা—ভুঁই-চাঁপা ও দুলালচাঁপার সহিত ইহার গাছের বা ফুলের কোন সাদৃশ্য নাই। গুল্মের ন্যায় গাছ হয়। ফুলের গন্ধ অতি চমৎকার। ফুল ফুটিয়া কয়েকদিন গাছে থাকে এবং একটী প্রস্ফুটিত ফুলের গন্ধে অনেক দূর আমোদিত হয়। ঐ গন্ধ পাকা আনারসের ন্যায়। শাখা কলম করিয়া চারা প্রস্তুত হয়। মালী-দের নিকট চারা কিনিতে পাওয়া যায়। তোলা মাটিতে রোপণ করিলে গাছ তেজাল হয়। দো-আঁশ মৃত্তিকায় পচা মাছের সার মিশাইয়া লইলে তথায়ও ইহা ভাল জন্মে। এমন সুগন্ধি ও সুন্দর ফুল প্রত্যেক উদ্যানে থাকা উচিত।

বক—সাদা ও লাল দুই রঙ্গের বক সচরাচর দৃষ্ট হয়। শতদল বক বলিয়া যে জাতি প্রসিদ্ধ তাহাতে বাস্তবিক শতদল হয় না। কুড়ি পঁচিশটী পর্য্যন্ত দল হয়, এই জাতি দেখিতে অধিক সুন্দর। বীজের চারা রোপিত হইয়া থাকে। শাখায় গুল কলম করিলে অল্প দিনের মধ্যে চারা জন্মান যায়। সাধারণ দো-আঁশ মৃত্তিকাতেই বৃক্ষ জন্মে কিন্তু তাহাতে পচা পাতার সার বা খৈল মিশ্রিত করিলে গাছের অত্যন্ত তেজ বৃদ্ধি হয়। বর্ষাকালে চারা রোপণ করিতে হয়।

বকুল—ইহার প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া থাকে। শাখাপল্লব বিশিষ্ট ঝাকড়া বৃক্ষের শোভা বড় মনোহর। ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলগুলি দেখিতে সুন্দর এবং প্রস্ফুটিত ফুলের সুগন্ধ অনেক দূর ব্যাপী। বীজ-জাত চারাই রোপিত হইয়া থাকে। এটেল ও বালি মিশ্রিত মৃত্তিকা ইহার পক্ষে উপযোগী। গোড়ায় বর্ষার জল বসিলে গাছ মরিয়া যায়।

চাঁপা—ইহার বৃক্ষ বৃহদাকার হয়। বৃক্ষ দেখিতে সুশ্রী; ফুলগুলিও অতি সুন্দর; গন্ধ মনোহর এবং অধিক দূর ব্যাপি, কিন্তু কিছু উগ্র সুপক্ক বীজ হাপোরে রোপণ করিয়া অল্প অল্প জল দিলে চারা জন্মে কিন্তু অযত্নে রোপিত বীজ প্রায় অঙ্কুরিত হয় না। ইহার তলায় বিস্তর বীজ পড়ে, চারা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

নাগেশ্বর—ইহার ফুল অতি সুন্দর ও সুগন্ধি। বৃক্ষ বড় হয়। বীজ-জাত চারাই রোপিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকায় পচা মাছের সার মিশাইয়া চারা রোপণ করিবে। গবাদি পশুতে না খায়, এজন্য বাঁশের ঘেরা প্রস্তুত করিয়া দিবে। এমন সুন্দর ও সুগন্ধি ফুলের জন্য একটু বেশী যত্ন করা অন্যায় নহে। চারার গোড়ায় যেন বর্ষার জল না বসে। সর্ব্বদা গোড়া পরিষ্কৃত রাখিবে।

করবী—মধ্যমাকৃতির গাছ হয়। গাছ দেখিতে সুন্দর; শ্বেত ও রক্ত বর্ণ দুই রঙ্গের করবীরই গাছ একরূপ; একের ফল সাদা অন্যের রক্তবর্ণ। বালির অংশ কিছু বেশী থাকে এরূপ মাটিতে গাছ ভাল জন্মে।

মোরগফুল—ইহার অনেক জাতি আছে। তন্মধ্যে এক জাতির গাছ ও ফুল দেখিতে অতি চমৎকার। এই জাতীয় গাছ ছোট; ইহারা যখন মকমলের ন্যায় কোমল ও উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ বৃহদাকার একটী পুষ্প মস্তকে ধারণ করিয়া রাখে, তাহা দেখিয়া মোহিত না হয় এমন লোক নাই। ঐ প্রস্ফুটিত ফুল প্রায় দুই মাস অবিকৃত-ভাবে থাকে। অন্যান্য জাতির গাছ অপেক্ষাকৃত বড় হয়; তাহা-দের ফুল এরূপ সুশ্রী নহে। বর্ষার প্রারম্ভে বীজ ছড়াইলে বৃষ্টির জল পাইয়া চারা জন্মে। মাটিতে অধিক রস থাকিলে গাছ ভাল হয় না, গোবরের সারে গাছের তেজ বৃদ্ধি হয়।

সেফালিকা—বীজ রোপণ করিলে ইহার চারা জন্মে। গাছ বড় হইয়া থাকে; প্রচুর ফুল ফোটে, ফুলে সুগন্ধ আছে। পুরাতন ডাল কাটিয়া দিলে নূতন ফেকড়ী জন্মিয়া বৃক্ষকে ঝাকড়া করে ও বেশী ফুল ফোটে। বর্ষাকালে দো-আঁশ মাটিতে চারা রোপণ করিতে হয়।

টগর—শাখা কলম করিয়া ইহার চারা জন্মান যায়। গাছ মধ্যমাকৃতির হয়। ফুলে মৃদু সুগন্ধ আছে। উদ্যানের সাধারণ মাটিতেই গাছ জন্মে। বেশী পাইটের আবশ্যক নাই।

কামিনী—মধ্যমাকৃতির ঝাকড়া গাছের শোভা বড় সুন্দর। গাছ ছাটিয়া দিলে চমৎকার দৃশ্য হয় কিন্তু তাহাতে ফুল কম ফোটে। স্তবকে স্তবকে প্রচুর ফুল ফুটিয়া বৃক্ষকে সুসজ্জিত করে। ফুলের গন্ধ অতি প্রমোদকর এবং অনেক দূর ব্যাপী। বীজ হইতেই চারা জন্মে। ডাল কাটিয়া হাপোরে পুতিলেও চারা হয়। বর্ষাকালে চারা রোপণ কর্ত্তব্য। দো-আঁশ মাটিতে গাছ জন্মে। কৃষ্ণপক্ষ অপেক্ষা শুক্লপক্ষে অধিক ফুল ফোটে।

কৃষ্ণচূড়া—বারমাস এই গাছে ফুল ফোটে। বীজ রোপণ করিলে গাছ জন্মে। ফুল সুন্দর কিন্তু গন্ধবিহীন। উদ্যানের সাধারণ মৃত্তিকায় চারা রোপিত হইলেই বর্দ্ধিত হয়। পলিমাটিতে গাছের তেজ বৃদ্ধি হয়। বেশী পাইটের আবশ্যক হয় না।

পলাশ—ইহার বৃহদাকার বৃক্ষ হয়। ফুল দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু গন্ধ বিহীন। পুষ্পদণ্ডে সজ্জিত প্রস্ফুটিত ফুলের শোভা অতি চমৎকার। ইহার বীজ কৃমিনাশক বলিয়া ঔষধে ব্যবহৃত হয় বীজ-জাত চারাই রোপিত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে দো-আঁশ মৃত্তিকা-বিশিষ্ট স্থানে গোবরের সার মিশাইয়া চারা রোপণ করিবে।

কনক-চাঁপা—চাঁপা বৃক্ষের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। ইহার বৃক্ষ বড় হয়। পাতাগুলি বড়, ফুলের দল লম্বা ও গন্ধ অতি মনোহর। ফুল শুকাইয়া গেলেও গন্ধ যায় না। কোন কোন স্থানে কনক-চাঁপাকে মচকন্দ ফুল বলে। বীজের চারা রোপিত হইয়া থাকে; বর্ষাকালে চারা রোপণ কর্ত্তব্য।

কাঁঠালিচাঁপা—ইহার গাছ তত বড় নহে, কিন্তু ঘন পত্রবিশিষ্ট লম্বা লম্বা ডালগুলি নত হইয়া পড়ে, তাহাতে অনেক স্থান জুড়িয়া ঝুঁপসি ভাবে থাকে; সুতরাং গাছ দেখিতে সুন্দর নহে। ফুল ফুটিলে ঘন পাতা ও শাখার জন্য বাহির হইতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়

না, কিন্তু ফুলের বহুদূর ব্যাপী অতি মিষ্ট সুগন্ধ, মনুষ্যের মনকে সেই ঝোপের দিকে আকর্ষণ করে। বর্ষাকালে ইহার চারা রোপণ করিতে হয়। সাধারণ মৃত্তিকাতেই গাছ জন্মে, বেশী পাইটের প্রয়োজন হয় না।

অশোক—ইহার বৃক্ষ বৃহৎ, গোড়ার অল্প উপর হইতে শাখা প্রশাখা জন্মিয়া ঝাকড়া গাছ হইয়া থাকে। স্তবকে স্তবকে অপর্য্যাপ্ত ফুল ফোটে। প্রস্ফুটিত রক্তবর্ণ পুষ্পসজ্জিত বৃক্ষের শোভা অতি সুন্দর। ফুলে গন্ধ নাই। একটু নিম্ন জমিতে এই গাছ ভাল জন্মে।

কদম্ব—ইহার ফুল অতি মনোহর, ফুলে মৃদু সুগন্ধ আছে। বর্ষার প্রারম্ভে ও মধ্যভাগে দুইবার ফুল ফোটে। এক একবারে অপর্য্যাপ্ত ফুল ফুটিয়া বৃক্ষের আশ্চর্য্য শোভা সম্পাদন করে। ফুল অল্পকাল-স্থায়ী। ইহার বৃহদাকার বৃক্ষ হয়। বীজ হইতেই চারা জন্মে, সাধারণ মৃত্তিকাতেই গাছ বর্দ্ধিত হয়।

স্বাভাবিক শ্বেতবর্ণের পুষ্প বৃক্ষাদিতে কৃত্রিম উপায়ে নীল, লাল, প্রভৃতি বর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত করিবার উপায়।

(এই প্রস্তাবটী বিজ্ঞানদর্পণ নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণে পরীক্ষা করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করিবেন, এই অভিপ্রায়ে এস্থলে উহা উদ্ধৃত করা গেল।)

এক ভাগ এক বৎসরের গোময় সার, এক ভাগ পচা পাতার সার, চরিভাগের একভাগ বেলে মাটি, আটভাগের এক ভাগ এটেল মাটি, আর অল্প পরিমাণ শৃঙ্গচূর্ণ বা অস্থিচূর্ণ এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে নীলের জল, (লাল করিতে হইলে গেঁরিমাটির জল) ঢালিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া পুনরায় শুষ্ককরতঃ

তদ্দ্বারা টব পূর্ণ করিবে। অতঃপর উহাতে বীজ, চারা বা গেঁড় রোপণ করিবে এবং প্রত্যহ জল দিবার সময় ঐ বর্ণের জল সেচন করিবে। রৌদ্র বা বৃষ্টি না লাগিতে পারে এরূপ স্থানে রাখিবে, তাহা হইলে ঐ বর্ণের ফুল ফুটিবে।

পদ্ম—পুষ্পরাজ্যে পদ্মের ন্যায় সুশ্রী ও সুগন্ধি ফুল অতি কম। এদেশের প্রাচীন কবিগণ পদ্মকে পুষ্পরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তখন গোলাপ এদেশে ছিল না, থাকিলে বোধ হয় পদ্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদলাভ হওয়া ঘটিত না; যাহা হউক পদ্ম গোলাপের সমতুল্য ফুল না হইলেও অন্যান্য ফুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা শরৎকালে পদ্মময় বৃহৎ বৃহৎ বিল ও পুষ্করিণী দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, জলের মধ্যে পদ্মের কি চমৎকার শোভা। ইহার গেঁড় তুলিয়া জলাশয়ে জলের নীচে পাঁকের মধ্যে পুতিলেই গাছ জন্মে। একবার গাছ জন্মিলে অল্পদিনের মধ্যে জলাশয়ের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; এজন্য স্নানাদির নিমিত্ত যে পুকুরের জল ব্যবহৃত হয়, তাহাতে ইহা রোপণ করা উচিত নয়। শ্বেত, নীল, রক্ত, প্রভৃতি ইহার কতিপয় ভিন্ন জাতি আছে।

অপরাজিতা—ইহা লতাজাতীয় ফুলের গাছ। আশ্রয় জন্য বেড়া বা প্রাচীরের নিকট রোপণ করা কর্ত্তব্য। শ্বেত ও নীল এই দুই বর্ণের ফুল সচরাচর দৃষ্ট হয়। উজ্জ্বল নীল বর্ণের ফুলগুলিই দেখিতে অধিক সুশ্রী। বীজ রোপণ করিলে বর্ষার জল পাইয়া চারা জন্মে। বিশেষ কোন পাইট নাই; পঞ্চদল অপরাজিতার জাতি অত্যন্ত সুন্দর। ফুলগুলি গন্ধ বিহীন।

ঝুম্‌কা ফুল—ইহার ন্যায় সুশ্রী ও সুগন্ধি ফুল কম দেখা যায়। ইহাও লতাজাতীয় গাছ। বর্ষাকালে ডাল পুতিলেই চারা জন্মে। আশ্রয় প্রাপ্তির নিমিত্ত কোন বৃক্ষ, প্রাচীর বা বেড়ার ধারে চারা রোপণ করিবে। পলিপড়া মৃত্তিকায় ভাল জন্মে ও সামান্য যত্নে বর্দ্ধিত হয়।

শাক সবজির উদ্যান।

বাঁধাকপি।
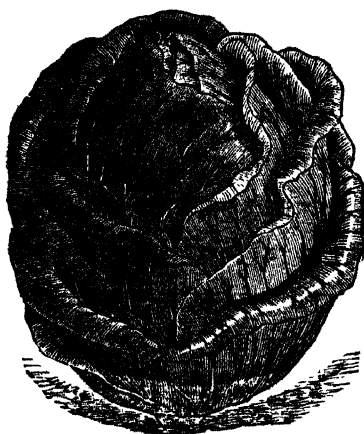
কপি বিদেশীয় শাক; প্রথমতঃ সাহেবদের প্রয়োজনের জন্য এদেশে উহার চাষ আরম্ভ হয়, পরে সুখাদ্য ও পুষ্টিকর দ্রব্য বলিয়া দেশীয় লোকেরা আদরপূর্ব্বক ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। এদেশের প্রধান প্রধান জেলা সমূহে এখন ইহা বিস্তর উৎপন্ন হইতেছে। কপি উৎপাদনার্থ একটু যত্নের আবশ্যক। অগ্রে ইহার বীজবিষয়ক কয়েকটী জ্ঞাতব্য কথা উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ উৎপাদন প্রণালী বর্ণিত হইতেছে।

এই শাক এত বিভিন্ন জাতীয় যে, ইহার বীজ নির্ব্বাচন করা বড় দুরূহ ব্যাপার। অনেক সময়ে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, ব্যবসায়ীর প্রতারণায় ভিন্ন ভিন্ন নামধেয় বীজ হইতে এক প্রকার চারা ও শাক উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা হউক এদেশে কপি জন্মাইতে হইলে বিদেশীয় বীজই লইতে হইবে; কারণ অস্মদ্দেশোৎপন্ন বীজ কুত্রাপি অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায় না; এদেশে কপি সুপক্ক হইতে না হইতেই গ্রীষ্মঋতু উপস্থিত হয়, তজ্জন্যই বীজ পুষ্ট ও পরিণত হইতে পারে না। বীজ নূতন হওয়া চাই। শীতল বাতাসে নষ্ট হইয়া

যায় এনিমিত্ত বাক্স বা বোতলের মধ্যে বীজ মোড়ক করিয়া রাখা উচিত। কপির নিম্নলিখিত জাতিগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ।

১। আর্লি সুগারলোপ—এই জাতীয় কপি আহারের জন্য লোকে অত্যন্ত পছন্দ করে। শীঘ্র জন্মে, অন্যান্য কপি যে সময়ে হয়, তখন ইহা শেষ হইয়া যায়।

২। লার্জ্জড্রমহেড—ইহার আকার অত্যন্ত বড়, নিরেট, এক একটা ওজনে খুব ভারী হয়। মাথা নিশ্চয় বান্ধে, বিলম্বে ব্যবহার যোগ্য।

ড্রমহেড সেভয়—ইহার আকার ড্রমহেড্ কপির ন্যায় বড়; লোকে ইহা বিশেষ পছন্দ করে। বসন্তকাল পর্য্যন্ত রাখা যায়। যত পরিণত হয়, ততই ভাল; খাইতে মর্জ্জার মত; অন্যান্য কপি পাকিলে যেমন দুর্গন্ধ হয়, ইহার তাহা হয় না। অল্প দামে এই বীজ ক্রয় করিলে অন্য নিকৃষ্ট কপির বীজ এই নাম দিয়া দুষ্ট ব্যবসায়ীরা প্রতারণা করে।

৪। ব্লুম্‌সডেলরেড ফ্লাটডচ্—এই জাতীয় বান্ধা কপি আহারের জন্য বিশেষ আদরের সহিত ব্যবহৃত হয়। ইহার মস্তক বৃহৎ এবং ছড়ান ও নিরেট; বর্ণ গাঢ় বেগুণে।

৫। রেড্ডচ্—ইহা কপির একটী প্রসিদ্ধ জাতি; ইহার মস্তক ভালরূপ বান্ধে না।

৬। বর্গেন ম্যামথ—সকল কপি অপেক্ষা বড়। বিলম্বে মাথা বান্ধে, ভিতরের পাতা থুরু, গাছ শক্ত হয়।

৭। ইম্পিরিয়েল—এই জাতি অতি প্রসিদ্ধ, আকার খুব বড়, মাথা নিশ্চয় বান্ধে ও নিরেট হয়। আহারের জন্য ভাল বলিয়া লোকে আগ্রহের সহিত ইহার চাষ করে।

আর্লিইয়র্ক—ইহার আকার অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ছোট হইলেও সুস্বাদু বলিয়া এই জাতীয় কপির অত্যন্ত আদর আছে। লোকে যত্নপূর্ব্বক ইহা উৎপন্ন করে।

কপির চারা জন্মাইবার নিয়ম এই,—উর্ব্বরা হাল্‌কা মৃত্তিকার দ্বারা বাক্স বা গামলা পূর্ণ করিবে। মৃত্তিকা উত্তম না হইলে চারা

জন্মিবার ব্যাঘাত ঘটে। কোন স্থানের নূতন মাটি তুলিয়া তাহার সহিত সমান ভাগে পচা পাতার সার এবং আট ভাগের এক ভাগ নদীতীরের বালি মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। অনন্তর তন্মধ্যস্থ কাঁকর, ঝিল প্রভৃতি বাছিয়া ফেলিবে। এই প্রকারে যে মৃত্তিকা প্রস্তুত হইবে, তাহা অতিশয় কোমল সুতরাং বীজ বপন করিলে অঙ্কুরোৎপন্ন হইয়া নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধি পাইতে পারে। যে পাত্রে চারা জন্মাইবে তাহা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। টবে চারা জন্মাইতে হইলে তাহা মৃত্তিকাপূর্ণ করিবার সময় নিম্নের ছিদ্রে ঝামা বা ইষ্টকখণ্ড চাপা দিবে। পাত্রের সম্পূর্ণ অংশ মৃত্তিকা পূর্ণ না করিয়া এক বা দেড় অঙ্গুল খালি রাখিবে। অনন্তর হাত দিয়া মৃত্তিকা সমানকরতঃ অল্প চাপিবে এবং তদুপরি পাতলা রূপে বীজ বপন করিবে; তৎপরে চূর্ণ মৃত্তিকা এরূপ অল্প পরিমাণে বীজের উপর ছড়াইবে যে, বীজগুলি ঢাকামাত্র পড়ে। আর্লি অর্থাৎ জলদি কপির বীজ ভাদ্র মাসে বপন করাই কর্ত্তব্য। অন্যান্য কপির বীজ বর্ষা শেষ হইয়া গেলে অর্থাৎ ভাদ্র মাসের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাসের প্রথম পর্য্যন্ত সুবিধানুসারে বপন করিবে।

বীজ বপন করিয়া প্রথম দিন জল সেচন করিবে না; দ্বিতীয় দিন সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট উদ্যানীয় জল যন্ত্রদ্বারা অল্প পরিমাণে জল সেচন করিবে, কিম্বা দূর্ব্বার আটি ভিজাইয়া জলের ছিটা দিবে। যেখানে রৌদ্র বা বৃষ্টি লাগিতে না পারে এরূপ স্থানে ঐ পাত্র রাখিবে। অঙ্কুর বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত এই অবস্থায় থাকিবে এবং পাত্রের মৃত্তিকা অল্প ভিজা রাখিবার জন্য প্রত্যহ অল্প অল্প জল সেচন করিবে। ভাল বীজ হইলে দুই তিন দিনের মধ্যেই অঙ্কুর জন্মে। চারার ২।১টী পত্র বহির্গত হইলে, কিছুক্ষণ প্রাতে ও বৈকালে ঐ পাত্র বাহিরে রাখিবে। বাহিরে থাকা ক্রমশঃ সহ্য হইলে একেবারে বাহিরে রাখিবে। চারা ৩।৪ অঙ্গুল উচ্চ হইলে এবং ৩।৪টী পাতা বাহির হইলে, কোন দিন প্রাতে বা সন্ধ্যাকালে তাহাদিগকে তুলিয়া উর্ব্বরা মৃত্তিকা-বিশিষ্ট অন্য পাত্রে পুতিবে। এই সময়ে কিছু অধিক

পরিমাণে জল সেচন করিবে, এবং ঐ পাত্র সমস্ত রাত্রি বাহিরে রাখিয়া শিশির লাগাইবে, কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা বুঝিলে, সে রাত্রিতে কদাচ বাহিরে রাখিবে না। স্থান পরিবর্ত্তন জন্য যাবৎ চারার দুর্ব্বলতা না যায়, তাবৎ রৌদ্রের সময় ঢাকা দিয়া রাখিতে পারিলে দিবসেও পাত্র বাহিরে রাখা যাইতে পারে। চারা সবল হইয়া উঠিলে ঢাকা রাখার আবশ্যক নাই। এই প্রকারে স্থানান্তরিত করিয়া না পুতিলে এবং ক্রমশঃ রৌদ্র সহ্য না করাইলে চারাগুলি অসম্ভব লম্বা হইয়া শেষে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। স্থানান্তরিত করিবার সময় কখনও চারার ডাটা ধরিয়া টানিয়া তুলিবে না। জল ঢালিয়া দিলেই গোড়ার মাটি কাদার মত হইবে, তখন দুই তিনটী আঙ্গুল গোড়ার মাটিতে বসাইয়া কিছু কাদামাটি সমেত চারা তুলিয়া লইবে; ঐ স্থানান্তরে চারা বসাইবার সময় সেই মাটি সমেত সাবধানে চারা বসাইবে। বেশী চারা প্রস্তুত করিতে হইলে টবে বা গামলায় বীজ বপন না করিয়া চৌকায় বপন করা যাইতে পারে। টব বা গামলায় চারা জন্মাইবার নিমিত্ত যেরূপ মৃত্তিকা প্রস্তুত করণের কথা লিখিত হইয়াছে। ঐ স্থানের মৃত্তিকাও সেইরূপ হওয়া আবশ্যক এবং রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে নবজাত চারা গুলিকে রক্ষা করিবার জন্য উপরে উপযুক্ত আচ্ছাদন রাখা কর্ত্তব্য। ঐ আচ্ছাদন বৃষ্টি ও প্রখর রৌদ্রের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে তুলিয়া রাখিবে। সব্জি-ওয়ালারা হোঁগ্‌লা দিয়া সুন্দর ও কার্য্যোপযোগী আচ্ছাদন প্রস্তুত করে, রৌদ্র বা বৃষ্টির সময় নৌকার ছোই বা দোচালা ঘরের ন্যায়; তদ্দ্বারা চৌকা ঢাকিয়া চারা রক্ষা করে, অন্য সময়ে গুটাইয়া রাখে।

ছয়টী পাতা জন্মিলেই চারা তুলিয়া স্থায়ীরূপে ক্ষেত্রে বসাইতে হয়। এদিকে যেমন চারা প্রস্তুতের উদ্যোগ আরম্ভ হইবে, সেই সময়েই মাটি খুঁড়িয়া ডেলা ভাঙ্গিয়া এবং সার দিয়া এই ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য প্রবৃত্ত হইতে হইবে। মৃত্তিকা একটু অধিক খনিত ও চূর্ণিত হইলে ভাল হয়, কপির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সার প্রদান আবশ্যক। গোবর, খৈল, অস্থিচূর্ণ সোরা ও পলিমাটি কপির পক্ষে

উত্তম। জমি পাইট করা হইলে বেগুণের জমিতে যেমন দুই পার্শ্বে দাঁড়া রাখিয়া মধ্যে জুলি প্রস্তুত করে, কপির ক্ষেত্রেও সেইরূপ জুলি প্রস্তুত করিবে। ছোট জাতীয় কপির চারা হইলে ঐ জুলি দেড় হাত এবং বৃহজ্জাতীয় কপির চারা হইলে দুই দুই হাত অন্তর প্রস্তুত করিবে। জুলির মধ্যে ও চারাগুলি ঐরূপ ব্যবধানে রোপণ করিতে হয়। চারা বসাইবার দশ বার দিন পূর্ব্বে এই সকল জুলি প্রস্তুতকরিয়া প্রত্যেক জুলিতে দেড় বা দুই হাত অন্তর এক এক কোদাল মাটি তুলিয়া গর্ত্ত করিবে এবং প্রত্যেক গর্ত্তে এক একঅঞ্জলি গুড়া খৈল দিয়া রাখিবে। দশ বার দিনে ঐ খৈল পচিয়া মাটির সহিত মিশিবে, তখন কোদাল দ্বারা গর্ত্তের মাটি উলট পালট করিয়া লইয়া এক একগর্ত্তে এক একটী চারা বসাইবে এবং পাতার নিম্ন পর্য্যন্ত চারার সমস্ত কাণ্ড মাটির দ্বারা ঢাকিয়া দিবে। সেই মাটি চাপিয়া দিবে না। এইরূপে চারা রোপণ করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবৎ ভালরূপ শিকড় না লাগিবে, তাবৎ প্রত্যহ অল্প অল্প জল সেচন করিবে। শিকড় লাগিলে, সপ্তাহ অন্তর জল সেঁচিয়া দিবে এবং মধ্যে মধ্যে গোড়া খুসিয়া দিবে।

চারা সবল হইয়া যখন আটটী পত্র বিশিষ্ট হইবে, তখন পার্শ্বের দাঁড়া ভাঙ্গিয়া জমি সমান করিয়া ফেলিবে। ইহার পর, সপ্তাহ অন্তর জল দেওয়া এবং গোড়ার মৃত্তিকা জমাট বান্ধিয়া গেলে মধ্যে মধ্যে কোদাল দিয়া খুঁড়িয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কাজ নাই। জল সিঞ্চন ও মৃত্তিকা খনন কার্য্য এক দিনে করিবে না। জল দেওয়ার পর যখন মাটিতে "যো" হইবে, তখনই খুঁড়িয়া দিবে। গাছে পোকা লাগিলে সাধ্য মত বাছিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। বান্ধা কপি উপযুক্ত সময়ে আপনিই বান্ধিতে আরম্ভ করে; তজ্জন্য কোন চেষ্টা পাইতে হয় না।

ফুলকপি।

ফুলকপি অতি সুখাদ্য ও পুষ্টিকর সবজি; ইহার বীজ বান্ধা কপির বীজের ন্যায়; চারার অবস্থায় বান্ধাকপি ও ফুলকপির গাছে বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। কিন্তু চারা বড় হইয়া উঠিলে, বান্ধাকপির গাছের সহিত ঐ গাছের বিভিন্নতঃ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ইহার পাতা বান্ধাকপির পাতার ন্যায় পার্শ্বের দিকে না বাড়িয়া লম্বা হইয়া পড়ে। এই গাছের পূর্ণাবস্থায় মস্তক হইতে ঊর্দ্ধদিকে কোমল পুরু ও স্তবকাকার ফুল উৎপন্ন হয়; ঐ ফুলই আহারার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফুলকপি উৎপাদনার্থ অত্যন্ত উর্ব্বরা মৃত্তিকার আবশ্যক। ইহার চাষের নিমিত্ত ইউরোপীয়েরা বিদেশীয় বীজ এবং এ দেশীয়েরা দেশীয় বীজ পছন্দ করেন, কিন্তু তুলনা করিলে উভয় বীজের ফলই প্রায় সমান দেখা যায়। বঙ্গদেশে বিদেশীয় বীজ অপেক্ষা বরং দেশীয় বীজই ভাল, কারণ বিদেশীয় বীজজাত চারা বঙ্গদেশে কিছু দিন সমভাবে বর্দ্ধিত হইয়া শেষে নিস্তেজ হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু উত্তর পশ্চিম প্রদেশে দেশীয় বীজ অপেক্ষা বিদেশীয় বীজের ভাল ফল হইয়া থাকে।

ইহার বীজ বপন করিয়া প্রথমে চারা জন্মাইয়া লইতে হয়। চারা প্রস্তুতের নিয়ম অবিকল বান্ধা কপির ন্যায়। বীজ বপনের উপযুক্ত সময় উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভাদ্র এবং বঙ্গদেশে আশ্বিন মাস। চারাগুলিতে চারিটী করিয়া পত্র উদ্গত হইলে, তাহা-দিগকে তুলিয়া ঝুরা হাল্কা উর্ব্বরা মৃত্তিকা-বিশিষ্ট দ্বিতীয় পাত্রে পরস্পর পাঁচ অঙ্গুলি ব্যবধানে রোপণ করিতে হয়। যতদিন আটটী পাতা না জন্মিবে ততদিন চারাগুলিকে ঐ পাত্রেই রাখিবে। আটটী করিয়া পত্রোদ্গত হইলে তাহাদিগকে তুলিয়া স্থায়ীরূপে ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। ঐ ক্ষেত্রের মৃত্তিকা পূর্ব্বেই উত্তমরূপে পাইট করিয়া ও সার দিয়া প্রস্তুত রাখিবে এবং তাহাতে জুলি কাটিবে। জুলি সকল পরস্পর এক হাত ব্যবধান হওয়া উচিত। ঐ জুলির মধ্যে

পরস্পর সওয়া হাত অন্তরে চারা রোপণ করিবে। স্থানান্তর নিবন্ধন চারার দুর্ব্বলতা না যাওয়া পর্য্যন্ত চারার উপরে উপযুক্ত আচ্ছাদন দিবে; পরন্তু সাবধান যেন ঐ আচ্ছাদনে চারাগুলির বায়ু ও আলোক-প্রাপ্তির ব্যাঘাত না ঘটে। চারা রোপণ করিয়া যাবৎ মৃত্তিকায় শিকড় না লাগিবে তাবৎ তাহাদের গোড়ায় প্রত্যহ বৈকালে অল্প অল্প জল সেচন করিবে। শিকড় লাগিয়া গেলে সপ্তাহ অন্তর জল দিবে এবং মধ্যে মধ্যে গোড়ার মাটি খুসিয়া দিবে। যে দিন জল দিবে সে দিন গোড়ার মাটি খুঁড়িবে না। ঐ জল টানিয়া যখন মৃত্তিকায় "যো" হইবে তখনই গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দিবে।

চারা স্থায়ীরূপে ক্ষেত্রে পুতিয়া গোড়ায় অধিক পরিমাণে পুরাতন সার দেওয়া উচিত। অত্যল্প পরিমাণে পটাশ জলের সহিত গুলিয়া ইহার ক্ষেত্রে প্রক্ষেপ দিলে গাছের তেজ সমধিক বৃদ্ধি হয় এবং ফুল বড় হইয়া থাকে। যে সকল চারা নিস্তেজ দৃষ্ট হইবে, তাহাদিগকে তুলিয়া তাহাদের স্থানে অন্য সতেজ চারা রোপণ করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত কতকগুলি অতিরিক্ত চারা মজুত রাখিতে হয়; অনেক চাষী প্রত্যেক তৃতীয় গর্ত্তে দুইটা করিয়া চারা রোপণ করে এবং পরে প্রয়োজন মত ক্ষীণ চারা ফেলিয়া দিয়া তাহার স্থানে উহার একটী পুতিয়া দেয়। ইহার ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় কুড়ি মণ খৈলের সার দিলেই যথেষ্ট হয়।

চারা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বের দাঁড়া হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহপূর্ব্বক মনোযোগের সহিত তাহা গোড়ায় দিবে; কারণ এই মাটি দেওয়াতে গাছের তেজ বৃদ্ধি করে। গাছে ফুলের সূচনা হইলে, একটী পাতা ভাঙ্গিয়া আলোক সংসর্গ বন্ধ করিবার জন্য সেই উদ্গতপ্রায় পুষ্পের উপর আচ্ছাদন দিবে। কোন পত্র শুষ্ক না হইলে গাছ হইতে তাহা ফেলিবে না।

ফুলকপির দেশীয় ও বিদেশীয় বীজ এখন বিস্তর কলিকাতায় আমদানী হইয়া থাকে। দেশীয় বীজের মধ্যে পাটনার বীজ বিশেষ বিখ্যাত।

ফুলকপি শীঘ্র জন্মাইতে হইলে, মাঘমাসের শেষ হইতে চৈত্র-মাসের কিছুদিন পর্য্যন্ত কোন সময়ে বীজ বপন করিবে। গ্রীষ্ম-কালের প্রারম্ভেই চারাগুলি তুলিয়া অন্য চৌকাতে পুতিয়া দিবে। ঐ চৌকা এরূপ উন্নত হওয়া আবশ্যক যে বৃষ্টির জল পড়িবামাত্র গড়াইয়া যাইতে পারে। বর্ষার শেষ পর্য্যন্ত চারাগুলিকে উক্ত চৌকামধ্যে রাখিবে। বৃষ্টির জল নিবারণ জন্য উপরে উপযুক্ত আচ্ছাদন দিবে। বর্ষার শেষ হইলে চারাগুলি তুলিয়া উর্ব্বরা মৃত্তিকাবিশিষ্ট পাইট করা ক্ষেত্রে তাহাদিগকে স্থায়ীরূপে রোপণ করিবে। এই নিয়মে চাষ করিলে সচরাচর যে সময়ে ফুলকপি জন্মিয়া থাকে, তাহার অনেক পূর্ব্বে উহা প্রস্তুত হইয়া উঠে। ফুলকপিকে ইংরাজিতে কলিফ্লাওয়ার বলে।

ব্রকোলি।

এই বিদেশীয় সব্‌জি ভারতবর্ষে সহজে জন্মান যাইতে পারে। এ দেশের নিম্নতল প্রদেশে ইহা অতি উত্তম জন্মে। ফুলকপির ন্যায় ইহার ফুল হয় এবং সেই ফুলই আহারার্থ ব্যবহৃত হয় এবং তাহা সুখাদ্য। ব্রকোলি তিন প্রকার; সবুজ, সাদা ও বেগুণে।

নূতন বীজ না হইলে চারা ভালরূপ জন্মে না। ভাদ্র মাসের শেষে বা আশ্বিন মাসের প্রথমে গামলায় কিম্বা টবে অথবা চৌকা জমিতে চারা জন্মাইয়া ১৫।১৬ দিন পরে সেই সকল চারা তুলিয়া সতন্ত্র-স্থানে রোপণ করিবে। চারা উৎপাদনের প্রণালী বান্ধা কপির ন্যায়। যখন চারায় বারটী পত্র উদ্গত হইবে, তখন তাহাদিগকে ঐ স্থান হইতে উঠাইয়া পরস্পর পৌনে দুই হাত অন্তরে, স্থায়ী-রূপে ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। এই শেষোক্ত রোপণের স্থানকে পূর্ব্বেই উত্তমরূপ পাইট করিয়া ও সার দিয়া প্রস্তুত রাখিবে। চারা-গুলি তুলিয়া রোপণ করার পর কয়েক দিন প্রত্যহ বৈকালে অল্প অল্প জল সেচন করিবে। শিকড় লাগিয়া গেলে, আট দশ দিন অন্তর জল দিলেই চলিবে। মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ার মাটি উস্‌কাইয়া দিবে এবং ঘাস মুথা প্রভৃতি তুলিয়া ফেলিবে। যে দিন গোড়ার মাটি খুঁড়িবে সে দিন যেন জল সেচন করা না হয়।

চারায় ফুলের সূচনা হইলে, দুই একটী পাতা ভাঙ্গিয়া তদ্দারা ঐ তরুণ পুষ্পকে ঢাকিয়া রাখিবে, নতুবা রৌদ্র বা বৃষ্টিতে পুষ্প নষ্ট হইয়া যায়। ফুল বাড়িয়া উঠিলে কাটিয়া লইবে। আর্লিকর্নিস্, সুপর-ফাইন্, চাম্পেলক্রিম্, হাউডেন্স, ডোয়ার্ফ-পার্পল্ এবং ব্রিমষ্টোন এই সকল জাতীয় ব্রকোলি অধিক প্রসিদ্ধ।

ওলকপি।

ওলকপির ইংরাজি শাস্ত্রীয় নাম নোলকোল ও কোলরাবি। ইহা অতি উৎকৃষ্ট তবকারি। ইহার কাণ্ড মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত হইয়া বৃদ্ধি পায়। যে জাতীয় ওলকপির ঐ কাণ্ড বড় ও নিটোল এবং গাছে পত্র কম, সেই জাতিই ভাল। ইহার চাষের নিমিত্ত বিদেশীয় বীজ উত্তম। পূর্ব্বে এ দেশে যে বীজ আমদানী হইয়াছিল, তাহা বেগুণে ও সবুজ রঙ্গের কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, এখন ইহার নানা নূতন জাতি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই সব্‌জি উৎপাদনার্থ সার-বিশিষ্ট উর্ব্বরা ভূমির আবশ্যক। আশ্বিনমাসে সসার ঝুরা মৃত্তিকাবিশিষ্ট অনাবৃত চৌকায় বীজ বপন করিবে; চৌকার মৃত্তিকা একটু সরস থাকিতে বীজ ছড়াইতে হইবে। তৎপরে ধূলীবৎ চূর্ণ মৃত্তিকা পাতলারূপে ছড়াইয়া উক্ত বীজগুলিকে ঢাকিয়া দিবে। যে দিন বীজ বপন করিবে, সে দিন জল সিঞ্চন করিবে না; অনন্তর প্রতিদিন বৈকালে অল্প অল্প জল সেচন করিবে। বেশী বৃষ্টির সম্ভাবনা বুঝিলে চৌকার উপর পূর্ব্বেই উপযুক্ত আচ্ছাদন রাখিয়া বৃষ্টি শেষ হইলে তাহা সরাইয়া ফেলিবে। এইরূপ করিলে নির্ব্বিঘ্নে চারা উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি পাইবে। যখন চারাগুলিতে চারিটী করিয়া পাতা বাহির হইবে, তখন তাহাদিগকে তুলিয়া উত্তম পাইট করা সার-বিশিষ্ট ক্ষেত্রে স্থায়ীরূপে রোপণ করিবে। ফুলকপি ও বান্ধাকপির চারা জুলির মধ্যে রোপণ করিবার কথা যেরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, ওলকপির চারাও সেই প্রকারে রোপণ করিয়া কিছুদিন পরে পার্শ্বের আইল ভাঙ্গিয়া জমি সমান করিয়া দিবে। চৌকার মধ্যে সমান জমিতে রোপণ করিলেও ক্ষতি হয় না। ইহার জমি একটু বেশী খনিত হওয়া ভাল। চারাগুলিকে পরস্পর কুড়ি বাইশ অঙ্গুল অন্তর রোপণ করা কর্ত্তব্য। জলসিঞ্চনের নিয়ম বান্ধাকপির ন্যায়।

শালগাম।

শালগামের ইংরাজি নাম টর্নিপ। ইহা অতি পুষ্টিকর ও সুখাদ্য সব্‌জি। ইহাতে শরীরের স্বাস্থ্য ও শক্তি বৃদ্ধি করে। সচরাচর দেখা যায়, যে শালগামের পত্র উৎকৃষ্ট তাহার মূল ভাল নহে এবং যাহার মূল উত্তম, তাহার পত্র জঘন্য। আর্লিহোয়াইট, ব্লাকষ্কিন, হগরস্ ইম্প্রুভড্ ননসচ্ প্রভৃতি নামধেয় শালগামের মূল উৎকৃষ্ট; আর সুইড্ জাতীয় শালগাম সুখাদ্য পত্রের নিমিত্ত বিখ্যাত। কিন্তু

এই শেষোক্ত জাতির মূল এত নিকৃষ্ট যে, নিতান্ত আহারের অভাব না হইলে, পশুরাও তাহা ভক্ষণ করিতে চাহে না। শালগাম মনুষ্যের ন্যায় গবাদি পশুর পক্ষেও পুষ্টিকর খাদ্য। ইউরোপ ও আমেরিকায় গৃহপালিত গবাদি পশুদের জন্য ইহার বিস্তর চাষ হইয়া থাকে। ইহা পয়স্বিনী গাভীকে খাওয়াইলে তাহার দুগ্ধের পরিমাণ বেশী হয় এবং দুগ্ধের আস্বাদ অপেক্ষাকৃত মিষ্ট হয় কিন্তু শালগামের মূল যখন কঠিন হইয়া উঠে তখন উহা মনুষ্য বা পশু কাহারও পক্ষে উপকারী এবং সুখাদ্য নহে।

দো-আঁশ মৃত্তিকা-বিশিষ্ট উর্ব্বরা জমি ইহার পক্ষে উপযোগী; মৃত্তিকায় বালির ভাগ কিছু বেশী হইলে ভাল হয়। জমিতে তিন চারিবার লাঙ্গল দিবে এবং প্রতিবার লাঙ্গল দেওয়ার পর যে সমস্ত ঘাস দুর্ব্বা প্রভৃতি জন্মিবে তাহা বাছিয়া ফেলিবে। ডেলা ভাঙ্গিয়া জমির মাটি সমান করিবে, খৈল, উদ্ভিজ্জসার বা প্রাণীসার ক্ষেত্রে ছড়াইয়া মৃত্তিকা উর্ব্বরা করিবে। মৃত্তিকার সহিত কিছু লবণ মিশ্রিত করা হইলে ইহার ফসল ভাল হয়।

ভাদ্রমাসে ঐরূপে জমি প্রস্তুত করিয়া আশ্বিন মাসে বীজ বপন করিবে। চাষের নিমিত্ত বিদেশীয় বীজ উত্তম। বীজ যত টাট্‌কা হইবে, ততই তাহাতে অধিক ফসল জন্মিবে। চারাগুলি ঘন ঘন জন্মিলে নিস্তেজ হয়। রুগ্ন চারাসকল মূল সমেত উপ্‌ড়াইয়া ফেলিবে, অবশিষ্ট চারাগুলি পরস্পর আট অঙ্গুল অন্তরে থাকিলে নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধি পাইতে পারিবে। ইহার পত্রে বায়ু ও আলোক যত লাগিবে ততই ভাল। চারার মূল মৃত্তিকাদ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিয়া দিবে। আবশ্যক মত জল সেচন করিবে; চারা বড় হইয়া উঠিলে সপ্তাহান্তর জল সেচন করিলেই চলে; চারা যত দিন ছোট থাকে তাবৎ দুই তিন দিন অন্তর জল সেচন আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে নিড়ান দ্বারা মৃত্তিকা খুসিয়া দিবে এবং ঘাস দুর্ব্বাদি বাছিয়া ফেলিবে। ভাল বীজ হইলে এক পোয়া বীজে এক বিঘা জমির আবাদ চলিতে পারে।

অর্লিফ্লাট-ডচ ও ফ্লাট-পার্পল টপ এই দুই জাতি শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হয়। অতএব কোন প্রতিবন্ধকে যাঁহাদের সময়মত বীজ বপন করা না হইবে, তাঁহারা এই দুই জাতীয় বীজ মনোনীত করিবেন, ইহারা গুণেও ভাল। গবাদি পশুর জন্য স্কচ ইয়লো, স্থইডি প্রভৃতি জাতি পছন্দ করিবে। দুগ্ধবতী গাভীকে শালগাম খাওয়াইতে হইলে দুগ্ধ দোহনের পর কিছু লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

কয়েকপ্রকার মক্ষিকা এবং সবুজ ও কাল রং মিশ্রিত এক প্রকার পোকা এই সবজির পরম শত্রু। পোকার সঞ্চার বীজের মধ্যেই হয়; বীজ অঙ্কুরিত না হওয়া পর্য্যন্ত বীজ-দল মধ্যে উহা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তৎপরে বীজপত্রের সঙ্গে সঙ্গে বহির্গত হয়। কিছু দিনের মধ্যে পুষ্ট দেহ হইয়া পাতায় পাতায় ভ্রমন করে ও ডিম্ব প্রসব করে এবং সেই ডিম্ব ফুটিয়া অসংখ্য পোকা জন্মে। শীত অধিক হইলে ডিম ফুটিতে বিলম্ব হইয়া থাকে। এইরূপ বৃদ্ধি সহকারে অল্প দিনের মধ্যে অসংখ্য পোকা জন্মিয়া গাছের পাতা এরূপে খাইতে আরম্ভ করে যে তাহাতে অনেক গাছ মরিয়া যায়। যখন শালগামের মূল প্রায় প্রস্তুত হইয়া আইসে অর্থাৎ মূলগুলি তুলিবার বেশী বিলম্ব থাকে না, তখন ঐ পোকার উপদ্রব অধিক হয়। মক্ষিকার উৎপাত এদেশে তত হয় না কিন্তু পোকায় বিলক্ষণ ক্ষতি করে। যাহাউক পোকা ও মক্ষিকার উপদ্রব হইতে গাছ রক্ষা করিতে হইলে গন্ধকের গুঁড়া ও দগ্ধকাষ্ঠের ছাই একত্র করিয়া গাছে ছড়াইবে, কিম্বা কার্ব্বলিক্ এসিড্ জলের সহিত গুলিয়া গাছে ছিটাইবে, ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

গাজর।

গাজরের ইংরাজি শাস্ত্রীয় নাম ক্যারট। ব্রীটনদেশে ইহা স্বভাবতঃ জন্মে। উৎকৃষ্ট সব্জি বলিয়া এ দেশেও ইহার বিস্তর চাষ হয়

এবং এদেশে ইহা উত্তমরূপ জন্মিয়াও থাকে। ইহার মূলের আকৃতি মূলার ন্যায়, কিন্তু ইহার পত্রের সহিত মূলার পত্রের কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। ইহার জমির পাইট অবিকল শালগামের ন্যায়। আশ্বিন মাসে ঐরূপ পাইট করা ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে। ইহার বীজ অতিশয় লঘু, অল্প বাতাসেই উড়িয়া যায়, এজন্য নির্ব্বাত পরিষ্কার দিবসে বীজ বপন করা উচিত।

চারা ঘন ঘন জন্মিলে কতক চারা তুলিয়া ফেলিবে। জলসিঞ্চন করা ও ক্ষেত্র নিড়াইয়া দেওয়া প্রভৃতি অন্য সমুদায় কার্য্য শালগামের ন্যায় করিবে। খৈল, উদ্ভিজ্জসার বা পুরাতন গোবরের সার গাজরের পক্ষে উপযোগী; জমিতে লাঙ্গল দিবার সময় ক্ষেত্রে সার ছড়াইবে। আশ্বিন মাসে বীজ বপন করিতে হইলে, ভাদ্রমাসের শেষে ক্ষেত্র খনন ও সারপ্রদান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া রাখা উচিত। প্রতি বিঘায় চারি মণ খৈল ছড়াইলে যথেষ্ট হইবে।

বিটপালং।

বিট উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য; আহারে শরীরের চর্ব্বি ও মাংশ বৃদ্ধি করে। ইহাতে চিনি প্রস্তুত হয়। ১৮৭৫ সালে জর্ম্মনদেশে ইহার প্রতি ১১ মণ মূল হইতে এক মণ চিনি প্রস্তুত হইয়াছে। আমাদের দেশে ইক্ষু ও খেজুরের রস হইতে প্রচুর চিনি হয়, এই চিনি অপেক্ষা বিটের চিনি উৎকৃষ্ট নহে; সুতরাং চিনি প্রস্তুতের নিমিত্ত এদেশে বিট উৎপাদন আবশ্যক হয় না। খাদ্য তরকারির জন্যই লোকে উহা জন্মাইয়া থাকে। বিট অনেক প্রকার; তন্মধ্যে লাল ও সাদা রঙ্গের বিট মনুষ্যের আহারার্থে ভাল বলিয়া এদেশে তাঁহাই উৎপাদিত হয়। অন্যান্য প্রকারের বিট পশুদিগের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার লোকে যত্নপূর্ব্বক উৎপন্ন করে।

অন্যান্য সামুদ্রিক সব্‌জির ন্যায় বিট অত্যন্ত লবণাশী; যে কৃষক ইহার ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে লবণের সার দেয়, সে কদাচ

ইহার নিমিত্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। পরন্তু কৃষকদিগকে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বিটের আকৃতি তত বৃহৎ করিবার আবশ্যক নাই; কারণ ১০।১২ অঙ্গুল বেড় এবং ১৭।১৮ অঙ্গুল দীর্ঘ হইতে না হইতে ইহা আঁশযুক্ত ও কঠিন হইবার উপক্রম হয়। লাল বিটের মূল এবং সাদা বিটের পত্র আহারার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিট জন্মাইবার নিমিত্ত, ক্ষেত্রের মৃত্তিকা এক গজ পরিমাণে গভীর করিয়া খনন করিবে, এবং খনিত মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণ ও কাঁকরশূন্য করিবে। পরে পূর্ব্ববর্ষীয় সারের সহিত লবণ ও বালুকা মিশ্রিত করিয়া তাহা ঐ ক্ষেত্রের মৃত্তিকার সহিত মিশাইবে। এই প্রকারে ভূমি প্রস্তুত হইলে, ১৮ অঙ্গুল অন্তর পাঁচ অঙ্গুল উচ্চ করিয়া আইল প্রস্তুত করিবে। ঐ সকল আইল উত্তর দক্ষিণাভিমুখ হওয়া চাই এবং তাহাদের উপরে যেন দিবসের কোন সময়ে ছায়া না পড়ে। মৃত্তিকা প্রচুর পরিমাণে খনিত না হইলে মূল হইতে কোঁড় বাহির হইয়া নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

নূতন বীজে বিট উত্তম জন্মে। শীঘ্র জন্মাইবার ইচ্ছা হইলে, ভাদ্র মাসের শেষে মৃণ্ময়পাত্রে অথবা বাক্সের মধ্যে বীজ বপন করিবে। আশ্বিন মাসের মধ্যেই ঐ সকল বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইয়া চারা জন্মিবে এবং সেই সকল চারা উপরোক্ত নিয়মানুসারে আইলে রোপণ করিবে। এইরূপ ভাদ্র হইতে পৌষমাস পর্য্যন্ত বীজ রোপণ করিয়া ক্রমান্বয়ে একাধিকবার ফসল পাওয়া যায়।

বিটের চারাগুলিকে বিনা ক্লেশেই স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। কারণ মূল শিকড় না ছিঁড়িলে, তাহাদিগের কোন প্রকার অনিষ্ট হয় না। প্রথম ফসল উঠিয়া গেলে দ্বিতীয় ফসলের সময় আইলের উপরে ১৬ অঙ্গুল অন্তরে অন্তরে এক একটী গর্ত্ত করিয়া, তন্মধ্যে তিন চারিটী বীজ নিহিত করিবে। যখন চারা জন্মিয়া তাহাতে চারিটী করিয়া পত্র উদ্গত হইবে, তখন নিস্তেজ চারাগুলি বাছিয়া ফেলিবে।

শ্বেত বিটের পত্র সকল বড়; এজন্য এই জাতীয় চারা ২০ অঙ্গুল অন্তরে অন্তরে রোপণ করিবে এবং ইহার রোপণের আইলও ২০ অঙ্গুল অন্তর করিতে হইবে। এই শ্বেত বিটের চারা আইলের উপরে রোপণ করার পর একমাস গত হইলে অর্থাৎ চারাগুলি বাড়িয়া উঠিলে, তাহাদের মধ্য হইতে তৃণ ও পতিত পত্র বাছিয়া ফেলিবে। এই পরিষ্কার করণ সময়ে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া চাই; কারণ শ্বেত বিটের পাতা অতিশয় ভঙ্গপ্রবণ। বিটের ক্ষেত্রে প্রচুর জল সেচন করা আবশ্যক।

মূলা।

মূলার ইংরেজি শাস্ত্রীয় নাম রেডিস। ইহা তিন প্রকার; শাল-গাম জাতীয়, দীর্ঘমূলীয় ও স্পেনিজ জাতীয়। এদেশে দীর্ঘমূলীয় জাতির চাষই বেশী; বিদেশের আমদানী বীজ লইয়া শালগাম ও স্পেনিজ জাতীয় মূলার আবাদও হইয়া থাকে। শালগাম জাতীয় মূলার আকৃতি ডিম্বের ন্যায় হয় বলিয়া সাধারণ লোকে তাহাকে আণ্ডামূলা কহিয়া থাকে। দেশীয় মূলায় সচরাচর শ্বেত ও লোহিত এই দুই প্রকার বর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু বিদেশীয় আমদানী বীজ-জাত মূলার শ্বেত, কৃষ্ণ, হরিদ্রা, লোহিত ও বিবিধ মিশ্রবর্ণ দেখা যায়।

মূলার জমির পাইট শালগামের ন্যায়। দীর্ঘমূলীয় ও স্পেনিজ জাতীয় মূলার মূল লম্বা হয় বলিয়া উহাদের জমি একটু অধিক গভীর করিয়া খনন করিতে হয়। আঠার বা কুড়ি অঙ্গুলি গভীর করিয়া মৃত্তিকা খনন করিলেই এই দুই জাতির উপযুক্ত হইবে। শালগাম জাতীয় মূলার জন্য অর্দ্ধ হস্ত গভীর করিয়া মৃত্তিকা খনন করিবে। খনিত মৃত্তিকা ধূলীবৎ চূর্ণ করিয়া তাহা হইতে কাঁক-রাদি বাছিয়া ফেলিবে। প্রতি বিঘায় পাঁচ মণ খৈলের সার দিবে। এদেশে আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বীজ বপন করা যাইতে

পারে। বীজ ছড়াইয়া একবার মোই টানিবে, তাহা হইলে বীজগুলি মৃত্তিকাবৃত হইবে। মৃত্তিকা নিতান্ত নীরস বোধ না হইলে জল সিঞ্চন করিবে না।

চারা ঘন ঘন জন্মিলে, যখন তাহারা শাক খাওয়ার উপযুক্ত পরিমাণে বাড়িয়া উঠিবে, তখন শাক খাওয়ার জন্য কতক তুলিয়া অবশিষ্ট চারাদিগের বৃদ্ধির সুবিধা করিয়া দিবে। চারাগুলি পরস্পর সাত আট অঙ্গুল অন্তরে থাকিলে বর্দ্ধিত হওয়ার পক্ষে বাধা ঘটে না। ইহার ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের নিয়ম শালগামের ন্যায়; আবশ্যক মত জল না পাইলে ইহার মূল শীঘ্র কঠিন ও আঁশাল হইয়া পড়ে। অত্যন্ত বড় করিবার আশায় মূলাকে অধিক দিন ক্ষেত্রে রাখিলে ইহার উপাদেয়ত্ব থাকে না। তিন চারি বৎসরের পুরাতন বীজে মূলা ভাল হয়। এক ছটাক বীজে এক কাঠা জমির আবাদ চলিতে পারে।

গোল-আলু।

গোল-আলু অতি উৎকৃষ্ট তরকারি। ইহার পুষ্টিকারিতা শক্তি এত অধিক যে, কোন কোন দেশের লোকে কেবল আলু খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহার চাষে লাভও অনেক, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আজও বঙ্গদেশের সকল স্থানে ইহার চাষ আরম্ভ হয় নাই। ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি অনেক জেলার লোকের সংস্কার এই যে, ঐ সকল স্থানের মৃত্তিকায় আলু জন্মিতে পারে না। এই সংস্কার বশতঃ তত্রত্য লোকে আলুর চাষে একেবারে উদাসীন। আমরা বিশেষ পরীক্ষাদ্বারা জানিয়াছি, রীতিমত মনোযোগী হইয়া চাষ করিলে, চব্বিশপরগণা, হুগলি, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের ন্যায় ঐ সকল স্থানেও বিস্তর আলু জন্মিতে পারে। যাঁহারা আমাদের কথার সত্যতা পরীক্ষা করিতে চান, তাঁহাদিগকে আমরা অনুরোধ করি যে, উক্ত ভ্রমসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়ম মত ইহার চাষে প্রবৃত্ত

হউন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, ইহা কেমন জন্মে এবং ইহার চাষে কেমন লাভ হয়।

পরিষ্কার হাল্কা নূতন পলিপড়া ভূমি আলু চাষের পক্ষে অত্যুত্তম। এরূপ ভূমিতে সার না দিলেও আলুর গাছ অতিশয় বাড়িয়া উঠে এবং ফসল অধিক হয়। সাধারণ দো-আঁশ মৃত্তিকায় আলু জন্মাইতে হইলে, আশ্বিন মাসে ভূমি খননপূর্ব্বক তাহাতে চূণ, বালি, খৈল ও পচাপাতার সার দিবে। এই সকল সার একবারে সংগ্রহ না হইলে, পলিমাটি, খৈল ও গোবরের সার যথেষ্ট পরিমাণে দিবে। অস্থি চূর্ণের সার আলুর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। যদি মাঘ বা ফাল্গুন মাসে শুষ্ক ডোবা বা পয়নালা হইতে পলিমাটি ক্ষেত্রে তুলিয়া একবার লাঙ্গল দিয়া রাখা যায়। তাহা হইলে আশ্বিন মাসে আর কোন সার না দিয়া কেবল খৈলের সার দিলেই সেই ক্ষেত্রে আলু উত্তম জন্মে। যে স্থানের মৃত্তিকা বারমাস ভিজা থাকে, তথায় আলু জন্মে না; এজন্য নাবাল জমিতে ইহার চাষ করাউচিত নয়।

ক্ষেত্রের মৃত্তিকা প্রায় এক হস্ত গভীর করিয়া খননকরতঃ খনিত মৃত্তিকা ধূলার মত চূর্ণ করিবে। মৃত্তিকা যত অধিক খনিত ও চূর্ণিত হইবে, ততই ফসল ভাল জন্মিবে। অতঃপর এক এক হস্ত অন্তরে উত্তর দক্ষিণে লম্বা রাখিয়া জুলি প্রস্তত করিবে। জুলির গভীরতা অর্দ্ধ হস্ত হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক জুলির মধ্যে ১৫।১৬ অঙ্গুল ব্যবধানে এক একটী বীজ-আলু বসাইবে। বীজ রোপণ সময়ে যে দিকে অধিক চোক্ থাকিবে, সেই দিকে উপরে রাখিয়া মাটি চাপা দিবে। মাটি চাপা দেওয়ার সময় সতর্ক থাকিবে, যেন অঙ্কুরের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। বীজের উপর চারি ক্রুলের অধিক মাটি চাপা দেওয়ার আবশ্যক নাই। বর্ষা শেষ হইলে আশ্বিন মাসের শেষে,বীজ রোপণ করা যাইতে পারে। নতুবা কার্ত্তিক মাসের প্রথমে রোপণ করিবে। যাবৎ অঙ্কুর বাহির না হয়, তাবৎ প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে বীজের উপর অল্প পরিমাণে জল ছিটাইয়া দিবে, অধিক জল দিলে অনিষ্ট হইবে।

বীজে যতগুলি চোক্ থাকে, প্রায় সকলগুলি হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া এক একটা বীজ হইতে এক এক ঝাড় চারা জন্মে; তন্মধ্যে নিস্তেজগুলি ভাঙ্গিয়া দিলে অবশিষ্টগুলি অত্যন্ত তেজাল হইয়া উঠিবে। চারা পাঁচ ছয় অঙ্গুলি বাড়িয়া উঠিলে, একবার সমস্ত জমিতে উত্তমরূপে জল সেচিয়া দিবে এবং ঐ জল টানিয়া যখন মাটিতে "যো" হইবে, তখন মাটি খুঁড়িয়া হাতে গুড়া করিয়া সেই মাটি চারার গোড়ায় চাপিয়া দিবে। আট নয় দিন অন্তর এইরূপ জল সিঞ্চন করিবে ও মাটিতে "যো" হইলে খুঁড়িয়া চারার গোড়ায় দিবে। ক্রমান্বয়ে এইরূপ করিলে পার্শ্বের দাঁড়াগুলি জুলির মত হইবে এবং চারার গোড়ার মাটি প্রথম রোপণের স্থান অপেক্ষা পোনের ষোল অঙ্গুল উচ্চ হইবে: ত্রিহুত ও আরা জেলায় বার চৌদ্দবার জল সেচনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু আমাদের দেশে চারি বার জল সেচন করিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে।

রীতিমত পাইট হইলে, দেড় বা পৌনে দুই মাসেব মধ্যেই আলু খাইবার যোগ্য হয়। অগ্রহায়ণের শেষে বা পৌষ মাসের প্রথমে আলু তোলা যাইতে পারে। আলু তুলিবার জন্য কোন অস্ত্র ব্যবহার না করিয়া বিদাকাটি ব্যবহার করিবে, অথবা হাত দিয়া তুলিবে। প্রথমবার ছোট আলু না তুলিয়া বড় বড় আলুগুলি তুলিয়া লইবে এবং ছোট আলু সমেত গাছের গোড়া পুনরায় মৃত্তিকাদ্বারা উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিবে। ইহার তিন চারি দিন পরে একবার জল সিঞ্চন করিবে, তাহাতে গাছের তেজ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে।

মাঘমাস দ্বিতীয়বার ফসল তুলিবার উপযুক্ত সময়। এই সময়ে সমুদায় আলু একেবারে তুলিয়া ফেলিতে হয়। গাছ শুকাইয়া গেলে ফসল তোলা ভাল। এক ভূমিতে একক্রমে দুই বৎসর আলুর চাষ করিলে, প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসরের ফসল বড় হয়। মাঘমাসের প্রাপ্ত ফসল হইতে লোকে বীজের জন্য ছোট ছোট আলু রাখে। বীজের নিমিত্ত ছোট আলু রাখা সুবিধাজনক বটে, কারণ ছোট আলু শীঘ্র পচে না, কিন্তু ছোট বীজ ফসল বড় হওয়ার

পক্ষে বিঘ্নকর। ঈষৎ অপক্ক লম্বাকৃতির আলু, বীজের জন্য রাখিলে গাছ অতিশয় তেজাল ও ফসল অনেক বড় হয়। সাধারণতঃ তিন চারিটা চোক বিশিষ্ট মধ্যম পরিমাণের আলু বীজরূপে গণ্য হইতে পারে। বীজ যত্নপূর্ব্বক না রাখিলে অধিকাংশ পচিয়া নষ্ট হয়। যে ঘরে বায়ু উত্তমরূপে খেলে, সেই ঘরের মধ্যে মাচা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি শুষ্ক বালি ছড়াইবে এবং সেই বালির উপর বীজ আলুগুলি ছড়াইয়া রাখিবে। এত যত্নে রাখিলেও কতক বীজ নষ্ট হয় কিন্তু অধিকাংশ ভাল থাকে। দুই তিন বৎসর হইল আমেরিকা হইতে তিলের মত আলুর এক প্রকার বীজ এদেশে আমদানী হইয়াছে। ঐ বীজে গাছ ভাল জন্মে না, সুতরাং উক্ত বীজ লইয়া আবাদ করা ফলপ্রদ নহে।

সচরাচর যে ক্ষুদ্র আলু বীজের জন্য রাখা হয়, তাহার সোয়া বা দেড় মণ হইলেই এক বিঘা জমির আবাদ হইতে পারে, কিন্তু মধ্যমাকৃতির লম্বা আলু বীজের জন্য রাখিলে, তাহার চারি পাঁচ মন বীজ প্রতি বিঘায় দরকার হয়। ইহাতে বীজ কিছু বেশী ওজনের লাগিলেও ফসলে লাভ ভিন্ন লোকসান হয় না। কারণ ছোট বীজের আবাদ অপেক্ষা বড় বীজের আবাদে দ্বিগুণেরও অধিক ফসল পাওয়া যায়। ছোট বীজ লইয়া আবাদ করিয়া এদেশের কৃষকেরা বিঘা প্রতি ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৫০।৬০ মণের অধিক আলু পায় না কিন্তু মেঃ নাইট সাহেব বলেন, উৎকৃষ্ট বড় বীজ বিদেশ হইতে আনাইয়া বিশুদ্ধ প্রণালীতে আবাদ করিলে, এক বিঘা জমিতে তিনশত মণেরও অধিক আলু জন্মে। নাইট সাহেবের কথা আমাদের অন্তঃকরণে ভালরূপ ধারণা হয় না, কিন্তু ক্ষুদ্র বীজ অপেক্ষা বড় বীজে দ্বিগুণের অধিক ফসল প্রাপ্তি বিষয়ে আমরা সন্দেহ করি না। নাইট সাহেব লিখিয়াছেন, বিদেশীয় বীজে সাড়ে পাঁচ সের অপেক্ষা অধিক ভারী এক একটা আলু জন্মে। যাঁহারা বড় বীজ লইয়া চাষ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ক্ষেত্র মধ্যে সোয়া হাত অন্তর জুলি প্রস্তুত করিয়া জুলির মধ্যে দেড় হাত অন্তর বীজ রোপণ করিবেন।

বৃহদাকার বীজের এক এক ভাগে দুই তিনটী চোক্ থাকে এরূপে কাটিয়া রোপণ করিলেও চারা হয় কিন্তু এদেশে কাটিয়া রোপণ করা অপেক্ষা অখণ্ড বীজ রোপণে অধিক ফসল হয়। খণ্ড খণ্ড করিয়া পুতিলে অঙ্কুর বাহির হইবার অগ্রে প্রায় ঐ সকল খণ্ড শুষ্ক হইয়া যায় এবং পোকায় ধরে।

এদেশীয় কৃষকেরা আলুর চাষে বিঘাপ্রতি সমুদায় খরচ বাদে ঊর্দ্ধ সংখ্যা পঞ্চাশ টাকা লাভ করে কিন্তু ভাল বীজ লইয়া বিশুদ্ধ প্রণালীতে চাষ করিলে, ঐ লাভের হার অনেক বৃদ্ধি হইতে পারে।

সেলেরী।

সেলেরী এক প্রকার উৎকৃষ্ট শাক। ইহা কাঁচাও খাওয়া যায়, গন্ধ উত্তম। এই গাছের কোমল শাখা সকল কচুগাছের পত্রদণ্ডের ন্যায় গোড়া হইতে কোষাকারে মজ্জাকে বেষ্টনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। প্রত্যেক শাখার অগ্রভাগে কতকগুলি করিয়া পাতা হয়। বিল্বপত্রের সহিত ইহার পত্রের আকৃতিগত কতক সাদৃশ্য আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় সচরাচর জলের ধারে ছায়াবিশিষ্ট স্থানে ইহা পাওয়া যায়। এই জন্য ইহার চাষে কৃতকার্য্য হইতে হইলে, যথাসাধ্য ভৌতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া, কৌশলে ইহার প্রাকৃতিক অভাব সকল মোচম করা আবশ্যক।

সেলেরী অনেক প্রকার; সমুদায়ই বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। প্রতি কাঠায় দুই ছটাক বীজ লাগে। মাঘমাসে কোন ছায়াবিশিষ্ট স্থানে ইহার বীজ বপণ করিয়া চারা জন্মাইবে এবং গরমের সময় জল সেচন করিয়া চারাগুলিকে প্রতিপালন করিবে। শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত এই অবস্থায় রাখিবে। ভাদ্রমাসে ইহার জমিতে উত্তর দক্ষিণাভিমুখ করিয়া ১২ হাত লম্বা, ৩২ অঙ্গুলি চৌড়া এবং এক গজ গভীর জুলি কাটিবে। ঐ জুলি কাটিবার সময় যে মাটি উঠিবে, তাহা জুলির দুই পার্শ্বে জমা করিয়া রাখিবে। কারণ পরে চারার মাটি

দিবার সময় ঐ মাটির প্রয়োজন হইবে। জুলির মধ্যে প্রথমে উত্তম গোময়ের সার এক হাত পুরু করিয়া ফেলিবে। তদুপরি আট অঙ্গুল পর্য্যন্ত বালুকা মিশ্রিত ঝুরা মাটি দিবে। এইরূপে স্থান প্রস্তুত হইলে তন্মধ্যে পরস্পর ১৬ অঙ্গুল অন্তর তেজাল চারাগুলি রোপণ করিবে। এই নিয়মে ১৫ দিন অন্তর জুলি পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে, জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ অবস্থার সেলেরী প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার জুলি পরিবর্ত্তনের সময় প্রথম জুলিতে যে সকল চারা ছিল, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী চারাগুলিই স্থানান্তর করিবে।

চারা ২০ অঙ্গুল উচ্চ হইলে, তাহাদের গোড়া মৃত্তিকাদ্বারা আবৃত করিয়া দিবে। সেলেরী কাটিবার ১৫ দিন পূর্ব্বে গাছের গোড়া হইতে মস্তকের আট অঙ্গুলি নিম্ন পর্য্যন্ত মৃত্তিকাদ্বারা এরূপে ঢাকিয়া দিবে যে তাহার মধ্যে আলো বা বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। এই রূপে মৃত্তিকাচ্ছাদিত করিয়া চারি পাঁচ দিন অন্তর জল দিবে। ঐ জল যেন গাছের মধ্যে প্রবেশ না করে। তাহা হইলেই ইহা শ্বেতকায় হইবে; শ্বেতকায় করিবার জন্য অন্য কোন প্রকার উপায় অবলম্বনের আবশ্যক করে না।

শ্বেতবর্ণ করার পর সেলেরিকে অধিক দিন বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া উচিত নহে; কারণ তাহা হইলে, পোকায় নষ্ট করিয়া ফেলে এবং অধিক বড় হইলে সুস্বাদু হয় না। লাল সেলেরীর গাছ অত্যন্ত ঝাকড়া ও নিরেট হয় এবং এই সেলেরী অধিক সুস্বাদু। আশ্বিনের শেষে কার্ত্তিক মাসেও সেলেরীর চাষ হয়, চারা উৎপাদন পূর্ব্বক চৌকা জমিতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে জুলির মধ্যে চারা রোপণ করিয়া, ১৫ দিন পরে জুলি পরিবর্ত্তন করিলে এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গোড়ায় মাটি দেওয়া ও জল সেচন করা প্রভৃতি কার্য্য করিলে মাঘ মাসেও সেলেরী প্রস্তুত হয়, এদেশে কৃষকেরা এই সময়েই সেলেরী জন্মাইয়া থাকে, ইহার ক্ষেত্রে যথেষ্ট জল আবশ্যক।

কার্ডুন।

কার্ডুন এক প্রকার শাক, ইহার অভ্যন্তরের পাতা ও কোঁড় উপাদেয় খাদ্য। বালুকা মিশ্রিত উর্ব্বরা মৃত্তিকায় এই সব্‌জি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ক্ষেত্র মধ্যে তিন বা সাড়ে তিন হাত অন্তর অন্তর লম্বালম্বি শ্রেণী করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীতে পরস্পর আড়াই হাত অন্তর এক একটী গর্ত্ত করিবে এবং প্রত্যেক গর্ত্তে দুইটী করিয়া বীজ রোপণ করিবে। বীজের উপর পাতলা রূপে মাটি চাপা দিয়া প্রত্যহ বৈকালে অল্প অল্প জল সেচন করিবে। চারা জন্মিয়া যখন পোনের ষোল অঙ্গুল বাড়িয়া উঠিবে, তখন প্রতি গর্ত্ত হইতে অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ চারাগুলি উৎপাটন করিয়া, এক এক গর্ত্তে এক একটী মাত্র চারা রাখিবে। জ্যৈষ্ঠ মাস বীজ রোপণের উপযুক্ত সময়।

কার্ডুন আহারোপযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তাহাকে শ্বেতবর্ণ করিতে হয়। এই শ্বেতবর্ণের প্রক্রিয়াকে ইংরেজিতে ব্লাঞ্চিং (Blanching) কহে। ইহা করিতে হইলে, চারাটিকে আলোক সংসর্গ রহিত করিতে হয়। এদেশে এই প্রক্রিয়া করিয়া বাঁশের কোঁড়ক খাইয়া থাকে। অর্থাৎ বাঁশের কোঁড়ক কোন মৃণ্ময় পাত্রদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলে, কিছু দিন পরে তাহা শ্বেতবর্ণ হয় এবং বান্ধা কপির অভ্যন্তর ভাগের আকার ধারণ করে; তখন তাহা রন্ধন করিয়া খাওয়া যাইতে পারে।

কার্ডুনের চারা দুই হাত উচ্চ হইলে, সমুদায় কোঁড়ক সহিত গাছ একত্র করিয়া বান্ধিয়া দিবে। তাহা হইলে দশ দিনের মধ্যে তাহারা শ্বেতবর্ণ ধারণ করিবে।

আর্টিচোক।

আর্টিচোক দ্বিবিধ; সূচিকাগ্র ও গোল। বীজ রোপণ করিয়া কিম্বা ফেঁকড়ি প্লুতিয়া চারা জন্মান যাইতে পারে। দো-আঁশ

মৃত্তিকা-বিশিষ্ট উর্ব্বরা ক্ষেত্রকে উত্তমরূপে পাইট করিয়া, তন্মধ্যে আইল প্রস্তুত করিবে। প্রতি দুই আইলের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান, অন্ততঃ এক হস্ত হওয়া আবশ্যক। আইল প্রস্তুত হইলে, তাহাতে পরস্পর ষোল অঙ্গুলি অন্তর বীজ রোপণ করিবে। চারা জন্মিয়া যাবৎ তাহারা ষোল সতের অঙ্গুল বড় না হইবে, তাবৎ তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবে না। ঐ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইলে,পরস্পর একগজ ব্যবধানে চারাগুলি তুলিয়া বসাইবে। ইহার ক্ষেত্রে প্রচুর জল সেচন আবশুক ; বীজোৎপন্ন চারার প্রতি যেরূপ কার্য্য করিবার কথা উক্ত হইল, ফেঁকড়ি-জাত চারা সম্বন্ধেও সেইরূপ করিতে হইতে হইবে। আর্টিচোকের আবাদে বেশী সতর্কতার প্রয়োজন হয় না; কারণ ইহার গাছ মরিয়া গিয়া স্বতঃই পুনরুদ্গত হইয়া থাকে। আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত বীজ রোপণের উপযুক্ত সময়।

জেরুজিলম্ আর্টিচোকের উৎপাদন প্রণালী কিছু স্বতন্ত্র। ইহার ছোট ছোট গেঁড় অখণ্ড অবস্থায় রোপণ করিতে হয়। এই গাছ দুই বা আড়াই হাত বড় হয় এবং প্রচুর পরিমাণে পুষ্পিত হইয়া থাকে। পরিপক্ক হইবার পর আর গেঁড় মৃত্তিকাভ্যন্তরে রাখা উচিত নহে ; কারণ তাহা হইলে, উই প্রভৃতি কয়েক প্রকার কীটে অতিশয় ক্ষতি করে।

এই জাতীয় গেঁড় রোপণ করিবার জন্য অধিক উর্ব্বরা জমির আবশুক নাই। সাধারণ দো-আঁশ মৃত্তিকা খুঁড়িয়া সোয়া হাত বা দেড় হাত চৌড়া আইলে শ্রেণীবদ্ধরূপে পরস্পর কুড়ি অঙ্গুলি অন্তর এক একটী গেঁড় পুতিবে। গোল-আলুর চারার মূলে মৃত্তিকা যেরূপে স্তূপ করিয়া দিতে হয়, ইহার চারার মূলেও সেইরূপ দিবে। গাছ মরিয়া গেলে পর গেঁড় তুলিয়া লইবে এবং ইন্দুরাদিতে নষ্ট না করে, এজন্য গৃহে বালুকার মধ্যে রাখিবে। ইহার রোপণের সময় বৈশাখ হইতে জ্যৈষ্ঠের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত।

ছালাদ।

ছালাদ উৎকৃষ্ট শাক। ক্রেশ, লেটুস্, কস্‌লেটুস্, চার্ব্বিল ও এণ্ডিব এই কয়েক প্রকার ছালাদ অতি বিখ্যাত এবং সুখাদ্য। ইহাদের সকলেরই উৎপাদন নিয়ম একরূপ। ভাদ্রমাসের শেষ হইতে পৌষ মাসের প্রথম পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে হাপোরে বীজ বপন করিয়া ইহাদের চারা জন্মাইতে হয়। যে জমিতে স্থায়ীরূপে ঐ সকল চারা রোপণ করা হইবে, পূর্ব্বেই সেই জমি উত্তমরূপে খুঁড়িয়া ও সার দিয়া তাহা প্রস্তুত রাখিতে হয়। হাপোরে চারাগুলি চারি অঙ্গুলি প্রমাণ বাড়িয়া উঠিলে, তাহাদিগকে তুলিয়া উক্ত পাইট করা জমিতে পরস্পর আধ হাত অন্তর রোপণ করিতে হয়। জমি সরস রাখিবার জন্য আবশ্যকমত জল সেচন আবশ্যক। জল সেচনের পর মাটিতে "যো" হইলে, সময়ে সময়ে মৃত্তিকা খুঁড়িয়া ও নিড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এক মাসের মধ্যেই এই শাক প্রস্তুত হইয়া উঠে।

কস্‌লেটুস্ আহার যোগ্য হইবার পূর্ব্বে, খড়দ্বারা ক্রমশঃ গাছ জড়াইয়া তাহাকে শুভ্রবর্ণ করিয়া লইতে হয়। ছালাদ সাহেবদিগের উপাদেয় খাদ্য, এখন দেশীয়দিগের মধ্যেও অনেকে ইহার বিশেষ আদর করেন; এজন্য ছালাদের চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার পক্ষে খৈল ও পচাপাতার সার উপযোগী। প্রতি বিঘায় দশ বার মণ খৈল আবশ্যক। ইহার চাষে বিলক্ষণ লাভ হয়।

সেজ।

ইহার পত্র সুগন্ধি মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। এই মসলা মাংসে দিলে যেমন সুগন্ধ হয়, তেমনি মাংসকে শীঘ্র সুসিদ্ধ করে। কার্ত্তিক মাস বীজ রোপণের উপযুক্ত সময়। টবে বা গামলায় বীজ রোপণ করিয়া চারা জন্মাইতে হয়। প্রথমতঃ টব বা গামলার অর্দ্ধেক অংশ কয়লা ও পাথর বা ঝামার টুকরা দ্বারা পূর্ণ করিয়া উপরের দেড় অঙ্গুল

বাদে অবশিষ্ট অংশে উত্তম উর্ব্বরা মৃত্তিকা দিবে। পরে উহাতে বীজ বপন করিয়া চারা উৎপন্ন হইলে, যখন তাহারা দুই অঙ্গুল প্রমাণ বাড়িয়া উঠিবে তখন তাহাদিগকে আট অঙ্গুলি অন্তর রোপণ করিবে। বৈশাখ মাসে এই গাছ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়; তখন মূল-সমেত গাছ টানিয়া তুলিবে এবং ছায়ায় রাখিয়া পাতাগুলি শুকা-ইয়া লইবে।

পার্শেলি।

পার্শেলি এক জাতীয় উৎকৃষ্ট সুগন্ধি শাক। ইহা বৎসরে দুইবার জন্মিতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষে বৎসরে একবারের অধিক জন্মে না। কারণ বর্ষা আরম্ভ হইলে ইহার গাছ একবারে বিনষ্ট হয়।

আশ্বিন মাস বীজ বপনের সময়, ইহার বীজ অঙ্কুরিত হইতে কিছু বিলম্ব হয়। উত্তম পাইট করা চৌরস জমিতে বীজ ছড়াইবে, বীজ ছড়াইবার পূর্ব্বে জমিতে জল সেচন করিবে এবং যখন মাটি অল্প সরস থাকিবে, তখনই বীজ বপন কর্ত্তব্য। চারাগুলি চারি পাঁচ অঙ্গুলি বাড়িয়া উঠিলে মধ্যের কতক চারা তুলিয়া ফেলিয়া অব-শিষ্ট চারাসকল পরস্পর অর্দ্ধ হস্ত অন্তর থাকে, এরূপ করিবে। চারা ইহা অপেক্ষা ঘন থাকিলে, ইহার পাতা উপযুক্ত বৃদ্ধি পাইয়া সুন্দররূপে কোঁকড়াইতে পারে না। চারা জন্মিবার পর ক্ষেত্রে তরল সার দিতে পারিলে ইহার গাছ অত্যন্ত সতেজ হইয়া উঠে। মৃত্তিকা সরস রাখিবার জন্য আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিবে।

পার্শনিপ।

পার্শনিপের মূল উত্তম তরকারি। চাষের নিয়ম না জানায় এদেশে ইহা অধিক জন্মে না। বিদেশ হইতে যে বীজ আমদানী হয়, তাহা লইয়া চাষ করিবে।

হাল্কা বালুকা মিশ্রিত মৃত্তিকা ইহার পক্ষে উপযোগী। ঐরূপ মৃত্তিকাবিশিষ্ট ক্ষেত্র এক গজ গভীর করিয়া খনন করিবে এবং মৃত্তিকার সহিত পুরাতন গোবরের সার উত্তমরূপে মিশাইবে, মাটি খুব গুড়া করিয়া তাহাতে যে সকল কাঁকর, পাথর প্রভৃতি থাকিবে, তাহা বাছিয়া ফেলিবে। দিবসের কোন সময়ে ছায়া না পড়ে, তদ্রূপ স্থানে ইহার ক্ষেত্র হওয়া উচিত। রোপণ সময় উপস্থিত হইলে বীজের সহিত ভিজা বালি মিশ্রিত করিয়া সেই বালিমাখা বীজ ক্ষেত্রে ছড়াইবে। ভিজা বালি ইহার অঙ্কুরোদ্গমের পক্ষে সাহায্যকারী হইয়া থাকে। এই বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয়। ক্ষেত্রে অর্দ্ধহস্ত অন্তর চারি অঙ্গুল উচ্চ আইল প্রস্তুত করিয়া, সেই আইলের উপর ইহার বীজ রোপণ করা যাইতে পারে। সমতল জমিতে বীজ বপন করিলেও হানি হয় না। চারাগুলি পাঁচ ছয় অঙ্গুল বাড়িয়া উঠিলে, তাহাদিগকে পরস্পর অর্দ্ধহস্ত অন্তর রাখিবার জন্য মধ্যের কতক চারা তুলিয়া ফেলিবে। চারা ঘন থাকিলে, নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

আশ্বিন মাসে বীজ বপন করিবে। যখন চারাগুলি ছোট থাকিবে তখন প্রতিদিন বৈকালে জল সেচন কর্ত্তব্য।

স্পিনাক।

স্পিনাক এক জাতি উৎকৃষ্ট শাক। ইহার পত্র অতি পুষ্টিকর ও সুখাদ্য, হাল্কা উর্ব্বরা জমি ইহার পক্ষে উপযোগী। ঐ জমিতে সর্ব্বদা রৌদ্র পাওয়া আবশ্যক। চারি হাত লম্বা ও চারি হাত চৌড়া জমিতে যে গাছ জন্মে, তদ্দ্বারা একটী ক্ষুদ্র পরিবারের প্রয়োজন সম্পন্ন হইতে পারে।

জমি উত্তমরূপে পাইট করিয়া ভাদ্র মাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে বীজ বপন করিবে। বীজ বপনের পর

একবার মৈ টানিলে, বীজগুলি মৃত্তিকাবৃত হইবে। অঙ্কুর না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন বৈকালে অল্প অল্প জল সেচন করিবে। চারা জন্মিলে, যথেষ্ট জল দেওয়া আবশ্যক। চারাগুলিকে পরস্পর অর্দ্ধহস্ত অন্তরে রাখিবে।

পাতা খাওয়ার উপযুক্ত হইলে, বাহিরের পাতা অগ্রে কাটিবে এবং মধ্যের পত্রগুলি পুনরায় সংগ্রহের জন্য বৃদ্ধি হইতে দিবে। এইরূপে ক্রমশঃ পত্র সংগ্রহ করিলে প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, অথচ গাছের কোন হানি হয় না।

ভেজিটেবল ম্যারো।

ইহার গাছ লতার মত। গাছের প্রতি পত্রকক্ষ হইতে প্রায় ফল জন্মে; ফলগুলি কুমড়ার মত, উহা উত্তম তরকারি। লতাগুলি ফলবতী হইলে অতি সুন্দর শোভা হয়।

আলোক ও বায়ু উত্তমরূপ প্রাপ্তির কোন বাধা না থাকে, এরূপ খোলা জমিতে ইহার আবাদ করিবে। ক্ষেত্রের মৃত্তিকা হাল্কা ও উর্ব্বরা হওয়া আবশ্যক। অগ্রহায়ণ মাসে ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া উপরে একস্তর গোবর বা খৈলের সার ছড়াইয়া রাখিবে এবং যখন চারা রোপণের সময় হইবে, তাহার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পুনরায় মৃত্তিকা খুঁড়িয়া মাটির সহিত ঐ সার ভালরূপে মিশাইবে; খনিত মৃত্তিকা উত্তম চূর্ণ করিবে।

পৌষমাসে বাক্সে বা টবে সার-বিশিষ্ট উত্তম ঝুরা মৃত্তিকার মধ্যে পরস্পর চারি অঙ্গুলি ব্যবধান রাখিয়া এক একটী বীজ রোপণ করিবে। চারা জন্মিয়া যখন তাহাতে চারিটী করিয়া পত্রোদ্গম হইবে, তখন তাহাদিগকে তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রস্তুত জমিতে পরস্পর পাঁচ হাত অন্তর রোপণ করিবে। টব হইতে চারা তুলিবার সময় গোড়ার মাটি সমেত তুলিবে। ক্ষেত্রে রোপণ করার পর যাবৎ

শিকড় ঐ স্থানের মৃত্তিকায় ভালরূপ না লাগিবে, তাবৎ প্রতিদিন বৈকালে জল সেচন করিবে। গাছ বড় হইয়া উঠিলে, মৃত্তিকা সরস রাখিবার নিমিত্ত আবশ্যকমত জল দিবে।

যখন চারাগুলি দুই বা আড়াই হাত বাড়িয়া উঠিবে, তখন গাছের গোড়ার যে স্থান হইতে ফেকড়ী জন্মিবে, সেই সন্ধি স্থান পর্য্যন্ত মৃত্তিকা দ্বারা ঢাকিয়া দিবে, তাহা হইতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় জন্মিয়া গাছে বিলক্ষণ তেজ করিবে। কাষ্টার্ড ম্যারো সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

স্কোয়াস (কুম্‌ড়া)।

বিদেশীয় আমদানী বীজের মধ্যে নানা জাতীয় স্কোয়াসের বীজ আসিয়া থাকে; তন্মধ্যে টরবান, বোষ্টনম্যারো এবং ইয়কোহামা এই তিন জাতি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহাদের গাছ দেশীয় কুম্‌ড়ার গাছের ন্যায় বৃদ্ধি পায় না এবং ফলও দেশীয় কুম্‌ড়ার মত বৃহৎ হয় না কিন্তু ফলগুলি উত্তম তরকারি।

প্রাচীর বা বেড়ার ধারে গোলাকার গর্ত্ত খুঁড়িবে। বালি ও গোবরের সার সমান ভাগে মিশাইয়া ঐ গর্ত্তে দিবে, এবং প্রতি গর্ত্তে তিনটি করিয়া বীজ পুঁতিবে। চারা বড় হইলে, ঐ প্রাচীর বা বেড়াতে তাহাদিগকে লতাইতে দিবে। পৌষমাস বীজ [illegible] সময়।

এদেশে [illegible] বা মিঠে কুম্‌ড়া, ছাঁচি বা চাল কুম্‌ড়া এবং গামকুম্‌ড়া, এই তিন প্রকার কুম্‌ড়া সচরাচর জন্মিয়া থাকে। সাধারণ মাটিতেই ইহাদের গাছ জন্মে। বিলাতী কুম্‌ড়া ও গিমি-কুম্‌ড়ার বীজ পৌষ বা মাঘ মাসে রোপণ করিতে হয়। একটু বেলে মাটিতে এই দুই জাতীয় কুম্‌ড়া ভাল জন্মে। ইহাদের গাছ ম্যাচার উপর তুলিবার আবশ্যক নাই। কারণ মৃত্তিকাশায়ী গাছেই ফল অধিক হয়। চাল কুম্‌ড়ার বীজ বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপণ

করিতে হয় এবং গাছ বড় হইলে ঘরের চাল বা কোন বৃক্ষের উপর বিস্তৃত হইবার জন্য আশ্রয়ের সুবিধা করিয়া দিতে হয়। বিলাতী কুম্‌ড়া প্রায় বারমাসই ফলে কিন্তু গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালেই অধিক ফল ধরে। ক্ষেত্রে দশ বার হাত অন্তর গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে পলিমাটি ও গোবরের সার দিয়া ইহার বীজ রোপণ করিতে হয়। গাছ বৃদ্ধির জন্য উভয়পার্শ্বে উপযুক্ত স্থান থাকা চাই।

ককিম্বর (শসা)।

আমাদের দেশীয় শসা যেরূপ সামান্য যত্নে ও সামান্য মাটিতে উৎপন্ন হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সাধারণ দো-আঁশ মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া সেই গর্ত্তের মৃত্তিকার সহিত পুষ্করিণীর কর্দ্দম মিশাইয়া বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ রোপণ করিতে হয়। চারার গোড়ার মাটি শুকাইলেই জল দিতে হয়। গাছ বড় হইয়া উঠিলে, আশ্রয় জন্য উপরে মাচা প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন দেশীয় শসার নিমিত্ত আর কোন কাজ নাই।

চৈত্রে বা ভূঁয়ে শসা নামে এদেশে আর এক প্রকার শসা আছে। তাহার গাছ ভূতলশায়ী থাকে। যে জমিতে বালির অংশ অধিক সেই জমিই ইহার পক্ষে উপযোগী। পুরাতন পুষ্করিণীর পাঁক ইহার পক্ষে উৎকৃষ্ট [illegible] প্রথমে জমিতে দুই তিনবার লাঙ্গল দিবে ও মোই টানিয়া মৃত্তিকা সমতল করিবে। [illegible] পাঁচ হাত ব্যবধানে এক একটী গর্ত্ত করিয়া মৃত্তিকার সহিত পুকুরের পাঁক মিশাইবে। তাহাতে অসুবিধা থাকিলে, ফাঁস মাটি দিবে। পরে প্রত্যেক গর্ত্তে ৪।৫টী বীজ পুতিয়া অল্প পরিমাণে মাটি চাপা দিবে। পরদিন হইতে প্রত্যহ বৈকালে মৃত্তিকা ভিজিবার উপযুক্ত জল ছিটাইবে। চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই অঙ্কুর বাহির হইবে। যখন চারা বাড়িয়া লতাইতে আরম্ভ করিবে, তখন প্রচুর পরিমাণে জল সেচন

আবশ্যক। অতঃপর মাটিতে "যো" হইলে অতি সাবধানে গোড়ার মৃত্তিকা খুসিয়া দিবে, যেন শিকড়ে আঘাত না লাগে। চৈত্রমাস হইতে গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়।

আমেরিকা ও বিলাত হইতে যে শসার বীজ এদেশে আমদানী হয়, তাহা দেশীয় শসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। উক্ত শসার চাষ প্রণালী নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ইহার চাষের নিমিত্ত কিছু পুরাতন বীজ ভাল; কারণ তাহাতে তেজস্কর চারা জন্মে। মাঘ মাসের শেষে অথবা ফাল্গুন মাসের প্রথমে বাক্স বা গামলা, বালি ও পচা পাতার সার মিশ্রিত উত্তম ঝুরা মৃত্তিকাপূর্ণ করিয়া তাহাতে বীজ রোপণ করিবে এবং পাতলা রূপে মৃত্তিকা ছড়াইয়া বীজগুলি ঢাকিয়া দিবে। অনন্তর প্রত্যহ বৈকালে মৃত্তিকা সরস থাকিবার উপযুক্ত জল সিঞ্চন করিলে, চারি পাঁচ দিনের মধ্যে চারা জন্মিবে। চারা বৃদ্ধি পাইয়া যখন কঠিন পত্র ছাড়িতে আরম্ভ করিবে, তখন মস্তকের অল্পাংশ কাটিয়া ফেলিবে। ইহার দুই তিন দিন পরে শিকড়ে আঘাত না লাগে, এরূপ সাবধানে গোড়ার মাটি সমেত চারা উঠাইয়া তাহাদিগকে স্থায়ীরূপে জমিতে রোপণ করিবে।

জমিতে চারা রোপণের নিমিত্ত দুই হস্ত বেড় ও ষোল অঙ্গুলি গভীর করিয়া গর্ত্ত খনন করিবে। পরে বালি ও পচা পাতার সার এবং সাধারণ মৃত্তিকা এই সকল সমভাগে মিশাইয়া তদ্দ্বারা উক্ত গর্ত্তের গর্ত্ত পূর্ণ করিবে। অতঃপর তদুপরি পাঁচ অঙ্গুলি বাহু-বিশিষ্ট একটী সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত করিয়া সেই ত্রিভুজের তিন কোণে তিনটি চারা রোপণ করিবে এবং তাহাদের গোড়ায় মাটি দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল সেচন করিবে। গাছ ভূতলশায়ী হইয়াই বৃদ্ধি পায়। দেশীয় শসা অপেক্ষা এই শসা অনেক বড়; এক একটী ফলের ওজন পাঁচ ছয় সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

পোকায় ইহার ছোট ছোট চারা নষ্ট করে। চারার গোড়ায় ও উপরে দগ্ধকাষ্ঠের ছাই ছড়াইয়া দিলে, ঐ উৎপাত অনেক কম হয়।

লাল রঙ্গের পোকা ধরিলে, ঘাসের চাপড়া পোড়াইয়া এক ঘণ্টা কাল ধোঁয়া দিবে। তাহা হইলে, ঐ সকল পোকা বিনষ্ট হইবে।

চারা রোপণ করিয়া কিছুদিন যথেষ্ট জল সেচন করিবে। অন্যথা জলাভাবে মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে, চারার যথেষ্ট হানি হইবে।

ফুটী।

নদীর চড়ায় বা যে দো-আঁশ মাটিতে বালির অংশ অধিক, তথায় ফুটী উত্তম জন্মে। মাঘমাসে ইহার জমিতে দুই তিনবার লাঙ্গল দিবে এবং মোই টানিয়া ক্ষেত্র সমতল করিবে। অনন্তর তিন চারি হাত ব্যবধানে শ্রেণীবদ্ধরূপে গর্ত্ত খুঁড়িয়া গোবরের সার মিশ্রিত উত্তম চূর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা সেই গর্ত্ত পূর্ণ করিবে এবং প্রত্যেক গর্ত্তে চারি পাঁচটী বীজ রোপণ-পূর্ব্বক উপরে অল্প পরিমাণে মৃত্তিকা চাপা দিয়া বীজগুলি ঢাকিয়া দিবে। চারাগুলি একটু বড় হইয়া লতাইবার উপক্রম করিলে, একবার অধিক জল সেচন করিবে। বীজ রোপণের পূর্ব্বে তাহা দশ বার ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলে, তাহাতে শীঘ্র অঙ্কুর জন্মিবে।

দেশীয় তর্ম্মুজ।

দেশীয় তর্ম্মুজের আবাদ অবিকল ফুটীর ন্যায়। এজন্য তাহা পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। তর্ম্মুজ বড় করিবার ও সজীব রাখিবার জন্য কৃষকেরা ক্ষেত্রের মৃত্তিকা মধ্যে ফলগুলি প্রোথিত রাখে, কেবল বোঁটামাত্র মৃত্তিকার উপরে গাছের সহিত সংলগ্ন থাকে। ইহাতে প্রকৃত পক্ষেই তর্ম্মুজ অপেক্ষাকৃত সজীব থাকে ও বৃদ্ধি পায়।

আফগানিস্থানের তর্ম্মুজ।

অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, আফগানিস্থানে এত বড় তর্ম্মুজ জন্মে যে, একজন বলবান মনুষ্যেও তাহার একটা সহজে উত্তোলন করিতে পারে না। ঐ তর্ম্মুজ যে কেবল আকৃতিতে বড় হয়, তাহা নহে; উহার আস্বাদও অতি মধুর; উহার সহিত তুলনা করিলে এদেশের তর্ম্মুজকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। কলিকাতায় যাঁহারা চাষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আর, ডবলিউ, চু, সাহেব উহার চাষে বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এ স্থলে তাঁহার অবলম্বিত প্রণালী লিখিত হইল।

অনাবৃত ময়দানে এই তর্ম্মুজ চাষের পক্ষে উপযুক্ত; ভিজা ও ছায়াবিশিষ্ট স্থান হইলে, যত্ন সফল হয় না। মৃত্তিকায় আট ভাগের এক ভাগ বালি মিশ্রিত থাকা চাই। লাঙ্গল বা কোদাল দ্বারা ভূমি খনন করিয়া মোই টানিয়া সর্ব্বত্রের মৃত্তিকা সমান করিবে। তদনন্তর দুই হাত অন্তরে সোয়া হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া, পচা গোময়ের সার বা পচা অশ্ব বিষ্ঠার সার এবং মাটি সমান ভাগে মিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা তাহার গর্ত্ত পূর্ণ করিবে। ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ঐ সার শুষ্ক করিয়া, একবার অগ্নিতে ঝল্‌সাইয়া লওয়া আবশ্যক; কারণ তাহাতে তন্মধ্যস্থ কীটাদি নষ্ট হইয়া যাইবেক, সুতরাং সারের পোকায় গাছ নষ্ট করার সম্ভাবনা থাকিবে না।

উল্লিখিত প্রকারে স্থান প্রস্তুত হইলে, এক এক গর্ত্তে দেড় অঙ্গুল মাটির নীচে ৭।৮ টা বীজ পুতিয়া নিবে। বীজ সকল পুতিবার পূর্ব্বে ঈষদুষ্ণ জলে ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে; যেরূপ উষ্ণজলে হাত দিলে অসহ্য বোধ হয়, তাহাতে কদাপি ভিজাইবে না, ভিজাইলে বীজ নষ্ট হইয়া যাইবে। ২৪ ঘণ্টা ভিজিলে পর, জল হইতে তুলিয়া বীজগুলিকে আর্দ্র বস্ত্র মধ্যে রাখিয়া বান্ধিবে এবং যাবৎ অঙ্কুর উদ্ভিন্ন না হইবে তাবৎ তদবস্থায় থাকিবে। অঙ্কুর দুই তিন দিনের মধ্যেই উদ্গত হইয়া থাকে।

বীজে অঙ্কুর জন্মিলে, রোপণ করিয়া তখনই জল সেচনপূর্ব্বক ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিবে। চারা যাবৎ ৩। ৪ অঙ্গুল উচ্চ না হয়, তাবৎ প্রতিদিন জল সেচন আবশ্যক; তৎপরে প্রত্যহ জল না দিয়া প্রয়োজন মত মধ্যে মধ্যে দিলেই চলিবে।

ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস এ দেশে উক্ত বীজ রোপণের উপযুক্ত সময় পরন্তু ফাল্গুন মাসের শেষে বীজ রোপণ করিলেই ফল বৃহৎ হয়। এই সময়ে যে দিন বৃষ্টি হইবার লক্ষণ থাকে, সে দিন বীজ রোপণ করা ভাল; কারণ বীজ রোপণের পর এক পশলা বৃষ্টি হইলে, কুড়িবার জল সেচনের উপকার দর্শে এবং বৃষ্টি হইলে বাতাস শীতল হয়, তাহাতেও উপকার আছে, কিন্তু এই শীতল বায়ু প্রথমাবস্থাতেই উপকার; গাছ বড় হইলে তাহাতে হিত না হইয়া বরং অহিত হয়।

গাছ বড় হইলে, মধ্যে মধ্যে গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দিবে। কয়েক প্রকার পতঙ্গ ও পোকা এই গাছের পরম শত্রু; তন্মধ্যে ছোট কাল মাছি, সাদা পোকা, সবুজ বর্ণ বড় প্রজাপতি এই তিন প্রকার কাষ্ঠের ছাই অথবা তামাক বা গন্ধকের ধুঁয়া দিলে দূরীকৃত হয়, কিন্তু পীত বর্ণ মাছি ও ঝিল্লি পোকা, এই দুই প্রকারকে সহজে তাড়ান যায় না। ফলতঃ ইহারাই গাছের বিশেষ ক্ষতিকারক। ইহাদিগকে দূরীভূত করিবার একমাত্র উপায় এই, তামাকের পাতা গুঁড়া করিয়া ঘোড়ার অথবা ষাঁড়ের প্রস্রাবে গুলিবে পরে ব্রস দিয়া তাহা গাছের পাতায় ছিট্‌কাইয়া দিবে, তাহা হইলেই পোকা সকল অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। উপরে যে সমুদায় পোকার কথা লিখিত হইল, তাহারা কখন কখন ফল ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। এরূপ হইলে কোন জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত ফল ডুবাইয়া রাখিলে, সেই প্রবিষ্ট পোকা মরিয়া যাইবে। অতঃপর একটা ঘাসের ডাঁটা সর্ষপ তৈলে মগ্ন করিয়া ঐ ছিদ্র মধ্যে পুরিয়া দিবে এবং তাহা ফলের গাত্র সমান করিয়া কাটিয়া ফেলিবে। এরূপ করিলে সেই ফল নষ্ট হইবে না।

ফলে অত্যন্ত সূর্য্যের তাপ লাগিলে বা পোকায় ধরিলে, প্রায়ই ফাটিয়া যায়, এজন্য ফলের নিম্নস্থ মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক খড় বিছাইয়া তদুপরি ফল স্থাপন করতঃ উপরে খড় চাপা দিয়া, তাহাকে ঢাকিয়া রাখিবে। তাহাতে ফল ফাটিবে না অথচ বৃহদাকার ও সুস্বাদু হইবে। ফল পরিপক্ক হইলে বোঁটা শুদ্ধ কটিয়া আনিবে। কিন্তু সাবধান থাকিতে হইবে, যেন গাছ না নড়ে, নড়িলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলের হানি হইবার সম্ভাবনা।

কাশীর খর্ম্মুজ।

খর্ম্মুজ অতি উপাদেয় পদার্থ। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহা যথেষ্ট জন্মে। প্রতি বৎসর কাশী হইতে বিস্তর খর্ম্মুজ কলিকাতায় আমদানী হইয়া অনেক দামে বিক্রয় হয়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেকে ইহার চাষে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আর, ডবলিউ, চু সাহেব অনেক পরীক্ষার পর যেরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সেই প্রণালী নিম্নে লিখিত হইতেছে।

অনাবৃত ময়দানে ইহার চাষ করিবে। ছায়াবিশিষ্ট শীতল স্থানে চাষ করিলে, যত্ন সফল হইবে না। যে মৃত্তিকায় আট ভাগের এক ভাগ বালি মিশ্রিত আছে, খর্ম্মুজের পক্ষে সেই মৃত্তিকা উপযোগী। কোন গর্ত্তের মধ্যে অশ্ববিষ্ঠা বা গোময় ছয় মাস পচাইলে, যে সার প্রস্তুত হইবে, তাহা কিম্বা কুক্কুট, পারাবত প্রভৃতি পক্ষীর বিষ্ঠা ইহার পক্ষে উত্তম সার। লাঙ্গল বা কোদাল দিয়া ভূমি খনন করিবে। ঘাস দুর্ব্বাদি উত্তমরূপে বাছিয়া মোই টানিয়া মাটি সমান করিবে। পরে তিন চারি হাত অন্তর পোনের ষোল অঙ্গুল গভীর বিস্তৃত গর্ত্ত খুঁড়িয়া পূর্ব্বোক্তরূপ সার ও মাটি সমান ভাগে মিশ্রণপূর্ব্বক গর্ত্ত পূর্ণ করিবে। অনন্তর প্রতি গর্ত্তে এক বা দেড় হাত অন্তরে দুই অঙ্গুলি মাটির নীচে বীজ রোপণ করিবে। এই প্রকারে এক এক গর্ত্তে

পাঁচ ছয়টা বীজ পুতিবে। রোপণের পূর্ব্বে বীজগুলিকে অল্প গরম জলে অহোরাত্র ভিজাইয়া রাখিবে; বেশী গরম জলে ভিজাইলে বীজ নষ্ট হইবে। অনন্তর বীজ উঠাইয়া ভিজা কাপড়ে তাহা কষিয়া বান্ধিবে এবং অঙ্কুর না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ কাপড়েই বীজ বান্ধা থাকিবে। দুই তিন দিন এই অবস্থায় থাকিলেই অঙ্কুর জন্মিবে। তখন তাহাদিগকে উল্লিখিত নিয়মানুসারে রোপণ করিবে। রোপণ সময়ে অঙ্কুরের দিকটা মাটির নীচের দিকে রাখিয়া পুতিবে এবং তখনই ক্ষেত্রকে জলে প্লাবিত করিবে। চারা বাহির হইয়া যাবৎ তিন চারি অঙ্গুলি বাড়িয়া না উঠিবে, তাবৎ প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে জল সেচন করিতে হইবে। তৎপরে জলের আর আবশ্যক হয় না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে জল দিতে পারিলে, ফলের পক্ষে উপকার হইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় জল না দিলে, গাছ তেজে বাড়িতে পারে না।

বড় গাছ হইয়া উঠিলে, মধ্যে মধ্যে সাবধানে গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া ঘাসাদি বাছিয়া ফেলিবে। গোড়ার চারি পার্শ্বের মৃত্তিকা কখনও শক্ত হইতে দিবে না। ফাল্গুন মাস ইহার বীজ রোপণের উপযুক্ত সময়। কয়েক প্রকার কীট ও পতঙ্গ এই গাছের পরম শত্রু। উহাদের উপদ্রব আরম্ভ হইলে, গাছ রক্ষা করিবার যে উপায় আফগানিস্থানীয় তর্ম্মুজের চাষে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিবে। খর্ম্মুজ ক্ষেত্রের নিকটে অরণ্য থাকা ভাল নহে; থাকিলে কীটের উপদ্রব অধিক হয়।

বিন (সীম)।

এদেশে সচরাচর যে সকল সীম দেখা যায়, তাহাদের লতানিয়া গাছগুলি বহুদূর ধাবিত হয় এবং শাখা প্রশাখায় অনেক স্থান ব্যাপিয়া থাকে। সাধারণ মৃত্তিকায় বীজ পুতিলেই তাহাদের গাছ জন্মে, ঐ সকল গাছের আশ্রয়ের সুবিধার জন্য কোন বড় বৃক্ষের

নিকটে বা মাচার নীচে বীজ রোপণ করিতে হয়। বর্ষাকালে তাহাদের বীজ রোপণ করা হয়; বিনা যত্নেই গাছ বর্দ্ধিত হইয়া তাহাতে প্রচুর সীম ধরিয়া থাকে।

এখন বিদেশীয় বীজ আমদানীকারক ব্যক্তিদিগের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেশের নানাপ্রকার নূতন জাতীয় সীমের বীজ আনীত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে কয়েক প্রকারের গাছ গুল্মের মত। কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে তাহাদের বীজ রোপণ করিতে হয়; এটেল মাটিতে গাছ ভাল জন্মে। বীজ রোপণের পূর্ব্বে জল ঢালিয়া ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিবে। পরে দেড় হাত অন্তর শ্রেণী করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীতে ষোল অঙ্গুল ব্যবধানে এক একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া সেই গর্ত্তের মৃত্তিকার সহিত পুরাতন গোবরের সার বা খৈল মিশাইবে এবং এক এক গর্ত্তে এক একটী বীজ পুতিবে। বীজের উপর এক বা দেড় অঙ্গুলি মাটি চাপা দিবে। এক শ্রেণীর বীজগুলি যেন তাহার পার্শ্বস্থিত অন্য শ্রেণীর বীজের সম্মুখে রোপিত না হয়। কতকগুলি অতিরিক্ত চারা ভিন্ন স্থানে জন্মাইয়া রাখিতে হয়; পরে শ্রেণীস্থ যে যে চারা নিস্তেজ বোধ হইবে, তাহাদিগকে তুলিয়া ফেলিয়া তাহাদের স্থানে ঐ অতিরিক্ত মজুত চারা হইতে এক একটী আনিয়া রোপণ করিতে হয়। এই চারা তুলিয়া বসাইবার সময় গোড়ার মাটি সমেত তুলিবে। পূর্ব্বে জল সেচন করিয়া চারা তুলিলে মূলের মাটি সমেত উঠাইতে কঠিন হইবে না।

গাছে আবশ্যকমত জল দিবে এবং জল দেওয়ার দুইদিন পরে, গোড়ার মাটি খুসিয়া দিবে ও ঘাস আদি বাছিয়া ফেলিবে। নেগ্রো, আর্লিডন, হারিডন, হারিকট, রেড্‌ফ্রেঞ্চ ও ইয়লোঅষ্ট্রেলিয়ন্ বিন্, অধিক প্রসিদ্ধ এবং ইহারা সকলেই সুখাদ্য।

পিজ (মটর)।

মটর শস্যের মধ্যে পরিগণিত; ডাইলের জন্য এদেশে ইহার বেশী চাষ হয় কিন্তু ডাইল অপেক্ষা ইহার সুঁটীগুলি অপক্কাবস্থায় ব্যঞ্জনাদিতে দিলে উপাদেয় খাদ্য হয়। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে কাঁচা সুঁটীরই আদর অধিক। ওলন্দা নামে যে কড়াই সুঁটী বাজারে বিক্রয় হয়, তাহা দেশীয় মটর অপেক্ষা বড় এবং অধিক সুখাদ্য। উহা হলণ্ড দেশের মটর; ওলন্দাজ বণিকদিগের দ্বারা এদেশে আনীত হইয়াছে এবং এখন এদেশে অনেক জন্মিতেছে। বিলাতে চাষের পারিপাট্যে মটরের অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছে। বিলাতী মটর, ওলন্দা মটর অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ বড় এবং অধিক সুখাদ্য।
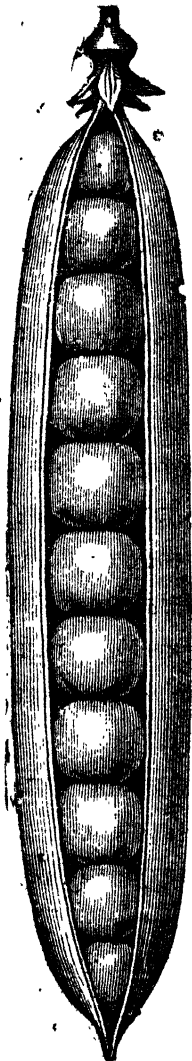
পার্শ্বে বিলাতী বৃহজ্জাতীয় মটর সুঁটীর একটী ছবি দেওয়া গেল; ইহা দেখিয়া বুঝিতে পারা যাইবে যে, ওলন্দা ও দেশীয় মটরের সহিত বিলাতী মটরের কত প্রভেদ। বিলাতী শাক-সব্জির বীজের সঙ্গে নানাপ্রকার মটরের বীজ আমদানী হইয়া থাকে।

হাল্‌কা বালুকা-মিশ্রিত মৃত্তিকা মটর চাষের উপযুক্ত। নদীর ধারে ইহা উত্তম জন্মে। ইহার ক্ষেত্রে কখন সার দিবে না। উৎপত্তিকালের ইতরবিশেষে মটরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অল্পসময়ে যে জাতির ফসল হয়, তাহা প্রথমশ্রেণী নিবিষ্ট; যাহার ফসল হইতে মধ্যবিধ সময় আবশ্যক, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত এবং যে জাতির ফসল হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক-কাল লাগে, তাহা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীবিভাগ

অনুসারে নিম্নে কতক গুলি বিখ্যাত জাতির নাম উল্লেখ করা যাইতেছে।

আর্লি এম্পারার, ডিক্সন্ এবং হুপার্স আর্লি রিভাল, প্রথম শ্রেণীস্থ; চ্যাম্পিয়ন অব্ ইংলণ্ড, ডোয়ার্ফ, ম্যামথ, প্রুসিয়ান ব্লু ও ইয়র্কসায়র হীরো, দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ; ব্রিটিস্ কুইন্, ভিক্টোরিয়া ম্যারো এবং হুপর্স ইন্কম্ পেরেবল, তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। বাঙ্গালায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তৃতীয় শ্রেণীর এবং পঞ্জাবে তিন শ্রেণীর মটরই উত্তম জন্মে।

বীজ রোপণের পূর্ব্বে লাঙ্গল বা কোদালদ্বারা ক্ষেত্র খুঁড়িয়া মৃত্তিকা চূর্ণ করিবে। দেশী বা ওলন্দা মটরের বীজ হইলে, জমিতে ছড়াইয়া মোই টানিবে, তাহাতে বীজগুলি মাটি ঢাকা পড়িবে। বিলাতী মটরের বীজ ছড়াইয়া বোনা অপেক্ষা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে রোপণ করিলে, গাছের বৃদ্ধি ও ফল উৎপাদন পক্ষে বাধা থাকিবে না।

পূর্ব্বোক্তরূপ পাইট করা জমিতে শ্রেণীবদ্ধরূপে বীজ বোপণ জন্য উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ পরস্পর দুই অঙ্গুল ব্যবধান রাখিয়া দুইটী রেখা টানিবে। ইহার কুড়ি অঙ্গুল ব্যবধানে ঐরূপ আর এক যোড়া রেখা টানিবে। এই প্রকারে সমস্ত জমিতে কুড়ি কুড়ি অঙ্গুল অন্তর যোড়া যোড়া রেখা টানা হইলে, প্রতি রেখায় দেড় দেড় অঙ্গুলি ব্যবধানে দুই দুই অঙ্গুলি গভীর করিয়া একটা কাঠি দিয়া গর্ত্ত করিবে এবং প্রতি গর্ত্তে এক একটী বীজ রোপণ করিয়া মাটি চাপা দিবে। গাছ জন্মিয়া লতাইবার উপযুক্ত হইলে, তাহাদের আশ্রয়ার্থ প্রত্যেক গাছের নিকট এক একটী কোঞ্চি বা কাঠি পুতিয়া দিবে। প্রতি যোড়া শ্রেণীর সম্মুখবর্ত্তী দুই দুটী কাঠির মধ্যে একটী আর একটির দিকে হেলাইয়া কেয়ারির মত করিয়া দিলে এবং কাঠিগুলি সমোচ্চ হইলে, বড় সুন্দর দেখায়, অথচ উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাধা হয় না। যে জাতীয় মটবের গাছ ছোট, তাহাদের জন্য উল্লিখিত যোড়া শ্রেণীর মধ্যের ব্যবধান কুড়ি অঙ্গুলি না রাখিয়া, দশ অঙ্গুলি রাখিবে এবং

যাহাদের গাছ মধ্যমরূপ তাহাদের জন্য ১৬ অঙ্গুলি ব্যবধান রাখিবে।

ক্ষেত্রের মৃত্তিকা নীরস বোধ হইলে, জল সেচন করিবে। দেশীয় মটরের গাছে জলের বড় প্রয়োজন হয় না; শিশির সিক্ত ভূমিতেই উহা প্রায় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; তথাচ মৃত্তিকা একেবারে নীরস বোধ হইলে, জল ছিটাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। দেশী ও বিলাতী উভয় প্রকার মটরের গাছ যখন পুষ্পিত হইয়া উঠিবে, তখন অধিক পরিমাণে জল সেচন করিবে।

মটরের বীজ কার্ত্তিক মাসে বপন করা হইয়া থাকে, কিন্তু ভাদ্রের শেষ হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত দশ দশ দিন অন্তর বীজ বপন করিলে, ক্রমান্বয়ে ফসল পাওয়া যায়। বীজ বপনের পূর্ব্বে কয়েক ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া লইলে, শীঘ্র অঙ্কুর জন্মে। বপনের সময় উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হইলে বীজ ভিজাইয়া লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

এগ্ প্লাণ্ট (বেগুণ)।

কর্ণেল সেলি বলেন, বেগুণের আদিম জন্মস্থান আফ্রিকা; তথা হইতে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়াছে। ভারতবর্ষেও বেগুণ আফ্রিকা হইতে আসিয়াছে কিনা, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কারণ অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে বেগুণ আছে এবং বেগুণকে এদেশের লোকে স্বদেশীয় তরকারি বলিয়াই জানে। বেগুণ ভারতবর্ষে প্রায় বার মাসেই পাওয়া যায় এবং সর্ব্বজাতীয় লোকে ইহা আদর পূর্ব্বক ব্যবহার করে।

সবুজ, বেগুণে ও সাদা এই তিন বর্ণের বেগুণ দেখা যায়। প্রথম দুই প্রকার দেশীয়দিগের নিকট এবং শেষোক্ত প্রকার সাহেবদিগের নিকট সমধিক আদরণীয়; বড় আকৃতির বেগুণ ছাড়া এদেশে মকো, কলি প্রভৃতি আরও কয়েক জাতি ছোট বেগুণ আছে; ইউরোপ ও

আমেরিকায় চাষের পারিপাট্যে বড় জাতীয় বেগুণের অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছে। বিলাতে সুটন কোম্পানির নিকট চারি পাঁচ সের ওজনের বেগুণে রঙ্গের বড় বেগুণের বীজ পাওয়া যায়। ঐ বীজ এদেশে আমদানী হইয়া থাকে। কৃষিকার্য্যে যাঁহাদের অনুরাগ আছে, তাঁহারা ঐ বীজের আবাদ করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে পারেন।

বিলাতী উক্ত বেগুণের বীজ এদেশে কার্ত্তিক হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে বপন করা যাইতে পারে। দেশীয় বেগুণের বীজ সচরাচর জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত রোপণ করা হয়। চারা উৎপাদন প্রণালী দেশী ও বিলাতী বেগুণের একরূপ। টবে বা গামলায় সারবিশিষ্ঠ ঝুরা মৃত্তিকা দিয়া তাহাতে বীজ ছড়াইবে। ঐরূপ মৃত্তিকা বিশিষ্ট হাপোরে বীজ বপন করিয়াও চারা জন্মাইতে পারা যায়। বীজ বপনের পর ধূলার মত চূর্ণ মৃত্তিকা পাতলা রূপে বীজের উপর ছড়াইয়া বীজ গুলি ঢাকিয়া দিবে এবং প্রতিদিন বৈকালে অল্প অল্প জল ছিটাইয়া মৃত্তিকা সরস রাখিবে। অঙ্কুর না হওয়া পর্য্যন্ত রৌদ্রের সময় বীজের উপর কলার পাতা চাপা দিয়া রাখিবে এবং সন্ধ্যাকালে আবরণ সরাইয়া ফেলিবে। বপনের পূর্ব্বে বীজগুলি দুই তিন ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া লইলে শীঘ্র অঙ্কুরোদ্গম হয়।

চারা ছয় সাত অঙ্গুলি বাড়িয়া উঠিলে, তাহাদিগকে তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। পূর্ব্বেই ইহার ক্ষেত্রের পাইটকার্য্য উত্তম রূপে সম্পন্ন করিয়া তাহাতে আঠার উনিশ অঙ্গুল অন্তর জুলি প্রস্তুত করিবে এবং জুলির মধ্যে পরস্পর এক হস্ত অন্তর চারাগুলি রোপণ করিবে। বিলাতী বড় বেগুণের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী স্থানের আবশ্যক; কারণ উহার গাছ অধিক ঝাঁকড়া হয়। এ নিমিত্ত পরস্পর দেড় হাত ব্যবধানে জুলি প্রস্তুত করিয়া এবং জুলির মধ্যেও ঐরূপ অন্তর রাখিয়া, বিলাতী বেগুণের চারা বসাইবে। চারা বার চৌদ্দ অঙ্গুল বাড়িয়া উঠিলে, সমুদায় জমি একেবারে কোদ্‌লাইয়া প্রতি দুই জুলির মধ্যস্থ দাঁড়ার মাটি চারার গোড়ায় দিবে; তাহাতে

জুলির সকল পূর্ণ হইয়া দাঁড়ার মত উচ্চ হইবে এবং দাঁড়াগুলি জুলির আকার ধারণ করিবে। এই সময়ে ক্ষেত্রে তরল সার দিলে, গাছের অত্যন্ত তেজ হইবে ও তাহাতে প্রচুর ফল ধরিবে।

বেগুণ গাছে যে সকল ফেঁকড়ী জন্মে তাহা টেরচা করিয়া কাটিয়া হাপোরে বসাইলেও চারা জন্মে কিন্তু তাহাতে যে ফল ধরে, তাহা বীজের চারার ফল অপেক্ষা ছোট হয়। বীজের জন্য নিখুত নিটোল বেগুণ, গাছপাকা করিবে এবং সেই গাছে একটী বা দুইটীর অধিক বেগুণ রাখিবে না, তাহা হইলে বীজ-বেগুণ অপেক্ষাকৃত বড় হইয়া উঠিবে ও বীজ ভাল হইবে।

লীক।

ইহাকে পলাণ্ডুর এক ভিন্ন জাতি বলা যাইতে পারে। বিলাত ও আমেরিকা হইতে ইহার বীজ আমদানী হইয়া থাকে। লীকের চারা উৎপাদন জন্য চতুস্পার্শ্বস্থ জমি হইতে একটু উচ্চ করিয়া একটী ছোট চৌকা প্রস্তুত করিবে এবং তাহার মৃত্তিকায় উত্তম রূপে সার মিশাইবে। পরে, আশ্বিন মাসের শেষে বা কার্ত্তিক মাসের প্রথমে তাহাতে বীজ ছড়াইয়া, হাল্কা মৃত্তিকা দ্বারা চাপা দিবে। চারাগুলি অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ হইলে, তাহাদের মধ্য হইতে অত্যন্ত তেজস্বী চারা বাছিয়া লইয়া, সাড়ে পাঁচ হাত দীর্ঘ এবং চারি হাত বিস্তৃত চৌকার ষোল অঙ্গুল অন্তর অন্তর শ্রেণীবদ্ধরূপে রোপণ করিবে। রোপণের নিয়ম এই, চৌকা হইতে প্রত্যেক চারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তুলিবে এবং মূলের সহিত এত মৃত্তিকা উঠাইবে যে, কোন মতে শিকড়ে আঘাত না লাগে। এদিকে পূর্ব্বেই প্রতি শ্রেণীর দশ দশ অঙ্গুল অন্তরে আট অঙ্গুল বেড় এবং অর্দ্ধ হস্ত গভীর গর্ত্ত করিবে। গর্ত্তের মধ্যে পুরাতন গোময়ের সার ফেলিয়া এক একটী চারা রোপণ করিবে এবং (গর্ত্তের উপরি ভাগ পর্য্যন্ত) গোড়ায় উক্ত সার

চাপিয়া দিবে। মৃত্তিকা জমাট বান্ধিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ জল সেচন করিবে। চারার মস্তক প্রতি মাসে ছাটিয়া দিবে।

ওনিয়ন (পলাণ্ডু)।

ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে যে পলাণ্ডুর বীজ আইসে তাহার চাষ প্রণালী লীকের ন্যায়, এজন্য তাহা পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। দেশীয় পলাণ্ডু অপেক্ষা উক্ত পলাণ্ডুর আকৃতি অনেক বৃহৎ। বীজগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং কৃষ্ণবর্ণ। আপন আপন রুচি অনুসারে কেহ দেশী কেহ বা বিলাতী পেঁয়াজের অধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন।

দেশীয় পলাণ্ডুর আবাদ করিতে হইলে, আশ্বিন মাসের প্রথমে জমিতে দুই তিন বার লাঙ্গল দিয়া ও গোবরের সার ছড়াইয়া উত্তম রূপে মৃত্তিকা চূর্ণ করিবে এবং মোই টানিয়া ক্ষেত্রের মাটি সর্ব্বত্র সমান করিবে। জমি অধিক খনিত ও চূর্ণিত হইলে, ফসল অধিক জন্মিবে। অনন্তর ঐ পাইট করা ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধরূপে পেঁয়াজ রোপণ করিবে। শ্রেণীগুলি পরস্পর সাত আট অঙ্গুল ব্যবধানে হওয়া আবশ্যক। মৃত্তিকা রসহীন বোধ না হইলে, জল সেচনের প্রয়োজন হয় না। চারা জন্মিয়া যখন চারি পাঁচ অঙ্গুলি পরিমাণ বাড়িয়া উঠিবে, তখন প্রতি দুই শ্রেণীর মধ্যস্থ জমি এক প্রকার অল্প পরিসর কোদাল দিয়া খুঁড়িয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে ঐরূপ খুঁড়িয়া মৃত্তিকা আল্‌গা করিয়া দেওয়া ভিন্ন ইহার পক্ষে আর কোন কাজ নাই। শিশিরের জলেই ইহার বৃদ্ধি সম্পাদন হয়; কদাচিৎ জলসিঞ্চনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহার চাষে খরচ বাদে প্রতি বিঘায় ৫০।৬০ টাকা লাভ হয়।

চীনের বাদাম।

চীনের বাদামকে মাটকলাইও বলে। ইহার চাষ আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে করিবে। দো-আঁশ মৃত্তিকায় ইহা উত্তম জন্মে। প্রথমতঃ ক্ষেত্রকে খনন করিয়া মৃত্তিকা চূর্ণ করিবে। অনন্তর গোময়ের সার প্রদানপূর্ব্বক মৃত্তিকা সমান করিয়া লইবে। পাইট করিবার সময় মৃত্তিকা ধূলার মত চূর্ণ করা নিতান্ত আবশ্যক; কারণ গাছ বড় হইলে, তাহাতে ফুল ধরিয়া প্রথমতঃ মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে; অনন্তর ফল হইলে, তাহা মৃত্তিকা ভেদপূর্ব্বক অভ্যন্তরে গিয়া অবস্থিতি করে।

চারা বড় হইলে, মূলের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া আল্‌গা করিয়া দিবে। ক্ষেত্রে অপকারী তৃণ জন্মিলে, নিড়েন দ্বারা তাহা তুলিয়া ফেলিবে।

মানকচু।

মানকচুর চাষ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হইয়া থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসই ইহার চাষের উপযুক্ত সময়। দো-আঁশ মৃত্তিকাবিশিষ্ট ক্ষেত্র মানকচু চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট। ক্ষেত্রের মৃত্তিকা খনন করা ও খনিত মৃত্তিকা চূর্ণ করা হইলে, এক বা সোয়া হাত অন্তর সারি বান্ধিয়া গর্ত্ত করিবে। অনন্তর ঐ সকল গর্ত্তমধ্যে চারা রোপণ করিয়া, কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত তাহাদের মূলে জল সেচন করিবে। গাছ বড় হইলে, তাহাদের মূলস্থ মৃত্তিকা খুঁড়িয়া মূলে ছাই দিতে পারিলে, মানকচুর কাণ্ড অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। চারা রোপণ সময়ে তাহাদের কেবল মাইজ পত্রটী রাখিয়া, অবশিষ্ট পত্রগুলি কাটিয়া ফেলিবে। ইহার জমি খুব রৌদপীঠে হওয়া চাই। অধিক রসাল ভূমিতে অথবা ছায়াবিশিষ্ট স্থানে মানকচুর চাষ করিলে তাহা সুসিদ্ধ হয় না।

কোন কোন দেশে বর্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে মানকচুর চাষ আরম্ভ হয়। তত্রত্য লোকেরা ক্ষেত্র মধ্যে দুই দুই হস্ত পরিমিত স্থানের উভয় পার্শ্বে নালা কাটিয়া, উপরে মাটি তুলে। সমুদায় ক্ষেত্রে এইরূপ করা হইলে, তোলা মৃত্তিকা উত্তমরূপে চৌরস করিয়া প্রত্যেক ভূমি খণ্ডে দুই দুইটী শ্রেণী করে। অনন্তর প্রতি শ্রেণীতে এক এক হাত অন্তর গর্ত্ত করিয়া চারা রোপণপূর্ব্বক মূলের খাদ ফাস মৃত্তিকা-দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেয়। বর্ষারম্ভ হইলে, চারাগুলি বিলক্ষণ সতেজ হইয়া সম্বৎসরেই স্থূলকাণ্ড হইয়া উঠে। পুষ্করিণী কাটিয়া যে স্থানে নূতন মাটি ফেলে, সেই স্থানের ঐ নূতন মৃত্তিকায় চারা রোপণ করিলে, কচু খুব বড় হইয়া থাকে।

হরিদ্রা।

যে জমিতে হলুদের আবাদ করিবে, কার্ত্তিক মাসে সেই জমি একবার কোদ্‌লাইয়া রাখিবে। চৈত্র বা বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলেই 'যো' বুঝিয়া জমিতে লাঙ্গল দিবে ও মোই টানিয়া মৃত্তিকা সমান করিবে। পরে দেড় হাত অন্তর এক এক শ্রেণী করিয়া, প্রত্যেক শ্রেণীতে পরস্পর কুড়ি অঙ্গুল ব্যবধানে হলুদের মোথা বা মুখী পুতিবে এবং প্রতি দুই শ্রেণীর মধ্যস্থ জমি হইতে এক এক কোদাল মাটি তুলিয়া, মোতাগুলির উপর চাপা দিবে। চারা জন্মিলে, শ্রেণীর পার্শ্বস্থ জমি হইতে আরও মাটি তুলিয়া দাঁড়া বান্ধিয়া দিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে বা আষাঢ় মাসের প্রথমে এই কার্য্য করিতে হয়। দাঁড়ায় বেশী ঘাস জন্মিলে, মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া দিবে।

যখন গাছ শুকাইয়া যাইবে, তখন ক্ষেত্র হইতে হলুদ তুলিয়া ফেলিবে। স্থান ভেদে অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হলুদ তোলা হয়। হলুদের মোতা এবং মুখী বীজের জন্য ছায়ায় তৃণপত্রাবৃত করিয়া রাখিবে। অবশিষ্ট হলুদ ব্যবহারযোগ্য

করিবার নিমিত্ত গোবর মিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিবে। অধিক সিদ্ধ না করিয়া একবার জল উথলাইয়া উঠিলেই নামাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে দিবে। অর্দ্ধ শুষ্কাবস্থার সময় হইতে কয়েকদিন বৈকালে হলুদগুলি চটের মধ্যে রাখিয়া রগড়াইবে। উত্তমরূপে শুষ্ক হইলেই হলুদ প্রস্তুত হইবে। প্রতি বিঘার থরচ থরচা বাদে হলুদের চাষে প্রায় ৭০। ৭৫ টাকা লাভ হইতে পারে।

আদা।

ইহার উৎপাদন প্রনালী ঠিক হলুদের ন্যায়। কিছু আওতা জমিতে ইহা ভাল জন্মে। আদার চাষে হলুদ অপেক্ষাও বেশী লাভ হয়।

আম আদা—ইহাতে কচি আম্রের ন্যায় সুগন্ধ আছে, এজন্য অম্বলে ও চাট্‌নীতে ইহা ব্যবহার হয়। ইহার কাট্‌তি বেশী নহে; সুতরাং ইহাকে ব্যবসায়ের দ্রব্য বলা যাইতে পারে না। মোতা বা মুখী রোপণ করিলেই গাছ জন্মে। ছায়া-বিশিষ্ট শীতল স্থানে গাছ ভাল হয়।

এরারুট।

এরারুট বিদেশীয় পদার্থ; এদেশে অল্প দিন ইহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। বর্দ্ধমান, বীরভুম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় ইহা অনেক জন্মিতেছে। ইহার উৎপাদন নিয়ম অবিকল হরিদ্রার ন্যায়। ইহার মুল আদা, হরিদ্রা প্রভৃতির মত। বাজারে যে এরারুট বিক্রয় হয়; তাহা সেই মুল হইতে প্রস্তুত। ইহার চাষে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে।

ওল।

ওল অতি উৎকৃষ্ট তরকারি। ইহা এদেশে জন্মাইবার নিমিত্ত অধিক যত্নের আবশ্যক করে না। বৈশাখ মাসে সাধারণ দো-আঁশ মাটিতে লাঙ্গল দিয়া শ্রেণীবদ্ধরূপে এক বা দেড় হাত অন্তর, পোনের বা ষোল অঙ্গুল বেড়বিশিষ্ট অৰ্দ্ধ হস্ত গভীর গর্ত্ত খুঁড়িবে এবং প্রতিগর্ত্তে এক এক অঞ্জলি ফাঁস মাটি দিয়া তাহাতে ওলের মুখী বা বেঁজি রোপণ করিবে। বর্ষার জল পাইলেই চারা জন্মিবে। শ্রাবণ মাসের শেষ হইতে ওল তুলিয়া আহারার্থ ব্যবহার করা যাইতে পারে। খুব রৌদ্‌পীঠে জমির ওল ভাল হয়।

শাঁক-আলু।

বীজ হইতে ইহার গাছ জন্মে। কিছু বেলে মাটিতে গাছ ভাল হয়। বৈশাখ মাসে জমি খুঁড়িয়া বীজ রোপণ করিবে। ইহার লতার ন্যায় গাছগুলি খুব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। শাক-আলুর বীজ বিষবৎ অপকারী এজন্য ইহার চাষ বসতি স্থানের নিকট হওয়া উচিত নহে।

উচ্ছে।

কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে ইহার বীজ রোপণ করিতে হয়। দো-আঁশ মৃত্তিকাবিশিষ্ট ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া চারি চারি হাত অন্তর, এক একটা গর্ত্ত খুঁড়িবে এবং ঝুরা মাটি দিয়া সেই গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া, প্রতি গর্ত্তে তিন চারিটি করিয়া বীজ রোপণ করিবে। ইহা অপেক্ষা অল্প অন্তরে বীজ রোপণ করিলে, গাছে গাছে জড়াইয়া যায়; তাহাতে ফল বেশী ধরে না এবং গাছের অনিষ্ট হয়। ক্ষেত্রে অধিক ঘাস জন্মিলে মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া দিবে।

করলা।

ইহা উচ্ছেরই জাতি বিশেষ; ফলগুলি উচ্ছে অপেক্ষা অনেক বড়। বৈশাখ মাসে বীজ রোপণ করিতে হয়। ইহার গাছের আশ্রয় জন্য মাচা প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। শ্রাবণ মাস হইতেই গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করে।

পটল।

পটলের বীজের চারা চাষের যোগ্য নহে। ইহার গেঁড় রোপণ করিতে হয়। পটলগাছের প্রায় প্রতি গাঁইট হইতে মূলের মত লম্বা গেঁড় জন্মিয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। গাঁইটের উভয়-পার্শ্বে কাটিয়া এবং সেই সকল স্থানের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া গেঁড়গুলি তুলিতে হয়। গ্রন্থি-বিশিষ্ট ঐ সমুদায় গেঁড় চারি পাঁচ অঙ্গুল লম্বা রাখিয়া নীচের দিকে কাটিয়া ফেলিবে। অনন্তর কোন পাত্রে পচা গোময়ের জলে তাহাদিগকে ভিজাইয়া রাখিবে। ঐ গোময়ের জল এরূপ দিতে হইবে, যেন গেঁড় সকল ভিজিয়া অতিরিক্ত না হয়। এক বা দেড় দিন ভিজিলে, পরে তাহাদিগকে ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। রোপণ সময়ে গাঁইটটী উপরে রাখিবে এবং মাটি চাপা দিবার সময় সমুদায় ঢাকিয়া না দিয়া গাঁইটের অল্পাংশ বাহিরে রাখিবে। অনন্তর উত্তাপে শুষ্ক হইয়া না যায়, এজন্য অতি পাতলা-রূপে খড় চাপা দিয়া, যতদিন উত্তমরূপে কল বাহির না হয়, ততদিন প্রত্যহ অল্প অল্প জল সেচন করিবে। চারা বড় হইয়া উঠিলে, প্রত্যহ জল না দিয়া, মৃত্তিকা সরস রাখিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিবে।

কার্ত্তিক মাস পটল চাষের উপযুক্ত সময়। এই সময়ে দো-আঁশ মৃত্তিকাবিশিষ্ট ক্ষেত্র খুঁড়িয়া মৃত্তিকা উত্তমরূপ চূর্ণ করিবে। অনন্তর তাহাতে খৈল বা গোময়ের সার প্রদান পূর্ব্বক ক্ষেত্রের পাইট কার্য্য

সুন্দররূপে সম্পন্নকরতঃ চারি চারি হাত অন্তরে জল যাইবার নিমিত্ত জুলি প্রস্তুত করিবে। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, বৃষ্টি হইলে ক্ষেত্রস্থ জল জুলিদ্বারা সহজে বহির্গত হইয়া যাইতে পারিবে। অতঃপর ঐ সকল ক্ষেত্র-খণ্ডের প্রত্যেকে তিন শ্রেণী করিয়া, প্রতি শ্রেণীতে পরস্পর তিন হস্ত ব্যবধানে প্রাগুক্ত গেঁড় সকল রোপণ করিবে। এক একটি গর্ত্তে দুই তিন খণ্ড গেঁড় রোপণ করা আবশ্যক। ক্ষেত্রে তৃণ, মুথা প্রভৃতি জন্মিলে, সর্ব্বদা নিড়াইয়া দিবে। একবার চাষ করিলে, সেই গাছে দুই তিন বৎসর পটল জন্মিয়া থাকে।

পালঙ-শাক।

পালঙ-শাকের বীজ আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে বপন করিবে। বপনের পূর্ব্বে বীজগুলিকে দুই এক দিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে; ভিজিয়া কিছু স্ফীত হইলে পর, তাহাদিগকে জল হইতে ছাঁকিয়া, ছাই মিশ্রিত করিয়া, অপর পাত্রে স্থাপন করিবে এবং সেই পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। এইরূপ অবস্থায় একদিন রাখিলে বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইবার উপক্রম হইবে; তখন তাহাদিগকে ক্ষেত্রে ছড়াইয়া জল সেচন করিবে। চারা না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি-দিন অপরাহ্নে জল সেচন আবশ্যক। চারা ঘন ঘন জন্মিলে, কতক চারা তুলিয়া লইয়া অবশিষ্ট চারাগুলিকে পাতলা করিয়া দিবে। শাক খাওয়ার উপযুক্ত বাড়িয়া উঠিলে, একেবারে মূল সমেত গাছ না তুলিয়া, মূলের দুই তিন অঙ্গুলি উপরে সমুদায় পাতা কাটিয়া লইবে এবং যথেষ্ট জল সেচন করিবে; এইরূপ করিলে ক্রমান্বয়ে অনেকবার শাক খাওয়া যায়। একটু যত্ন করিলে বৎসরের সকল সময়েই এই শাক জন্মিতে পারে।

টক্‌পালঙের চাষও এই প্রকারে করিতে হয়। ভূমিতে সার দিলে গাছ সকল অত্যন্ত তেজাল হয়।

নটে-শাক।

চাঁপা, পদ্ম, কোকিল প্রভৃতি নটেশাকের অনেক জাতি। সকল গুলিই সুখাদ্য। বারমাসই ইহাদিগকে জন্মান যাইতে পারে; কিন্তু অন্য সময় অপেক্ষা শীতকালে ভাল জন্মে। দো-আঁশ জমি উত্তমরূপে পাইট করিয়া বীজ বপন করিবে। যাবৎ চারা উৎপন্ন না হইবে, তাবৎ প্রতিদিন বৈকালে মৃত্তিকা সরস থাকিবার উপযুক্ত অল্প অল্প জল ছিটাইবে। বেশী জল দিলে, মৃত্তিকায় চাপ বাঁধিয়া অঙ্কুরোৎপত্তির ব্যাঘাত হইবে। চারা বাড়িয়া উঠিলে, একেবারে মূল সমেত গাছ না তুলিয়া গোড়ার কতক অংশ রাখিয়া কাটিয়া লইবে এবং তখন প্রচুর জল সেচন করিবে। এইরূপ করিলে, পুনরায় গাছ ঝাঁকড়া হইয়া বৃদ্ধি পাইবে এবং ক্রমান্বয়ে অনেকবার শাক পাওয়া যাইবে। জল সেচনের পর মাটিতে "যো" হইলে, নিড়ানদ্বারা মাটি খুসিয়া দিবে। ক্ষেত্র পাইট করার সময় গোবরের সার দিলে, গাছগুলি সতেজে বৃদ্ধি পাইবে।

কন্‌কাশাকও এই সময়ে এই নিয়মে উৎপন্ন করিতে হয়। ইহার চারা আবশ্যক হইলে, তুলিয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে রোপণ করা যাইতে পারে। ইহার গাছ কতক রাখিয়া কাটিলে, নটের মত, তাহা বৃদ্ধি পায় না। এজন্য কন্‌কার গাছ একেবারে মূল সমেত তুলিবে।

ডেঙ্গো-ডাটা বা ডাটাশাক।

চৈত্র বা বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইয়া যখন মাটিতে "যো" হইবে তখন মৃত্তিকা খুঁড়িয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। অনন্তর বীজ বপন

করিয়া চারা না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন বৈকালে অল্প অল্প জল ছিটাইয়া মৃত্তিকা সরস রাখিবে। চারা জন্মিয়া চারি পাঁচ অঙ্গুল বাড়িয়া উঠিলে, মধ্যের কতক চারা তুলিয়া, অন্য স্থানে রোপণ করিবে বা শাক খাইবে। চারাগুলি ঘন ঘন থাকিলে, ভালরূপ বাড়িতে পারে না। আবশ্যকমত জল সেচন করিবে এবং মধ্যে মধ্যে নিড়ান দিয়া মাটি খুসিয়া দিবে। বীজ বপনের পর বেশী বৃষ্টি হইলে মাটিতে চাপ বন্ধিয়া চারা জন্মিবার ব্যাঘাত হয়। এরূপ ঘটনা হইলে, কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া দেখিবে, যদি ভালরূপ চারা বাহির না হয়, তবে পুনরায় জমি খুঁড়িয়া বীজ ছড়াইবে।

আবশ্যক মত জল সেচন করিতে পারিলে, ডেঙ্গো-ডাটা বৎসরের সকল সময়েই জন্মান যায়।

লাউ।

লাউ উৎকৃষ্ট তরকারি। শীতকালের লাউ অধিক সুস্বাদু। জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে বীজ রোপণ করিলে, সেই সকল গাছেই শীতকালে যথেষ্ট ফল ধরে। বর্ষার জল গোড়ায় বসিলে, গাছ মরিয়া যায়। এজন্য গাছের গোড়ার মাটি উচ্চ করিয়া দিতে হয়। বাটীর উঠান ঝাঁটাইয়া প্রত্যহ যে মাটি জমে তাহা গাছের গোড়ায় দিলে গোড়ার মাটি উচ্চ হইবে অথচ সারের কাজ করিবে। গাছের আশ্রয় জন্য মাচা প্রস্তুত করিয়া দিবে। কার্ত্তিক মাসে এক জাতীয় লাউয়ের বীজ রোপণ করা হয়, চৈত্র মাসে তাহার গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। এই জাতীয় লাউকে চৈত্রে লাউ বলে। ইহার গাছের জন্য মাচার প্রয়োজন হয় না, ভূতলশায়ী হইয়াই গাছ বৃদ্ধি পায়।

ঝিঙ্গে।

লাউয়ের ন্যায় ঝিঙ্গের বীজও বৎসরে দুই সময়ে রোপিত হয়। জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে একবার এবং কার্ত্তিকমাসে আর একবার। প্রথম রোপিত বীজে বর্ষাকালেই ফল ধরে। ঐ গাছ মৃত্তিকাশায়ী থাকিলে বর্ষার জলে নষ্ট হইয়া যায় এজন্য মাচার উপর উঠাইয়া দিতে হয়। কার্ত্তিক মাস-জাত গাছে ফাল্গুন চৈত্রমাসে ফল জন্মে। এই জাতীয় ঝিঙ্গেকে থুবিঝিঙ্গে বলে। ইহার চাষের নিয়ম উচ্ছের ন্যায়। এই জাতীয় গাছের জন্য মাচার আবশ্যক হয় না, ভূতল-শায়ী হইয়াই বৃদ্ধি পায়।

লঙ্কামরিচ।

লঙ্কা একটী প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। ইহার চাষে অত্যন্ত লাভ হয়। নদীয়ার অন্তর্গত হলদহ এবং যশোহরের অন্তর্গত কেশবপুর লঙ্কার চাষের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনেদহ প্রভৃতি স্থানেও বিস্তর লঙ্কা জন্মে।

আষাঢ়ের শেষে বা শ্রাবণ মাসের প্রথমে কোন স্থানে বীজ পাতো দিয়া চারা জন্মাইতে হয় এবং চারাগুলি পাঁচ ছয় অঙ্গুল বাড়িয়া উঠিলে, শ্রাবণ মাসের মধ্যেই তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধরূপে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। ইহার জমিতে খুব রৌদ্র পাওয়া, ভাল। চারা রোপণের পূর্ব্বেই ক্ষেত্রের পাইট কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়া লইবে। দো-আঁশ মৃত্তিকা ইহার পক্ষে উপযোগী। গোবরের সার, ছাই, বিট লবণ এই সকল ক্ষেত্রে দিলে লঙ্কা ভাল জন্মে। কাঠা প্রতি অর্দ্ধসের বিটলবণ ছড়াইলেই যথেষ্ট হয়।

ইহার ক্ষেত্র নিড়াইয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে মৃত্তিকা খুসিয়া দিতে হয়। আশ্বিন মাসে ক্ষেত্রে গোময়ের তরল

সার ছড়াইতে পারিলে, বিশেষ উপকার দর্শে। ফাল্গুন মাস হইতে লঙ্কা তুলিয়া শুষ্ক করা হইয়া থাকে।

ইক্ষু।

যে ভূমি বন্যার জলে ডুবিবার সম্ভাবনা নাই এবং যাহাতে অধিক বৃহৎ গাছ নাই, সেই ভূমিই ইক্ষু চাষের পক্ষে উপযুক্ত। ঐ স্থানের মৃত্তিকা দো-আঁশ হইলে ভাল হয়। চৈত্র ও বৈশাখমাসে উল্লিখিত-রূপে ক্ষেত্রে লাঙ্গলদ্বারা চারি পাঁচ বার চাষ দিয়া উত্তমরূপে পাইট করিবে। পাইট করিবার সময় মৃত্তিকার সহিত খৈল ও গোময়-সার মিশাইবে। মৃত্তিকা প্রস্তুত হইলে, এক এক হাত অন্তরে অর্দ্ধহস্ত চৌড়া এবং অর্দ্ধহস্ত গভীর করিয়া জুলি প্রস্তুত করিবে। জুলি খুঁড়িতে যত মাটি উঠিবে, তাহা প্রতি দুই জুলির মধ্যে আইলের আকারে রাখিবে; কারণ পরে ইক্ষুর গোড়ায় মাটি দেওয়ার সময় ঐ মাটি সহজে লওয়া যাইতে পারিবে। এই প্রকারে জমি প্রস্তুত হইলে, জুলির মধ্যে এক এক হাত অন্তরে ইক্ষুর ডগা পাতিয়া বসাইবে। প্রত্যেক ডগায় অন্ততঃ তিনটী চোক্ থাকা আবশ্যক। সেই চোক্ উপরের দিকে রাখিয়া তদুপরি আড়াই অঙ্গুল পুরু করিয়া এরূপে মাটি চাপা দিবে যে, সমুদয় ডগাটি যেন ঢাকিয়া যায়। মাটি চাপা দেওয়া হইলে, তৎক্ষণাৎ জল সেঁচন করিবে। ডগা রোপণের পূর্ব্বে জুলির মধ্যে অতি পাতলারূপে খৈলের গুড়া ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। ইক্ষুর সাদা রঙ্গের ছোট ছোট এক প্রকার বীজ হয়, ঐ বীজ রোপণেও চারা জন্মাইতে পারা যায় কিন্তু বীজজাত ইক্ষু তত মোটা হয় না।

কোঁড়ক বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত দুই তিন দিন অন্তর জল সেচন করিবে। যখন কোঁড়কগুলি সম্যক্‌প্রকারে জন্মিবে, তখন বার তের দিন অন্তর জল দিলেই হইবে। অপর সিঞ্চিত জল একটু

টানিয়া গেলে, পার্শ্বস্থ আইলের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দিবে। তাহাতে পুনরায় জল সেচন করিলে বা বৃষ্টি হইলে ঐ মৃত্তিকা ধৌত হইয়া জুলির মধ্যে পড়িবে; সুতরাং চারার গোড়ায় মৃত্তিকা দেওয়ার কাজ হইবে।

ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে হইবে। আশ্বিনমাসে আইল সকলে যে মৃত্তিকা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা খুঁড়িয়া সমান করিয়া দিবে, অর্থাৎ তখন আর আইল রাখিবে না। এই সময়ে ক্ষেত্রে একবার খৈল ছড়ান আবশ্যক এবং এখন পোনের বা কুড়ি দিন অন্তর জল সেচন প্রয়োজন হয়। জল সেচনের দুই এক দিন পরে মৃত্তিকা অল্প অল্প খুঁড়িয়া দিবে।

চারাগুলিতে যখন পাঁচ ছয়টা পাতা ধরিবে তখন অবধি নীচের পাতাদ্বারা তাহাদিগকে জড়াইতে আরম্ভ করিবে এবং গাছ ক্রমে যত বাড়িবে, তত জড়াইয়া দিবে।

ইক্ষুর যে সকল ডগা রোপিত হইয়া থাকে, রোপণের পূর্ব্বে তাহাদিগকে হাপোরে ফেলিয়া রাখিতে হয়। হাপোরে রাখার নিয়ম এই,—কোন স্থানে এক হস্ত গভীর একটী গর্ত্ত করিবে। গর্ত্তের আয়তনে যত ডগা রাখিবে, তাহা ধরিতে পারে, এরূপ বিবেচনা করিয়া করিবে। অনন্তর পুকুরের পাঁক, ছাই ও বালি মিশ্রিত করিয়া উহার গর্ত্তের কিয়দংশ পূর্ণ করিবে। এইরূপে হাপোর প্রস্তুত হইলে ইক্ষুর ডগা সকল তন্মধ্যে অল্প হেলাইয়া সাজাইয়া বসাইবে। তৎপরে তাহাদের চারিপার্শ্ব মৃত্তিকাদ্বারা এরূপে ঢাকিয়া দিবে যে, গোড়ায় বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে কিন্তু এই মৃত্তিকার আবরণ যেন ডগার উপরিভাগ পর্য্যন্ত না উঠে অর্থাৎ উপরে কিয়দংশ বাকি রাখিয়া মৃত্তিকাবৃত করিবে। অনন্তর রোপণের উপযুক্ত সময় হইলে, ডগাগুলিকে এই স্থান হইতে উঠাইয়া, ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পুতিয়া দিবে।

শামসাড়া ইক্ষুদণ্ডের দুই দুইটী গাঁইট বিশিষ্ট এক এক খণ্ড পূর্ব্বোক্ত নিয়মে রোপণ করিলেও উত্তম চারা জন্মে।

ক্ষুদ্র উদ্যান-স্বামীর ত্যজ্য বিষয়।

উদ্যানে রোপণ যোগ্য অনেক ফল, ফুল ও শাকসবজীর উৎপাদন প্রণালী বর্ণিত হইয়া এখন উপসংহারে ক্ষুদ্র উদ্যান স্বামীর কর্ত্তব্য বিষয়ে কিছু বলিয়া আমরা এই স্থানে উদ্যানের কার্য্য শেষ করিব। পূর্ব্বে উদ্যান প্রস্তুত ও তাহার কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে যে সকল কথা লেখা হইয়াছে, তৎসমুদায় বৃহৎ উদ্যানের পক্ষে সঙ্গত। ক্ষুদ্র উদ্যান-স্বামীকে নিজ উদ্যানের বিস্তৃতি বুঝিয়া কার্য্য করিতে হইবে। যে বন্দোবস্ত সুবৃহৎ উদ্যানের পক্ষে শোভা পায়, ক্ষুদ্র উদ্যানে তাহা করিতে গেলে, অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে। এজন্য ক্ষুদ্র উদ্যান-স্বামীর পরিত্যজ্য কার্য্যগুলি আমরা এস্থলে উল্লেখ করিব। চিকিৎসকেরা রোগীর ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থার সময় কতকগুলি নিষেধ বিধিও প্রকাশ করিয়া থাকেন। রোগীর আরোগ্য লাভ সম্বন্ধে ঐ সকল সতর্ক বাক্য বড় সাহায্যকারী হইয়া থাকে। স্বল্পয়াতন বিশিষ্ট উদ্যানের স্বামীও যদি উপেক্ষা না করিয়া নিম্নোক্ত নিষেধ বাক্য গুলির প্রতি মনোযোগ করেন, তবে উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না।

১। উদ্যানকে সুশোভিত করিতে সকলেরই ইচ্ছা, কিন্তু তাহাতে অত্যাশক্তি থাকা ভাল নহে; কারণ সজ্জীকরণ বিষয়ে মত্ততা জন্মিলে চিত্তের চঞ্চলতা ও অনুকরণপ্রিয়তা বৃদ্ধি হয়, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন উদ্যানের কার্য্য দৃষ্টে নিত্য নূতনরূপে সাজাইতে প্রবৃত্ত জন্মে; তাহাতে সুনিয়মে কার্য্য হয় না, অধিকন্তু সর্ব্বদা মত পরিবর্ত্তন হেতু অবশেষে উদ্যানটী হতশ্রী হইয়া পড়ে। অতএব উদ্যান ক্ষুদ্র হইলে সাজানের পক্ষে বেশী আড়ম্বর অতীব অনিষ্ট জনক।

২। বিস্তৃত উদ্যানের দৃষ্টান্তে ক্ষুদ্র উদ্যানকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করা ভাল নহে। ক্ষুদ্র উদ্যানে ঐ প্রকার কার্য্য শোভাজনক না হইয়া বরং সৌন্দর্য্যের হানিকর হয়।

৩। উদ্যানে অনেক ফলপুষ্পাদির বৃক্ষ থাকা অবশ্যই সুখকর। কিন্তু যাঁহার উদ্যানে তাদৃশ প্রচুর স্থান নাই, তাঁহার সে সুখলাভের স্পৃহা রাখা অন্যায়, কারণ ক্ষুদ্র উদ্যান বহু বৃক্ষের আবাসস্থান হইলে আলোক ও বায়ু সঞ্চার বন্ধ হয়, বৃক্ষগুলি নিস্তেজ ও অফলা হয় এবং স্থানটী অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে।

৪। ক্ষুদ্র উদ্যানে পুষ্পের জন্য বহু সংখ্যক জমির খণ্ড রাখিবে না। উদ্যানের সকল অংশ পরিদর্শনের নিমিত্ত ও জল সিঞ্চনের জন্য যে সকল পথ আবশ্যক তদ্ভিন্ন অধিক পথ প্রস্তুত করিবে না।

৫। বৃক্ষাদি রোপণের শৃঙ্খলা রাখিবে অথচ সরল প্রণালী ভিন্ন অত্যন্ত জটিল জ্যামিতিক প্রণালী অবলম্বনের ইচ্ছা করিবে না।

৬। নিত্যকার প্রয়োজনীয় শাকসবজির জন্য স্থান না রাখিয়া কেবল ফলপুষ্পাদির বৃক্ষে উদ্যান পূর্ণ করিবে না। লাভের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া লোককে আশ্চর্য্যান্বিত করার জন্য আড়ম্বরজনক নূতন কৃষির অনুষ্ঠান করিবে না। উৎপন্নের সম্ভাবনা থাকিলে, আলস্য করিয়া জমির কোন অংশ পতিত রাখিবে না।

৭। কোন প্রকার কুৎসিৎ আমোদের অভিপ্রায়ে উদ্যানগৃহ বৃক্ষ লতাদিবেষ্টিত গুপ্ত স্থানে প্রস্তুত করিবে না। কুরুচির পরিচায়ক কোন প্রকার চিত্র বা প্রতিমূর্ত্তি উদ্যান মধ্যে রাখিবে না।

সম্পূর্ণ